



ইজলাসি জিয়াসাত

‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতি বনাম মডারেট চিন্তাধারা

১



মাওলানা আবরার সিদ্দিক

সন্দীপন

মাওলানা আবরার সিদ্দিক

পিতা: মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ (সাবেক
সিনিয়র মুহাদ্দিস ও শাইখুল হাদিস :
আলজামিয়া আলইসলামিয়া পটিয়া ও
নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা)
তিনি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি থানাধীন
মাহতলা গ্রামে ১৪০৬ হিজরি মোতাবেক ১৯৮৬
খ্রিষ্টাব্দে একটি সম্ভ্রান্ত ও ইলমি পরিবারের
জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা তিনি শুরু করেন গ্রামের
প্রাইমারি স্কুলে; সেখানে তিনি পঞ্চম শ্রেণি
পর্যন্ত পড়েন। প্রাথমিক পাঠ চুকিয়ে তিনি
ইলমের অন্বেষণে চলে যান বাংলাদেশের
অন্যতম বিদ্যাপীঠ আলজামিয়া আলইসলামিয়া
পটিয়াতে। পড়াশোনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত
তুখোর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। সেখানে
অত্যন্ত সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে তাইসির
জামাত থেকে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন।
তিনি ছিলেন আসাতিয়ায়ে কেরামের অত্যন্ত
স্নেহের ও আস্তার পাত্র। দাওরায়ে হাদীসে
ইত্তিহাদ বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করার পর তিনি
উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভর্তি হন মারকাযুদ
দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকার উলুমুল হাদিস
বিভাগে। সেখানে উস্তাযে মুহতারাম শাইখ
মুহাম্মাদ আবদুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ এর
বরকতময় ইলমি সোহবত ও সান্নিধ্যে উলুমুল
হাদিস নিয়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন।

তৃতীয় বৎসর তিনি ইলাউস সুনানের প্রায়
১০০০ হাদিসের তাখরিজ ও তানকিহ এর কাজ
করেন।

ছাত্রজীবন শেষে তিনি মুরক্বিগণের পরামর্শে
ঢাকা দারুল কুরআন চৌধুরীপাড়া মাদরাসায়
মুহাদ্দিস হিসেবে অধ্যাপনা শুরু করেন।

সেখানে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা, সুনাম আর
কৃতিত্বের সাথে ৯ বছর অধ্যাপনার দায়িত্ব
পালন করেন।

অতঃপর ১৪৪০ হিজরি মোতাবেক ২০১৯
খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারকাযুস সহওয়া আলইসলামিয়া

ইসলামি সিয়াসাত

(‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতি বনাম মডারেট চিন্তাধারা)

{১}

ইসলামি সিয়াসাত

(‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতি বনাম মডারেট চিন্তাধারা)

{১}

মাওলানা আবরার সিদ্দিক

মুশরিফ, উলুমুল হাদিস বিভাগ ও সিয়াসাতে শারইয়্যা বিভাগ
মারকাযুস সহওয়া আলইসলামিয়া ঢাকা

মন্দিপন

প্রকাশন লিমিটেড



প্রকাশক : সন্দিপন প্রকাশন লিমিটেড

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

☎ ০১৪০৬ ৩০০ ১০০, ০১৪০৬ ৩০০ ৫০০

sondiponprokashon@gmail.com

www.facebook.com/sondiponprokashon

www.sondipon.com

ইসলামি সিয়াসাত

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : শাবান ১৪৪৬ হি./ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খৃ.

প্রচ্ছদ : নয়ন সরকার

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবু আবদুল্লাহ সৈকত

ই-বুক পরিবেশক : বইটাই

ইন্ডিয়ান পরিবেশক : নিউলেখা প্রকাশনী

ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর : দ্যা সুন্নাহ স্টোর, ইউকে

মুদ্রণ ও বাঁধাই : বই কারিগর

অনলাইন পরিবেশক : ওয়াফিলাইফ, রকমারি.কম,

দাওয়াহ বুকস, বইসদাই.কম

খুচরা মূল্য: ২৫০৮; Price: 4\$ only

আলইহদা

সেই আরব বীর;

ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে যাঁর গ্রহণ করা প্রতিটি পদক্ষেপ
বিশ্ব তাগুতি শক্তির সুখনিদ্রা হারাম করেছে এবং যাঁর কর্মপন্থা
মুনাফিকদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি করেছে;

যাঁকে আমি পঞ্চদশ শতকের মুজাদ্দিদ এবং শ্রেষ্ঠতম যাহিদ ও
মুজাহিদ মনে করি

إنه رجل باع دنياه بآخرته؛ فجزاه الله عنا وعن
الأمّة المسلمة بما هو أهله

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা আশরাফিল আশ্বিয়া-ই ওয়াল মুরসালীন। ওয়াআলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাসীন।

সন্দীপন প্রকাশনের লক্ষ্য ইসলামি জ্ঞানচর্চার প্রচার-প্রসার। সে-লক্ষ্যে আমরা পাঠকদের জন্য বিভিন্ন গবেষণাধর্মী ও প্রামাণ্য ইসলামি গ্রন্থ বাজারে প্রকাশ করে আসছি। আমরা বিশ্বাস করি, সঠিক জ্ঞানই মানুষের চিন্তা ও জীবনধারাকে শুদ্ধতার পথে পরিচালিত করতে পারে।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা বক্ষ্যমাণ বইটি নিয়ে এসেছি। বইটিতে শ্রদ্ধেয় লেখক গভীরভাবে আলোচনা করেছেন ইসলামের মৌলিক নীতি, ইতিহাস ও জীবনদর্শন সম্পর্কে। তুলে ধরেছেন ইসলামি শাসনের ইতিহাস, খিলাফত, আধুনিক কালের মডার্নিস্ট মতবাদ ও মুতাওয়ারাস বা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাজনীতির ধারা।

বইটি মূলত একটি ভূমিকা। পর্যায়ক্রমে এটির আরও ২-৩ টি খণ্ড আসবে ইনশাআল্লাহ। পরের খণ্ডগুলোতে লেখক আরও ব্যাপকভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন।

আমরা দৃঢ় আশাবাদী, বইটি পাঠকের সামনে এক নতুন বার্তা নিয়ে আসবে। পাঠকদের দেবে ঈমান ও আমলের নতুন দিকনির্দেশনা। আল্লাহ তাআলা বইটিকে উম্মতের জন্য উপকারী ও কল্যাণের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আল্লাহ লেখকের এই কাজকে কবুল করুন। উম্মতের কল্যাণে আরও বেশি কাজ করার তাওফিক দিন।

সূচিপত্র

□ على رسلك أيها القراء! ১১

ভূমিকা..... ১৫

□ এক. 'সিয়াসাতে শারইয়া'র 'তাওয়ারুস' ১৫

✎ নববি যুগ..... ১৫

✎ খিলাফতে রাশেদা ২১

✎ খিলাফতে বনি উমাইয়া..... ২৪

✎ খিলাফতে বনি আব্বাস..... ২৭

✎ খিলাফতে উসমানিয়া ৩৭

✎ খিলাফত ও ইমারতে ইসলামিয়া দুর্বল ও পতনের পর..... ৫৫

✎ হিন্দুস্তান..... ৫৫

✎ আফগানিস্তান ৬৮

✎ চেচনিয়া-ককেশাস ৯২

✎ লিবিয়া..... ৯৪

✎ ফিলিস্তিন ৯৫

✎ আরো কিছু ভূখণ্ডের সংক্ষিপ্ত চিত্র ৯৭

✎ ইসলামের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে বিশ্বময় তৎপরতা..... ১০১

✎ 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতিতে শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে . ১০৬

□ দুই. মডারেট ইসলামি রাজনীতি..... ১০৭

✎ প্রাচ্যবিদদের নথরাঘাত ও

মডারেট ইসলামি রাজনীতির সূচনা ১০৭

✎ মডারেট গবেষক কর্তৃক গণতন্ত্রের আহ্বান ১০৯

৬ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে শূরা আখ্যা দেওয়া	১১২
৬ জিহাদকে শুধু আত্মরক্ষায় সীমাবদ্ধ করা	১১৩
৬ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জিহাদের ভূমিকা অস্বীকার করা	১১৯
৬ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তঃধর্মীয় ঐক্য ও ইন্টারফেইথের আহ্বান	১২২
৬ কাফেরদের সঙ্গে ভালোবাসা-হৃদয়তার দাবি	১২৫
৬ বিশ্বাসের স্বাধীনতার দাবি ও মুরতাদের হত্যার শাস্তি অস্বীকার করা	১২৬
৬ যিম্মীদের স্বাধীনতা-সমানাধিকারের দাবি এবং জিয়য়ার ব্যাপারে কৈফিয়ত দান	১৩২
৬ জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতা ও দেশাত্মবোধের পতাকা উত্তোলন	১৩৭
৬ ‘হিকমত-মাসলাহাত’র নামে ‘মুতাওয়ারাস’ হুকুম পরিবর্তন করে দেওয়া	১৪৫
৬ প্রাচ্যবিদদের যোগ্য উত্তরসূরী ও মডারেট ইসলামি রাজনীতির রূপকার	১৫০
৬ মডারেট পদ্ধতিতে এক ইঞ্চি জায়গাতেও শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি	১৫৪
৬ আকাবিরের একাংশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও মডারেট ইসলামি রাজনীতির পার্থক্য	১৫৪
□ তিন. ‘রাষ্ট্র ও রাজনীতি’ : মডারেট ধারায় রচিত একটি গ্রন্থ..	১৫৯
৬ মডারেট ধারায় রচিত হওয়ার প্রমাণে নমুনাস্বরূপ দুটি উদাহরণ	১৬০
৬ মুহতারাম কি আমাদের কথাগুলো দেখেছেন বা দেখবেন! ..	১৬৬
৬ মুহতারামের নিকট বিনীত অনুরোধ	১৬৭
□ ثَبَّتِ المصادر والمراجع!	১৬৮

بسم الله الرحمن الرحيم

على رسلك أيها القراء!

إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد!

আল্লাহ তাআলার নিকট দ্বীনে হক একমাত্র ইসলাম। কিয়ামত পর্যন্ত সেই দ্বীনের হিফায়তের দায়িত্বও আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। সর্বযুগেই ‘আততায়্যেফাতুল মানসুরা’র মাধ্যমে যেমনিভাবে দ্বীনে ইসলাম কর্তৃত্বের বিজয়ী হওয়ার জানান দিয়েছেন, তেমনিভাবে ‘রিজালুল ইলম ওয়াদদাওয়াহ’র মাধ্যমে দ্বীনে ইসলাম থেকে সব ধরনের ‘তাহরিফ’-অপব্যখ্যা ও ‘ইলহাদ’-বিকৃতি প্রতিহত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُذُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ. (شرح مشکل الآثار للطحاوي، بيان مشکل ما روي عن رسول الله ﷺ في دفعه ميراث المتوفى...، ١٧/١٠، رقم الحديث: ٣٨٨٤، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب الرجل من أهل الفقه...، ٢٠٩/١٠. إسناده حسن بمجموع طرقه)

“প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গই এ ইলমের ধারক-বাহক হবে। যারা তা থেকে সীমালঙ্ঘনকারীদের অপব্যখ্যা, বাতিল অন্বেষীদের সূক্ষ্ম চুরি এবং মূর্খদের বিকৃতি প্রতিহত করবে।”^[১]

দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বহু শাখার ন্যায় ‘ইমামতে উযমা’-খিলাফাহ ও ‘সিয়াসাতুন নাস’ তথা শাসনব্যবস্থার বিষয়াদিও নববি যুগ থেকে কার্যকর হয়ে আসছে। কিন্তু; বিশেষকরে খিলাফত পতনের পর থেকে ‘সিয়াসাতে শারইয়্যাহ’-ইসলামি সিয়াসাতের ক্ষেত্রে নববি যুগ থেকে চলে আসা ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতির বিপরীতে বহু মডারেট চিন্তাধারা তৈরি হয়েছে। আর সেই মডারেট চিন্তাধারায় ইসলামের রূপ দিতে কুরআন-সুন্নাহ ও নববি সিরাতে প্রচুর পরিমাণে ‘তাহরিফ’ করা হয়েছে এবং হয়ে চলছে; যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ‘ইলহাদ’ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, والعياذ

[১] শরহে মুশকিলুল আসার, হাদীস : ৩৮৮৪; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, হাদীস : ২০৯১১, সনদ হাসান

ﷺ"। আলহামদু লিল্লাহ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক যুগে এমন 'রিজালুল ইলম ওয়াদদাওয়াহ' তৈরি করে দিচ্ছেন, যারা ওই সকল অপব্যখ্যা ও সূক্ষ্ম চুরি প্রতিহত করে চলছে। আল্লাহ তাআলা তাদের 'জাযায়ে খাইর' দান করুন, আমিন।

সম্প্রতি 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি' নামে একটি বই হাতে এসেছে, যাতে মডারেট চিন্তাধারার ছাপ স্পষ্ট। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক যে তিনটি বিষয় প্রতিহত করার ভবিষ্যদ্বাণী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে গেছেন; বইটিতে তিনটিই বিদ্যমান। অতিরিক্ত যোগ হয়েছে ইতিহাস উপস্থাপনায় অসংগতি। বইটিতে যে সকল বিষয়ে পাঠক শ্রেণিকে মডারেট চিন্তা গিলানোর চেষ্টা করা হয়েছে, সে সকল বিষয়ে এ পর্যন্ত আরবি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হওয়ায় বইটির পর্যালোচনায় কোনো গ্রন্থ রচনা করা অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিলো। তাই দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও আলোচ্য বইয়ের খণ্ডে কিছু তৈরি করা লিখিত কাজের তালিকায় স্থান পায়নি। তবে সুনির্দিষ্টভাবে একটি বইয়ের পর্যালোচনা অধিক ফলদায়ক হয়; এই বিবেচনায় বড়োদের অনেকের নির্দেশ এবং আহলে ইলম ও আহলে ফযলের এক জামাআতের অনুরোধে একটি পর্যালোচনা গ্রন্থ তৈরির কাজে হাত দেওয়ার নিয়ত করি। পরবর্তী সময়ে কাজ শুরু করার পূর্বেই মনে হলো, শুধু আলোচ্য বইয়ে বিদ্যমান মডারেট চিন্তাধারার স্থূল কথাগুলোর খণ্ডে গ্রন্থ তৈরি করা মৌলিক কাজের ভেতর পড়ে না। তবে সামগ্রিকভাবে 'সিয়াসাতে শারইয়্যা'-ইসলামি সিয়াসাতের উপর কাজের একটি অংশ হিসেবে আলোচ্য বইয়ের পর্যালোচনা যোগ করা যায়। সে হিসেবে প্রথমে আহদে নববি থেকে চলে আসা 'সিয়াসাতে শারইয়্যা'-ইসলামি সিয়াসাতের 'তাওয়ারুস' তথা নববি যুগ থেকে চলে আসা পদ্ধতি এবং কবে থেকে কীভাবে কাদের মাধ্যমে মডারেট চিন্তাধারায় ইসলামের রূপ দেওয়ার সূচনা হয়েছে; সেগুলোর আলোচনা করবো। অতঃপর কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামির আলোকে সে সকল বিষয়ের শরয়ি সমাধান ও বাস্তবতা স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো, যেগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে বা এড়িয়ে গিয়ে আলোচ্য বইয়ে মডারেট চিন্তাকে সন্নিবেশ করা হয়েছে। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে গেলে মডারেট চিন্তায় কেউ প্রতারিত হবে না, ইনশাআল্লাহ।

সে সকল বিষয় থেকে মৌলিক দুটি বিষয় হচ্ছে, এক. গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবরচিত আইনের শাসকের কুফর। দুই. দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বিস্তারিত বিবরণ। দুটি বিষয়ে 'মুসলিমবিশ্ব ও সমকালীন মাসায়েল' (অতি জযবাতি তরুণের পরিমার্জিত সংস্করণ) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই

প্রথম বিষয়ে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা হলেও দ্বিতীয় বিষয়ে একটি শব্দও এখানে বলার প্রয়োজন মনে করছি না। পাঠক এমনটি মনে করলেই হবে যে, ওই গ্রন্থের পুরো বক্তব্য এখানে কপি করা হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থকে একটি ভূমিকা ও দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে :

ভূমিকা;

ভূমিকার অধীনে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে :

এক : সিয়াসাতে শারইয়্যার তাওয়ারুস

দুই : মডারেট ইসলামি রাজনীতি

তিন : 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি' : মডারেট ধারায় রচিত একটি গ্রন্থ

প্রথম অধ্যায়;

প্রথম অধ্যায়ের অধীনে ছয় পরিচ্ছেদে ছয়টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে :

প্রথম পরিচ্ছেদ : গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবরচিত আইনের শাসকের কুফর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্ব কুফরি শক্তির যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিধান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : 'খুরুজ আলাল হুকাম'র 'আসবাব' উপকরণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ফিকহি তাকয়িফ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সনদের শরয়ি পর্যালোচনা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : দিফায়ি জিহাদকে নিষ্প্রাণ করার শর্তাবলী ও ফিকহি বাস্তবতা

দ্বিতীয় অধ্যায় :

'রাষ্ট্র ও রাজনীতি' বইয়ের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

আল্লাহ তাআলা সহিহ কথা সহিহ নিয়তে সহিহ তরিকায় বলার তাওফিক দান

করুন এবং সব ধরনের বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি ও প্রান্তিকতা থেকে মাহফুয রাখুন।

এ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা সহযোগিতা করেছে, সবাইকে 'জাযায়ে

খাইর' দান করুন, আমিন।

فالله هو الموفق وهو المعين

اللَّهُمَّ! اجعلنا من الذين ينفون عن دينك تحريف الغالين وانتحال المبطلين

وتأويل الجاهلين

آمين، يارب العالمين!

ভূমিকা

এক. 'সিয়াসাতে শারইয়া'র 'তাওয়ারুস'^[১]

□ নববি যুগ

[২] শুরুতেই কয়েকটি কথা জেনে রাখা জরুরি:

ক. 'সিয়াসাতে শারইয়া'-ইসলামি সিয়াসাতের ব্যাপক অর্থ থেকে এখানে কয়েকটি বিষয়ের 'তাওয়ারুস' তথা নববি যুগ থেকে চলে আসা পদ্ধতি পেশ করা উদ্দেশ্য। নববি যুগ থেকে শাসনব্যবস্থা ইসলামি শরিআ অনুযায়ী চলে আসছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খিলাফতে বনি উমাইয়া, খিলাফতে বনি আব্বাস ও উসমানি খিলাফতও মৌলিকভাবে শরিআ আইনে পরিচালিত হয়েছে। এ বিষয়ের 'তাওয়ারুস' দেখানোর জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করার প্রয়োজন। সচেতন পাঠক শুধু ড. মুহাম্মাদ আযযুহাইলির «تاريخ القضاء في الإسلام» (তারিখুল কাযা ফিল ইসলাম) এবং উরহান সাদেকের «قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي» (কাওয়ানিনুদ দাওলাতিল উসমানিয়া ওয়াসিলাতুহা বিলমাজহাবিল হানাফি); কিতাবদু'টি অধ্যয়ন করলেও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাবে। তবুও সংক্ষেপে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা এই গ্রন্থেও উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। তবে এই গ্রন্থে আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, খলিফা নির্বাচন করা, দারুল ইসলামের সীমানা রক্ষা ও তাতে অবস্থানকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দারুল ইসলামের পরিধি বিস্তৃত করা, দারুল ইসলামের কোনো অংশ হত্যাভী হয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধার করা, 'ইরতিদাদ' ও 'বাগাওয়াত'-বিদ্রোহের শিকার সম্প্রদায়কে দমন করা, শাসকশ্রেণি থেকে 'কুফরে বাওয়াহ'-স্পষ্ট কুফর প্রকাশ পেলে বা তারা উম্মতে মুসলিমার মাঝে 'কিতাবুল্লাহ' বাস্তবায়ন না করলে তাদের বিরুদ্ধে 'খুরুজ' করা এবং খিলাফত ও শরিআ শাসন বিলুপ্ত হলে তা পুনরুদ্ধার করা; ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে বর্তমানে ভিন্ন চিন্তাধারা প্রকাশ করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে খাইরুল কুরুন থেকে চলে আসা পদ্ধতির 'তাওয়ারুস' পেশ করা।

খ. ইতিহাসের পাতা থেকে উপর্যুক্ত বিষয়াদির সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক অংশ নমুনাস্বরূপ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু সব একত্র করা উদ্দেশ্য নয়, তাই আমার অজান্তে বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বহু অংশ বাদ যাওয়া একেবারেই স্বাভাবিক।

গ. ইতিহাসের যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ইতিহাসের পাতায় প্রসিদ্ধ হওয়ায় একান্ত প্রয়োজন ছাড়া উদ্ধৃতি উল্লেখ করিনি। শুরুর দিকের ইতিহাস সাধারণত হাফেয ইবনে কাসিরের 'আলবিদায় ওয়াননিহায়া' ও হাফেয সুয়ুতির 'তারিখুল খুলাফা' থেকে নেওয়া হয়েছে। উসমানি সালতানাতের বিষয়গুলো এবং পরবর্তী কিছু ভূখণ্ডের সংক্ষিপ্ত চিত্র সাধারণত «مختصر تاريخ الدولة العثمانية» (মুখতাসারু তারিখিদ দাওলাতিল উসমানিয়া), হিন্দুস্তানের মৌলিক ইতিহাস 'উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযি' এবং আফগানিস্তানের ইতিহাস সাধারণত মাওলানা ইসমাইল রাইহানের 'তারিখে আফগানিস্তান' থেকে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ড. আহমাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে উসমান আলকাযির «دعوة التريب بين الأديان» (দাওয়াতুত তাকরিব বাইনাল আদইয়ান) কিতাব থেকে বিশেষ সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এক সময়ে প্রেরণ করেছিলেন, যখন পৃথিবী নিকৃষ্টতম পর্বে অধঃপতিত এবং কুফর-শিরক, অন্যায়-অবিচার ও অশ্লীলতা-কুসংস্কারের ভারে ন্যুজ। ধর্মহীনতা, বিভিন্ন কুফর-শিরকের কর্মকাণ্ডে ধর্মের পোশাক পরানোর ব্যাপকতা, গোত্রীয় ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতা, গোত্রীয়-আঞ্চলিক-ধর্মীয় প্রভাবশালীদের বা অনেকের মতামতে গ্রহণ করা কৃষ্টি-কালচার, বাদ-মতবাদ, নিয়মনীতিকে জীবনবিধান হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রবণতা, পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরার প্রাদুর্ভাব এবং প্রভাবশালী কর্তৃক সম্পদকে কুক্ষিগত করে দুর্বলকে আরো দুর্বল করার পুঁজিবাদী হিংস্রতা; ইত্যাদি জাহেলিয়াতের প্রতাপে যখন পৃথিবী ঘোর অমানিশায় আচ্ছন্ন, তখন সেই কুফর-শিরক, ধর্মহীনতা, ইলহাদ, জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতা, মানবের বানানো আইন ও রীতিনীতি, গোঁড়ামি ও পুঁজিবাদী হিংস্রতার বেড়াজাল থেকে মানবসভ্যতাকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তাআলা রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাওহিদের নুর দিয়ে প্রেরণ করেন।

জাহেলিয়াতের গোমরাহি থেকে মুক্ত করতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে মুমিনদের উপর আল্লাহ তাআলার কৃত ইহসান ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্বের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَنَفَى ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদের পরিশুদ্ধ করে এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতোপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।”^[৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়ে পাঠানোর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ

[৩] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৩

كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“তিনিই তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।”^[৪]

পূর্বের সকল শরিআত রহিত করার পাশাপাশি দলিলের মাধ্যমে দ্বীনে ইসলামকে স্পষ্টকরণ এবং কর্তৃত্বের বিজয়ী করার যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, তা হয়েছে এবং হয়ে চলছে।

দ্বীনকে কর্তৃত্বের বিজয়ী করার পদ্ধতিও আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের নির্দেশ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতোক্ষণ না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তাহলে যালেমরা ছাড়া কারও উপর কঠোরতা নেই।”^[৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে এবং তাঁকে প্রেরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা অনুযায়ী ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমে গোপনে দাওয়াতের কাজ করেছেন। যখন প্রকাশ্যে দাওয়াতের নির্দেশ আসলো তখন প্রকাশ্যে দাওয়াহ দিয়েছেন। কুফরারে কুরাইশের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং নির্যাতনের কারণে যখন দাওয়াতের কাজ নির্বিঘ্নে করা সম্ভব হচ্ছিলো না, তখন ‘নুসরত’ তলাশ করেছেন। ‘নুসরত’র আশায় হজের সময় বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিজেকে পেশ করে বলেছেন, ‘কেউ কি আছে যে আমাকে তার গোত্রের নিকট নিয়ে যাবে! কুরাইশ আমাকে আল্লাহ তাআলার বাণী পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে’।

মদিনাবাসীর বসবাস যেহেতু ইহুদিদের সঙ্গে ছিল, আর ইহুদিদের থেকে তারা তাওরাতের বিভিন্ন কথা শুনত। শেষ যমানার নবির আগমন এবং তাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার কথাও তারা শুনে আসছিলো। হয়তো সে

[৪] সূরা তাওবা, ৯ : ৩৩

[৫] সূরা বাকারা, ২ : ১৯৩

কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াহ কবুল করা তাদের জন্য সহজ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরকে সেটির জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছেন। হজের সময় তাদের এক কাফেলা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই আহ্বান শুনলেন, তাঁর হাতে ইমানের বাইআত করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কুরআনে কারিম শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসআব ইবনে উমাইর রাঃ কে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন।

পরবর্তী বছর হজের সময়ে মদিনা থেকে আরো বড়ো কাফেলা মক্কা আসলো। এদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মদিনার কাফেলার সামনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের আশা ব্যক্ত করলেন এবং তাদের পক্ষ হতে ‘নুসরত’র প্রতিশ্রুতি চাইলেন। তারা প্রতিশ্রুতি দিলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাইআত নিলেন; এটি ‘বাইআতুল হারব’ তথা যুদ্ধের বাইআতও ছিল।^[৬] বলা যায়, ইসলামকে কর্তৃত্বের বিজয়ী করার মাধ্যম ‘জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ’র পূর্ব প্রস্তুতি শুরু করেছেন তথা ‘ইদাদুল জিহাদের ‘মারাহালা’য় উপনীত হয়েছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করে সেখানে ‘আহকামুল ইসলাম’ জারি করার মাধ্যমে যখন মদিনা ‘দারুল ইসলাম’ হিসেবে সাব্যস্ত হলো এবং এর মাধ্যমে মুসলিমদের ‘মারকাযিয়াত’ কেন্দ্রীকরণ অর্জন হলো, আর ইতোপূর্বে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে জিহাদের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে, তাই হিজরতের এক বছরের মাথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চূড়ান্ত পর্ব তথা ‘জিহাদ-কিতালের’ মাধ্যমে ইসলামকে কর্তৃত্বের বিজয়ী করার বরকতময় ‘মারাহালা’র সূচনা করেন। উম্মাহর সামনে রেখে যান ইসলামকে কর্তৃত্বের বিজয়ী করতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার এক চমৎকার আদর্শ। আর তা হচ্ছে, দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতাল।

এটি একেবারেই স্বাভাবিক একটি বিষয়, যেকোনো দাওয়াহ, আদর্শ, তাহযিব ও মতবাদ এবং সেটির কেন্দ্র-চাই তা হক হোক বা বাতিল- কখনো যথাযথ সংরক্ষিত থাকবে না, যতোক্ষণ না তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। হক হলে আরো বেশি জরুরি; কেননা, শয়তান তার বন্ধুদের মাধ্যমে হকের আহ্বানকে দমন করতে বিন্দুমাত্র অলসতা করে না। তবে ইসলাম যেহেতু সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য; অপরদিকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়ায় যেহেতু সকল কাফেরই যালেম এবং কুফর সবচেয়ে বড়ো ফিতনা ও শিরক অনেক বড়ো যুলম,

[৬] সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/৩২৯, দালায়েলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি, ২/৩৩০, তারিখে তবারি, ২/২৭৩, আলকামিল ফিত তারিখ, ১/৫৭৭।

এছাড়াও সকল কাফেরই -অপ্রাপ্তবয়স্ক, মহিলা, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ইত্যাদি যে সকল শ্রেণিকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে; তারা ব্যতীত- ‘মুহারিব’ যোদ্ধা-চাই তা "بالفعل" কার্যত হোক বা "بالقوة" ফলত-, তাই কুফরের ফিতনাকে খতম ও কাফেরদের দাপট বিচূর্ণ করে ইসলামকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার মাধ্যমে সকল মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ইসলাম গ্রহণ করে বা ইসলামের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে আশ্রয় দিতে এই সশস্ত্র ব্যবস্থা শুধু প্রতিরক্ষায় সীমাবদ্ধ রাখা যথেষ্ট নয়, বরং আগ বাড়িয়ে কুফরি শক্তিকে পরাভূত করাও জরুরি। অর্থাৎ ইসলামকে বিজয়ী করার এই জিহাদ-কিতাল হবে "بين الدفع والطلب" তথা আগত কুফরি শক্তির হামলা প্রতিহত করা ও অন্য কুফরি শক্তি তালাশ করে পরাভূত করা। আল্লাহ তাআলা পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত পর্ব তথা জিহাদ-কিতালের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম দিকের জিহাদগুলো সাধারণত প্রতিরক্ষামূলক হলেও ‘গাযওয়াতুল আহযাব’ তথা খন্দকের যুদ্ধের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় ‘ইকদামি’ জিহাদের ঘোষণা দিয়েছেন।

মক্কার তেরো বছর ও মদিনার দশ বছরজুড়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ‘ওহি মাতলু-ওহি গাইরে মাতলু’র মাধ্যমে শরিআত প্রবর্তন হয়েছে; কখনো পূর্বের কোনো বিধান রহিত হয়েছে, আবার অনেক নতুন নতুন বিধান এসেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহর সামনে শরিআতের বিবরণ দিয়েছেন, তাদের কিতাব ও হিকমাহ-সুন্নাহ শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের তাযকিয়া-আত্মশুদ্ধি করে জানা বিষয়কে আমলে বাস্তবায়ন করার মেহনত করেছেন। অন্যান্য সকল ইবাদাত-আমলের ন্যায় কুফরি শক্তির আক্রমণ থেকে ইসলাম, মুসলমান ও দারুল ইসলামের সীমানা রক্ষা করা, কুফরি শক্তিকে পরাভূত করে দারুল ইসলামের পরিধি বিস্তৃত করা এবং ইসলামের স্বকীয়তা বজায় রেখে ইসলামকে সকল দ্বীনের উপর কর্তৃত্বের বিজয়ী করার জন্য ‘দিফায়ি’ ও ‘ইকদামি’ জিহাদের ধারাও চলমান রেখেছেন -যে ধারা দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত চলমান থাকার ভবিষ্যদ্বাণী নববি জবানে উচ্চারিত হয়েছে-।

আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে পূর্ণ করে ঘোষণা দিয়েছেন,

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

| “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং

তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।”^[৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كُنْهَارُهَا

“আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ তরিকার উপর রেখে যাচ্ছি; যেটির রাত দিনের মতো (অর্থাৎ যে তরিকার স্বচ্ছতা সর্বাবস্থায় সমান)।”^[৮]

আল্লাহ তাআলা যে দ্বীন ও নিয়ামত পূর্ণ করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে যে স্বচ্ছ তরিকার উপর রাখার কথা ব্যক্ত করেছেন তা ‘আকায়েদ, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক, খিলাফত-ইমামতে উযমা, সিয়াসাতুন নাস’ ইত্যাদি সবকিছু এবং প্রত্যেক মুসলিমের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, ইসলামি হুকুমতের পর্যায় ও ইসলামি হুকুমতের বাইরের পরিমণ্ডল সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা-কাজে সাহাবায়ে কেরামকে পূর্ণ দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন। সেই দ্বীনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ‘খিলাফত-ইমামতে উযমা ও সিয়াসাতুন নাস’ তথা শাসনব্যবস্থা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই ইমামতে উযমার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খিলাফতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুসলিমাকে দারুল ইসলামে ‘মুতামাক্কিন ফিল আরয’ তথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং উম্মতে মুসলিমার ‘তামাক্কুন ফিল আরয’ তথা দারুল ইসলামে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্জন আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই শুরু হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে উম্মাহর দায়িত্ব হচ্ছে, দ্বীনের অন্যান্য সকল ‘শু’বা’-শাখার পাশাপাশি দ্বীনকে কর্তৃত্বের বিজয়ী করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে সেই খিলাফত ও ‘তামাক্কুন ফিল আরয’কে ধরে রেখে দারুল ইসলামের পরিধি বৃদ্ধি করা, দারুল ইসলামের সীমানা বা কোনো মুসলিম আক্রান্ত হলে তা প্রতিহত করা, দারুল ইসলামের কোনো অংশ হাতছাড়া হয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধার করা, দারুল ইসলামের ভেতরে কোনো অংশ ‘ইরতিদাদ’র শিকার হলে অথবা ‘তায়েফায়ে মুমতানিআ’ সাব্যস্ত হলে বা

[৭] সূরা মায়িদা, ৩ : ৫

[৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ১৭১৪২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৪৩

নিষ্ঠাবান মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে ‘বাগাওয়াত’-বিদ্রোহ করলে তাদের দমন করা, স্বয়ং শাসকশ্রেণির ‘কুফরে বাওয়াহ’-প্রকাশ্য কুফর প্রমাণ হলে বা উদ্ভ্রমে মুসলিমার মাঝে ‘কিতাবুল্লাহ’ বাস্তবায়ন না করলে (চাই সেটিকে ‘কুফরে বাওয়াহ’ বলা হোক অথবা তাদের ‘তায়্যেফায়ে মুমতানিআ’ আখ্যা দেওয়া হোক), অথবা (সালাফের একাংশের অবস্থান অনুযায়ী) শাসক ফাসেক-যালেম হলে তাদের বিরুদ্ধে ‘খুরুজ’ করা, এবং মূল থেকে খিলাফতের পতন হলে তা পুনরুদ্ধার করা। ‘ইসতিতাআত’-সক্ষমতা থাকলে তো স্পষ্ট, আর ‘ইসতিতাআত’ না থাকলে ‘ইসতিতাআত’ অর্জন করার জন্য নববি আদর্শ অনুযায়ী ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া তথা দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের সুপরিকল্পিত ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি গ্রহণ করা। প্রয়োজন শুধু "التكليف الفقهي" এর যথাযথ অনুধাবন ও বাস্তবায়ন।

□ খিলাফতে রাশেদা

সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে, আলহামদু লিল্লাহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তে আবু বকর রাঃ খলিফা নিযুক্ত হন। আবু বকর রাঃ খলিফা হওয়ার পরপরই জাইশে উসামাকে প্রেরণ করেন; দারুল ইসলামের সীমানার সুরক্ষা ও বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে যে জিহাদের ঝাণ্ডা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ওফাতের পূর্বে উসামা রাঃ এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। জিহাদের মাধ্যমে ‘ইরতিদাদ’র ফিতানকে সমূলে উৎপাটন করেন। ইসলামের দাওয়াতকে ধীরে ধীরে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে, ইসলামকে কর্তৃত্বের বিজয়ী করে মানুষদেরকে ইসলাম ও ইসলামের বিধিবিধানের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিতে এবং দারুল ইসলামের সীমানার বিস্তৃতির লক্ষ্যে তৎকালীন দুই পরাশক্তি পারস্য ও রোমের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন, মুজাহিদদের বিভিন্ন জামাআত তৈরি করেন এবং উভয় পরাশক্তির মোকাবেলায় পাঠিয়ে দেন। পারস্য ও রোমের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা আবু বকর রাঃ এর যুগেই হয়েছিল এবং পারস্যের আয়ত্তাধীন কিছু অঞ্চল খালেদ বিন ওলিদ রাঃ এর নেতৃত্বে তাঁর যুগেই বিজয় হয়েছিলো। যদিও খালেদ বিন ওলিদ রাঃ ও তাঁর সঙ্গে থাকা মুজাহিদদের একাংশকে রোমান সৈন্যদের মোকাবেলায় পাঠিয়ে দেওয়ায় পারস্যের মোকাবেলায় থাকা মুজাহিদদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কিছু অঞ্চল হাতছাড়াও হয়ে যায়। আবু উবাইদ আসসাকাবি রাঃ ও মুসান্না ইবনে হারেসা পারস্যের মোকাবেলায় জিহাদ পরিচালনা করতে থাকেন এবং

এক পর্যায়ে আবু উবাইদ রা শহিদ হয়ে যান। আবু বকর রা ওফাতের পূর্বে উমর রা-কে যে ওসিয়তগুলো করেছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত ছিলো, পারস্যের জিহাদে মুসান্না ইবনে হারেসার সঙ্গে যুক্ত হতে খুব দ্রুত মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

আবু বকর রা এর ওফাতের পর তাঁর 'ওলি আহদ' হিসেবে উমর রা খলিফা নিযুক্ত হন। তাঁর যুগেও পূর্বের ধারাই অব্যাহত থাকে। শুরুতেই তিনি আবু বকর রা এর ওসিয়ত অনুযায়ী পারস্যের মোকাবেলায় জিহাদের জন্য মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করেন, অতঃপর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা এর নেতৃত্বে মুজাহিদদের এক বড়ো কাফেলা পারস্যের মোকাবেলায় জিহাদে প্রেরণ করেন। অপরদিকে রোমানদের মোকাবেলায় মুজাহিদদের কাফেলা তখন নিজেদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। উমর রা সেখানে খালেদ বিন ওলিদ রা এর পরিবর্তে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা কে জিহাদের আমির হিসেবে নিযুক্ত করেন। উভয় জিহাদ তথা ইয়ারমুক ও কাদেসিয়ায় মুসলিমদের অস্বাভাবিক বিজয় অর্জন হয়। একে একে বিভিন্ন অঞ্চল মুসলিমদের হাতে আসতে থাকে এবং তৎকালীন দুই পরাশক্তির দাপট চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের কর্তৃত্বের বিজয় ব্যাপক হতে থাকে এবং দারুল ইসলামের সীমানা বিস্তৃত হতে থাকে। তাঁর যুগেই সম্পন্ন হয় শাম, ইরাক ও মিশরের বিজয় এবং তৎকালীন পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের উপর ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, আলহামদু লিল্লাহ।

উমর রা এর শাহাদাতের পর 'আহলুল হাল্লি ওয়ালআকদ'র সিদ্ধান্তে উসমান রা খলিফা নিযুক্ত হন; ছয় সদস্য বিশিষ্ট যে 'আহলুল হাল্লি ওয়ালআকদ' উমর রা ঠিক করে দিয়েছিলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা এর হাতে ন্যস্ত করা হলে তিনি মদিনার অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামেরও মতামত যাচাই করে খলিফা হিসেবে উসমান রা এর হাতে বাইআত করেন। উসমান রা এর যুগেও পূর্বের ধারাই অব্যাহত থাকে। জিহাদের মাধ্যমে দারুল ইসলামের পরিধি আরো বিস্তৃত হতে থাকে। তাঁর যুগেই আফ্রিকা ও আন্দালুস বিজয়ের সূচনা হয়, কুবরুসের বিজয় সম্পন্ন হয়, ইস্কান্দারিয়াবাসী চুক্তি ভঙ্গ করলে আমর ইবনুল আস রা এর নেতৃত্বে কিছু অংশ কিতাল ও কিছু অংশ চুক্তির মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হয় এবং মালাতইয়াসহ আরো বিভিন্ন যুদ্ধ সংগঠিত হয়। অতঃপর অভ্যন্তরীণ ফিতনার কারণে বিজয়ের ধারা কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়।

উসমান রা এর শাহাদাতের পর মদিনার নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরামের বাইআতের মাধ্যমে আলি রা খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন। আলি রা এর যুগে নিজেদের মতানৈক্য পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ানোর কারণে

দারুল ইসলামের পরিধি বিস্তৃতির ধারা বাধাগ্রস্ত হলেও দারুল ইসলামের সীমানা অরক্ষিত রাখা হয়নি, বরং প্রত্যেকেই দারুল ইসলামের সীমানা সুসংহত রাখার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন।^[৯] তাঁর যুগে তাঁরই নেতৃত্বে ‘বাগি’গোষ্ঠী খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাদের পরাভূত করা হয়; যেটির ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন।

আলি রা এর শাহাদাতের পর তৎকালীন দারুল খিলাফাহ কুফার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বাইআতের মাধ্যমে হাসান রা খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন। কিছুকাল খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পর মুয়াবিয়া রা এর সাথে সমঝোতা করে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব থেকে সরে আসেন এবং মুয়াবিয়া রা এককভাবে পুরো দারুল ইসলামের খলিফা সাব্যস্ত হয়ে যান। হাসান রা এর খিলাফতকাল শেষ হওয়ার মাধ্যমে ‘খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ’র পরিসমাপ্তি ঘটে; যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

‘খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ’র সময়কালেই ইসলামকে কর্তৃত্বের বিজয়, ইমামতে উযমা-খিলাফতের দায়িত্ব ও ‘সিয়াসাতুন নাস’র মৌলিক শরয়ি দিকগুলো উম্মাহর সামনে নির্ধারিত হয়ে গেছে।^[১০] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের অবস্থানের আলোকেই তা নির্ধারিত হয়েছে। বিচার ব্যবস্থাসহ ‘সিয়াসাতুন নাস’র সকল শাখা যে পূর্ণ শরিআ অনুযায়ী হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না; তাই সকল

[৯] যেটির স্পষ্ট নমুনা রোমের রাজাকে উদ্দেশ্য করে লেখা মুয়াবিয়া রা এর চিঠি। মুয়াবিয়া রা-কে আলি রা-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত দেখে তৎকালীন রোমের রাজার মনে যখন শাম আক্রমণের লালসা উঁকি দেয় এবং সে উদ্দেশ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে সৈন্যদলও একত্র করতে থাকে, তখন মুয়াবিয়া রা রোমের রাজাকে স্পষ্ট সতর্কবার্তা প্রদান করে বলেন,

والله! لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين! لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيغن عليك الأرض بما رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف وبعث يطلب الهدنة. (البداية والنهاية لابن كثير، ১/১১৬)

“আল্লাহর কসম! হে অভিশপ্ত! যদি তুমি বিরত না হও এবং তোমার অঞ্চলে ফিরে না যাও, তাহলে আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে সমঝোতা করে তোমাকে তোমার সকল অঞ্চল থেকে বের করে দেবো এবং প্রশস্ত পৃথিবীকে তোমার জন্য সংকীর্ণ করে তুলবো।” তখন রোমের রাজা ভয় পেয়ে হাত গুটিয়ে নেয় এবং সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়।” (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৮/১১৬)

সাহাবায়ে কেরামের এমন আদর্শ আমাদের জন্য অন্যতম একটি পাথেয়। পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সম্মিলিত শত্রুকে সুযোগ দেননি, বরং সম্মিলিত শত্রুকে প্রতিহত করতে নিজেদের মাঝে সমঝোতার বার্তা দিয়েছেন। অথচ আমরা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে এক হওয়া তো দূরের কথা, বরং নিজের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শত্রুকে লেলিয়ে দিতে পছন্দ করি, «والعياذ بالله»।

[১০] বাকি ‘ইনতিযামি’-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়াদি সে কালেও যুগের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন হয়েছে এবং সর্বযুগেই তা পরিবর্তনশীল।

খলিফাকে বাইআত দেওয়া হতো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের আনুগত্যের শর্তে এবং তাঁরা বাইআত পরবর্তী খুতবায় তা স্পষ্ট করে দিতেন।^[১১] খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতিও নির্ধারিত হয়ে গেছে; পূর্বের খলিফা পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করে দিবেন; যেটিকে ‘ওলি আহদ’ পদ্ধতি বলা হয় অথবা ‘আহলুল হাল্লি ওয়ালআকদ’-মজলিসে গুরা তা নির্ধারণ করবেন। ‘আহলুল হাল্লি ওয়ালআকদ’ পূর্বের খলিফা কর্তৃক নির্ধারিত থাকবে, পূর্বের খলিফা নির্ধারণ না করলে স্বাভাবিকভাবে যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ থাকেন তারাই ‘আহলুল হাল্লি ওয়ালআকদ’ হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করবেন। আর জিহাদের মাধ্যমে দারুল ইসলামের সীমানা রক্ষা করা ও তাতে অবস্থানকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দারুল ইসলামের পরিধি বিস্তৃত করা, দারুল ইসলামের কোনো অংশ হাতছাড়া হয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধার করা এবং ‘ইরতিদাদ’ ও ‘বাগাওয়াত’র শিকার সম্প্রদায়কে দমন করার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেছে। শাসকশ্রেণি থেকে ‘কুফরে বাওয়াহ’ প্রকাশ পেলে বা তারা উম্মতে মুসলিমার মাঝে ‘কিতাবুল্লাহ’ বাস্তবায়ন না করলে তাদের বিরুদ্ধে ‘খুরুজ’র বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে; খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে যেটির বাস্তবতা কল্পনাও করা যায় না। হ্যাঁ! সেটির বাস্তবতা পরবর্তী সময়ে সামনে এসেছে। তেমনিভাবে শাসক প্রথম থেকেই ফাসেক-যালেম হলে তাকে খলিফা হিসেবে গ্রহণ না করা বা খলিফা হওয়ার পর তার থেকে ফিসক-যুলম প্রকাশ পেলে তার বিরুদ্ধে ‘খুরুজ’র বাস্তবতাও পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কেরামসহ সালাফের একাংশের ‘ইজতিহাদ’ ও অবস্থানের আলোকে সামনে এসেছে।

□ খিলাফতে বনি উমাইয়া

হাসান রাঃ এর সমঝোতার মাধ্যমে মুয়াবিয়া রাঃ এককভাবে পুরো দারুল ইসলামের খলিফা সাব্যস্ত হয়ে যান। মুয়াবিয়া রাঃ এর যুগেও মৌলিকভাবে পূর্বের ধারাই অব্যাহত থাকে। জিহাদের মাধ্যমে দারুল ইসলামের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। রোমের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। রোমের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ করতে করতে মুজাহিদগণ কুস্তনতিনিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং বহু অঞ্চল দারুল ইসলামের অধীনে আসে।

মুয়াবিয়া রাঃ এর ইত্তিকালের পর তাঁর ‘ওলি আহদ’ হিসেবে ইয়াযিদ খলিফা

[১১] নমুনাস্বরূপ দেখুন, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৬/২৯১, ৭/১৪২, ৭/২২, ৮/১৫, উয়ুনুল আখবার, ইবনে কুতাইবা, ১/৫৪-৫৫, ২/২৩৪-২৩৫।

হিসেবে নিযুক্ত হয়। ইয়াযিদকে খিলাফতের যোগ্য মনে না করায় মক্কা, মদিনা ও কুফার অনেকেই তাকে বাইআত দিতে অস্বীকৃতি জানান। বিশেষকরে হুসাইন   ও আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর  ; উভয়েই ইয়াযিদের বিরুদ্ধে ‘খুরুজ’ করেন। কুফাবাসী চিঠির মাধ্যমে হুসাইন   এর নিকট বাইআতের অঙ্গীকার করায় তিনি কুফার উদ্দেশে রওয়ানা করেন। পরবর্তী সময়ে কুফাবাসীর গাদ্দারি এবং শিমার (শামির) ইবনে যিল জাওশানের মাধ্যমে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের হিংস্রতায় কারবালায় হুসাইন   এর শাহাদাতের সেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, যা শতকের পর শতক ধরে প্রতিটি মুমিনের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে রেখেছে। আর আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর   এর বিরুদ্ধে ইয়াযিদ একাধিকবার অভিযান পরিচালনা করেও তাঁকে তাঁর অবস্থান থেকে সরাতে পারেনি। ইয়াযিদের আমলেও দারুল ইসলামের বিস্তৃতির ধারা অব্যাহত ছিল। রোম ও বারবারদের মোকাবেলায় মুসলিম সৈন্যরা পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো।

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর   এর খিলাফত আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে। অধিকাংশ অঞ্চল তাঁর অধীনে চলে আসে। শামের কিছু অঞ্চলের উপর মারওয়ান ইবনুল হাকামের অবৈধ কর্তৃত্ব ছিল। মারওয়ান মৃত্যুর পূর্বে তার ছেলে আবদুল মালিককে ‘ওলি আহদ’ হিসেবে ঘোষণা করে। মারওয়ানের মৃত্যুর পর আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ক্ষমতায় বসে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হতে থাকে। বিশেষকরে ‘সাইফু বানি উমাইয়া’-বনি উমাইয়ার তরবারি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামসহ অগণিত মুসলিমের প্রচুর পরিমাণে রক্ত ঝরিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। এক পর্যায়ে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নেতৃত্বে মক্কা মুকাররমায় অভিযান পরিচালনা করে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর  -কে শহিদ করে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর   এর খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান পুরো দারুল ইসলামের একক খলিফা সাব্যস্ত হয়ে যান।

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান খলিফা হওয়ার পর তার যুলম এবং তার ছত্রছায়ায় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ফিসক ও যুলম চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। তাই হাজ্জাজ ইরাকের গভর্নর থাকাকালীন ফুকাহায়ে তাবেয়িনের এক জামাআতসহ অনেকেই ‘খুরুজ’র জন্য সংঘবদ্ধ হতে থাকেন। যাদের মধ্যে ইমাম শা‘বি, ইমাম সায়িদ ইবনে জুবাইর, ইমাম আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা ও ইমাম আবুল বাখতারির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বরং বলা হয়, প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম থেকে পাঁচশ এবং অপ্রসিদ্ধ থেকে এক হাজারের মতো মুহাদ্দিস-ফকিহ

তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।^[১২] এক পর্যায়ে আবদুর রহমান ইবনুল আশআসের নেতৃত্বে 'খুরুজ' করা হয়। তবে তাঁরা সফল হতে পারেননি, বরং হাজ্জাজের হাতে পরাজয় বরণ করেন।

উমাবি খলিফাদের যুলম, ফিসক ও শরিআতের বিভিন্ন বিষয়ে উদাসীনতার বিশাল দাস্তান থাকলেও তাদের যুগেও মৌলিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ তথা শরিয়তে ইসলামিয়াই হাকেম ছিল।^[১৩] খলিফা নির্বাচন 'ওলি আহদ' পদ্ধতিতে করা হয়েছে। তবে জিহাদের মাধ্যমে কুফরি শক্তি থেকে দারুল ইসলাম ও মুসলিমদের সুরক্ষায়, দারুল ইসলামের পরিধির বিস্তৃতিতে, হাতছাড়া হওয়া ভূখণ্ডের পুনরুদ্ধারে এবং খারেজিদের দমনে পূর্বের ধারাই পরিপূর্ণ অব্যাহত ছিল। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে, বিশেষকরে তার 'ওলি আহদ' হিসেবে নিযুক্ত পরবর্তী খলিফা তার ছেলে ওলিদের যুগে অস্বাভাবিক বিজয় সাধিত হয় এবং দারুল ইসলামের পরিধি অকল্পনীয় বিস্তৃতি লাভ করে। পশ্চিমে মুসা ইবনে নুসাইর ও তারেক ইবনে যিয়াদের নেতৃত্বে ইসলামের ঝাণ্ডা আন্দালুসে এবং পশ্চিমের একেবারে শেষ প্রান্ত 'তনজা'য় পৌঁছে যায়। পূর্বে কুতাইবা ইবনে মুসলিমের সৈন্যদল খোরাসান হয়ে চীনের কাশগড় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তার হাতে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। একদিকে মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান রোমের বিরুদ্ধে একের পর এক জিহাদের নেতৃত্ব দিতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের শাসনকালে কুস্তনতিনিয়ার যুদ্ধ করেন এবং সেখানে মসজিদে মাসলামা নির্মাণ করেন। অপরদিকে মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেমের তরবারি সিন্ধের রাজা দাহের ইবনে সাসসার (داهرين صصة) ঘাড়ে আঘাত করে এবং সিন্ধ বিজয় করে হিন্দের মুলতান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের 'বাগি'গোষ্ঠী খারেজিদেরকে মুহাল্লাব ইবনে আবি সুফরার নেতৃত্বে কঠিন হস্তে দমন করা হয়।^[১৪] ওলিদ ইবনে আবদুল মালিকের খিলাফতকালে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামকে কর্তৃত্বের বিজয় করার ধারা এতোটাই ব্যাপক ছিলো যে, হাফেয ইবনে কাসির ওলিদের যুগের জিহাদকে উমর রাঃ এর খিলাফতকালের

[১২] তারিখে উম্মতে মুসলিমা, মুহাম্মাদ ইসমাইল রাইহান, ৩/৫৬-৫৭।

[১৩] বনি উমাইয়ার খিলাফতকালে বিচার ব্যবস্থাসহ 'সিয়াসাতুন নাস'র মৌলিক বিষয়াদি সামগ্রিকভাবে শরিআ অনুযায়ী বাস্তবায়ন হওয়ার বিষয়টি বিস্তারিত দেখা যেতে পারে ড. মুহাম্মাদ আযযুহাইলির « تاريخ القضاء في الإسلام » (তারিখুল কাযা ফিল ইসলাম, পৃ: ১৬১-২১৫) থেকে এবং সংক্ষেপে দেখা যেতে পারে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রধান বিচারপতি মাওলানা আবদুল হাকিম হক্কানির «الإمارة الإسلامية ونظامها» (আলইমারাতুল ইসলামিয়া ওয়ানিয়ামুহা, পৃ: ২১১-২১৪) থেকে।

[১৪] খারেজিদের দমনে মুহাল্লাব ইবনে আবি সুফরার অবদান চিরস্মরণীয়। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাঃ এর খিলাফতকালে মুসআব ইবনু যুবাইরের অধীনে খারেজিদের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে নেন এবং আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান খলিফা হওয়ার পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অধীনেও সেই অবস্থান জারি রাখেন।

জিহাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ওলিদ ইবনে আবদুল মালিকের পর ‘ওলি আহদ’ হিসেবে তার ভাই সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক খলিফা নিযুক্ত হলে একই ধারা অব্যাহত থাকে। তার যুগে জুরজান, তবারিস্তানসহ বিভিন্ন অঞ্চল দারুল ইসলামের অধীনে চলে আসে।

সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের পর তার ‘ওলি আহদ’ হিসেবে তার চাচাতো ভাই উমর ইবনে আবদুল আযিয খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর যুগ ইসলামের সোনালি যুগের একটি অধ্যায়। স্বল্প মেয়াদের হলেও তাঁর শাসনকাল ছিলো খিলাফতে রাশেদার প্রতিচ্ছবি। তাঁর যুগে মুজাহিদের কাফেলা ফ্রান্সের দক্ষিণে প্রবেশ করে এবং কিছু অঞ্চল বিজয় করে ফরাসিদের বিরুদ্ধে জিহাদ জারি রাখে। যদিও পরবর্তী সময়ে হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের খিলাফতকালে ‘বালাতুশ শুহাদা’ নামক স্থানে ফরাসিদের বড়ো ধরনের মোকাবেলার মুখে মুসলিম সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং তাতে তৎকালীন আন্দালুসের আমির আবদুর রহমান গাফেকি শাহাদাতবরণ করেন।

পরবর্তী খলিফা ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক এবং তার পরবর্তী খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের খিলাফতকালেও জিহাদ ও বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে যায়েদ ইবনে আলির নেতৃত্বে ‘খুরুজ’ হয়েছিল,^[১৫] কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। ১২৫ হিজরিতে হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর বনি উমাইয়ার খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জিহাদ ও বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকলেও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে অনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে ১৩২ হিজরিতে বনি উমাইয়ার সর্বশেষ খলিফা মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান আলহিমারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে হত্যা করা হয়। এর মাধ্যমে খিলাফতে বনি উমাইয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে।

□ খিলাফতে বনি আব্বাস

শেষ দিকে যখন উমাবি খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অপরদিকে আবু মুসলিম

[১৫] ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক ইমাম যায়েদ ইবনে আলির ‘খুরুজ’র পক্ষে অবস্থান, তাঁকে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং তাঁকে সহযোগিতা ও তাঁর পক্ষে অবস্থান করে কিতালে অংশগ্রহণ আবশ্যিক হওয়ার ব্যাপারে গোপনে মানুষদেরকে ফাতওয়া প্রদানের বিষয়টি প্রসিদ্ধ। ইমাম আবু বকর জাসসাস এমনটিই বলেছেন। দেখুন, আহকামুল কুরআন, ১/৮৫।

খোরাসানিরা^[১৬] উত্থান ঘটে, তখন একে একে বিভিন্ন অঞ্চল বনি উমাইয়্যার হাতছাড়া হতে থাকে। এক পর্যায়ে উমাবি খিলাফতের পতন হয়ে প্রচুর রক্তপাতের পর আব্বাসি খিলাফতের সূচনা হয়। তবে আব্বাসি খলিফারা কখনো পুরো দারুল ইসলামকে তাদের শাসনের অধীনে আনতে পারেনি। শুরুতে যেমন আন্দালুস বনি উমাইয়্যাদের হাতে ছিল, পরবর্তিতেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্বতন্ত্র শাসক ছিল; যদিও কেন্দ্রীয় খিলাফত আব্বাসিদের হাতে ছিল। ১৩২ হিজরিতে সর্বপ্রথম আব্বাসি খলিফা হিসেবে আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আসসাফফাহের হাতে বাইআত করা হয়।

আব্বাসি খলিফাদের অবস্থাও উমাবি খলিফাদের মতোই ছিল। অর্থাৎ যুলম, ফিসক ও শরিআতের বিভিন্ন বিষয়ে উদাসীনতার বিশাল দাস্তান থাকলেও তাদের যুগেও মৌলিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ তথা শরিয়তে ইসলামিয়াই হাকেম ছিল।^[১৭] খলিফার নিযুক্তি সাধারণত ‘ওলি আহদ’ পদ্ধতিতে হয়েছে, আবার কখনো ‘আহলুল হাল্লি ওয়ালআকদ’র সিদ্ধান্তে হয়েছে।^[১৮] তবে জিহাদের মাধ্যমে কুফরি শক্তি থেকে দারুল ইসলাম ও মুসলিমদের সুরক্ষায়, দারুল ইসলামের পরিধির বিস্তৃতিতে, হাতছাড়া হওয়া ভূখণ্ডের পুনরুদ্ধারে এবং যিন্দিক-মুলহিদশ্রেণির দমনে পূর্বের ধারাই পরিপূর্ণ অব্যাহত ছিল; যদিও শুরুর দিকে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং বারবার ‘খুররুজ’র ঘটনা সংগঠিত হওয়ার কারণে জিহাদ ও বিজয়ের ধারা কিছুটা স্তিমিত ছিল। তবুও সাফফাহের খিলাফতকালে আফ্রিকায় সৈন্য পরিচালনা করা হয়েছে এবং আরো বিভিন্ন দিকেও জিহাদের ধারা জারি ছিল।

সাফফাহের মৃত্যুর পর খলিফা হিসেবে তার বড়ো ভাই আবু জাফর মানসুরের হাতে বাইআত করা হয়। খলিফা মানসুরের খিলাফতকালেও পূর্বের ধারাই অব্যাহত থাকে। রোমের বিরুদ্ধে জিহাদ চলমান থাকে এবং তবারিস্তানে পরবর্তী খলিফা মাহদি জিহাদের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

[১৬] বনি উমাইয়্যার জন্য হাজ্জাজ যেমন বনি আব্বাসের জন্য আবু মুসলিম খোরাসানি তেমন।

[১৭] বনি আব্বাসের খিলাফতকালে বিচার ব্যবস্থাসহ ‘সিয়াসাতুন নাস’র মৌলিক বিষয়াদি সামগ্রিকভাবে শরিআ অনুযায়ী বাস্তবায়ন হওয়ার বিষয়টি বিস্তারিত দেখা যেতে পারে ‘তারিখুল কাযা ফিল ইসলাম’ (পৃ: ২১৬-৩০৬) থেকে এবং সংক্ষেপে দেখা যেতে পারে ‘আলইমারাতুল ইসলামিয়া ওয়ানিযামুহা’ (পৃ: ২১৪-২২২) থেকে। সে সময়ে আন্দালুস ও মার্গরিবে সুলতান কর্তৃক শরিআ আইন বাস্তবায়নের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য দেখুন, ‘তারিখুল কাযা ফিল ইসলাম’ পৃ: ৩০৭-৩৮৭ এবং পরবর্তী সময়ে মিশরে মামলুক শাসকদের শরিআ আইনে শাসন করার বিষয়টি দেখুন পৃ: ৩৮৮-৪২৩ থেকে।

[১৮] এটির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মূল গ্রন্থেই সামনে আসছে। তাতারিদের হাতে খিলাফত পতনের পর ‘আহলুল হাল্লি ওয়ালআকদ’র সিদ্ধান্তেই নতুন খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

হয় এবং আফ্রিকাতেও সৈন্য পরিচালনা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে খোরাসানে ‘রাওয়ান্দিয়া’ নামক এক মূলহিদ সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটলে তাদের কঠিন হস্তে দমন করা হয়। হ্যাঁ! মানসুরের যুলমের মাত্রা সীমা অতিক্রম করায় তার বিরুদ্ধে একাধিকবার ‘খুরুজ’র ঘটনা ঘটে। বিশেষকরে ‘নাফসে যাকিয়া’ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ দীর্ঘ সময় ধরে ‘খুরুজ’র জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন এবং সমর্থকদের জামাআত বৃদ্ধি করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি মদিনায় ‘খুরুজ’ করেন এবং তাঁর ‘খুরুজ’র কথা শুনে তাঁর ভাই ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ বসরায় ‘খুরুজ’ করেন। মানসুরের বিরুদ্ধে ‘খুরুজ’র ক্ষেত্রে তৎকালীন কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের সমর্থন ও উদ্বুদ্ধ করার কথা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষকরে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের নাম উল্লেখযোগ্য। ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক আর্থিক সহযোগিতা করা এবং বিশেষ ‘উযর’ না থাকলে সরাসরি অংশগ্রহণের ইচ্ছা থাকার কথাও ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত মদিনা ও বসরা; কোনোটি সফল হয়নি এবং উভয়েই পরাজয় বরণ করেন।

মানসুরের পর তার ‘ওলি আহদ’ হিসেবে তার পুত্র মাহদি খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন। মাহদি থেকে মু’তাসিম পর্যন্ত; বিশেষকরে মাহদি, হারুনুর রশিদ, মামুন ও মু’তাসিমের খিলাফতকালে জিহাদ ও বিজয়ের ধারা তুলনামূলক ব্যাপক হয় এবং মূলহিদ-যিন্দিকশ্রেণিকে; বিশেষকরে মাহদির খিলাফতকালে কঠিন হস্তে দমন করা হয়। যদিও মামুন, মু’তাসিম ও ওয়াসিকের যমানায় ‘খালকে কুরআনের মাসআলায় উলামায়ে কেরামের উপর কঠিন যুলম ও জোরজবরদস্তি করা হয়; তবে সম্মিলিত শত্রু তথা কুফরি শক্তির মোকাবেলায় অলসতা করা হয়নি। দারুল ইসলামের সীমানা সুরক্ষা, বিভিন্ন অঞ্চলের বিজয় এবং রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। কুস্তনতিনিয়ার রাজা ও প্রজাদের থেকে ‘জিয়য়া’ গ্রহণ করা এবং চুক্তি ভঙ্গ করলে চুক্তিতে ফিরে আসতে বাধ্য করা; সবই আপন গতিতে চলতে থাকে। সম্রাট নিকফুর কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গ করে খলিফা হারুনকে লেখা চিঠির জবাবে খলিফা হারুন কর্তৃক নিকফুরকে ‘রোমের কুকুর’ সম্বোধন করে লেখা চিঠি যে পুরো রোমে কম্পন সৃষ্টি করেছিল; তা খুবই প্রসিদ্ধ। রোম কর্তৃক তরাসুস ও মালাতইয়ার উপর আক্রমণ প্রতিহত করা, আমুরিয়ার বিজয় এবং আজারবাইজানে প্রকাশ পাওয়া যিন্দিক বাবাক আলখুররামির ফিতনাকে কঠিন হস্তে দমন করা; সবই এই খলিফাদের আমলে সংগঠিত হয়। মোটকথা, আব্বাসি খিলাফতের গুরুত্ব দিকে ইসলামি হুকুমতের দাপটে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুরা খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। বিশেষকরে রোমের মোকাবেলায় কোনো ধরনের অলসতা করা হয়নি।

২৩২ হিজরিতে ওয়াসিকের মৃত্যুর পর তার ভাই মুতাওয়াক্কিল খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন। মুতাওয়াক্কিলের যমানায় যদিও মুতাজিলাদের দাপট স্তিমিত হয়ে ‘খালকে কুরআনের ফিতনা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আহলে সুন্নাহ ওয়ালজামাআতের উলামায়ে কেরামের উপর যুলমের দীর্ঘ দাস্তানের পরিসমাপ্তি ঘটে, কিন্তু তখন থেকে পরবর্তী খলিফারা বিনোদন ও বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে জিহাদের ব্যাপারে অলসতা ও দারুল ইসলামের সীমানা সুরক্ষায় উদাসীনতা প্রকাশ করায় খিলাফতের কর্তৃত্ব দুর্বল হতে থাকে। যার ফলে রোম ও ফরাসি ক্রুসেডাররা দারুল ইসলামের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ করতে শুরু করে। মুতাওয়াক্কিল ও মুনতাসিরের যমানায় ফরাসিরা ও রোমানরা বিভিন্নস্থানে আক্রমণ করে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালায় এবং এক পর্যায়ে মুসতায়িনের যমানায় মালাতইয়ায় মুসলিমদের পরাজয় হয় এবং অন্যান্য যুদ্ধেও সাধারণত রোমানরা জয়ী হতে থাকে।

একদিকে ক্রুসেডারদের আক্রমণ, আর অপরদিকে হিজরি তৃতীয় শতকের শেষ ও চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে শুরু হয় বিভিন্ন মুলহিদ রাফেযি সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ। যারা সিংহভাগ ইসলামি ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব স্থাপন করে ব্যাপক তাগুব চালাতে থাকে এবং কুফর ও বিদআত ছড়াতে থাকে। ২৭৮ হিজরিতে শুরু হয় কারামেতা মুলহিদদের তাগুব। তারা আহসা, বাহরাইন, বসরা ও দক্ষিণ ইরাকে তাগুব চালায় এবং মসজিদে হারামেও হাজিদেরকে হত্যা করে। ২৯৭ হিজরি থেকে শুরু হওয়া উবাইদি মুলহিদদের কুফর, বিদআত ও মুসলিমদের খুন-খারাবির দাস্তান অনেক দীর্ঘ। মাগরিব, মিশর, ফিলিস্তিন, শামসহ অনেক অঞ্চল তারা নিজেদের কর্তৃত্বে নিয়ে নেয়। এছাড়াও আরো বিভিন্ন রাফেযি সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশে বিভিন্ন অঞ্চল আক্রান্ত হতে থাকে। আব্বাসি খিলাফত নামকাওয়াস্তে ইরাকেই সীমাবদ্ধ ছিল; তাও ৩২০ হিজরি থেকে পঞ্চম শতাব্দীর প্রায় অর্ধশতক পর্যন্ত তাদের পরিচালনা করেছিল রাফেযি সম্প্রদায় বনি বুওয়াইহ। মোটকথা, রাফেযি মুলহিদদের কুফর ও বিদআত পুরো ভূখণ্ডে ব্যাপক হয়ে গিয়েছিলো। আর ক্রুসেডাররা এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে মালাতইয়া, মাইয়াফারেকিন, হলব, রুহা, সিকিল্লিয়া, মাসসিসা, তরাসুস, হিমস, আনতাকিয়া ও তরাবলুস ইত্যাদি ভূখণ্ডে আক্রমণ করে মুসলিমদের রক্তপাত, সম্পদ লুণ্ঠন এবং তাদের বন্দি করতে থাকে। তখন অনেক মুসলিম খ্রিষ্টানও হয়ে যায়; ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।^[১৯]

[১৯] সে সময়ে মুসলিমদের করুণ অবস্থার বিবরণ আমরা হাফেয ইবনে কাসিরের ‘আলবিদায়া ওয়াননিহায়া’ (১১/২৩৭, ৩৫২ হি.) থেকে দেখে নিতে পারি।

তবে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফের অবস্থানের আলোকে সর্বাবস্থায় অবস্থাভেদে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্বও নির্ধারিত এবং উম্মাহর একাংশ তা আঞ্জামও দিয়ে থাকে। চতুর্মুখী বিশৃঙ্খলা ও বিশ্বব্যাপী তাগুত ক্রুসেডারদের দাপট বিরাজমান থাকা এবং খলিফার নিষ্ক্রিয়তার বাহানায় ‘আদমে ইস্তিতাআত’-সক্ষমতা না থাকার কথা বলে বিশালশ্রেণি হাল ছেড়ে বসে থাকলেও সবাই হাল ছেড়ে বসে থাকেনি। আলহামদু লিল্লাহ, উম্মাহর সচেতনশ্রেণি অবশ্যই নববি পথে অগ্রসর হয়েছে; তথা প্রকাশ্যে সম্ভব হলে প্রকাশ্যে, আর না হয় গোপনে জিহাদের পথে আহ্বান করে মুজাহিদের কাফেলা তৈরি করা, হিজরত, নুসরত ও জিহাদের ‘ইদাদ’ প্রস্তুতি জারি রাখা এবং সক্ষমতা অনুযায়ী হামলা করা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকা।

হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে আল্লাহ তাআলা পূর্ব দিক থেকে হিন্দ বিজেতা বীর মুজাহিদ সুলতান মাহমুদ গযনবির মাধ্যমে জিহাদ ও সুন্নাহের পতাকা উঁচু করেন। তাঁর শাসন হিন্দের শেষ প্রান্ত থেকে নিশাপুর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তেমনিভাবে পঞ্চম শতাব্দীর অর্ধশতকের কিছু পূর্ব থেকেই সালজুকি শাসকদের মাধ্যমে রোমের বিরুদ্ধে জিহাদের পূর্ব ধারা ফিরে আসে এবং শত বছরের অধিককাল ধরে খলিফাদের উপর চেপে বসা বনি বুওয়াইহ কর্তৃত্বের মূলোৎপাটন হয়। বিশেষকরে সালজুকি শাসক সুলতান তুগরুলবেক সৈন্য পাঠিয়ে রাফেযি মুলহিদ বাসাসিরিকে হত্যা করে তার ফিতনাকে দমন করেন এবং রোমের বিরুদ্ধে পুরোদমে জিহাদ চলমান রাখেন। আর তারই ধারাবাহিকতায় ৪৬৩ হিজরিতে ‘রাহওয়া’ নামক স্থানে রোমের রাজা আরমানুসের নেতৃত্বে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং সালজুকি শাসক সুলতান আল্প আরসালানের নেতৃত্বে মুসলিমদের মাঝে সেই ঐতিহাসিক মানঘিকাটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে আল্লাহ তাআলা রাজা আরমানুসের পাহাড়সম সৈন্যদলের মোকাবেলায় শুধু বিশ হাজারের মতো মুজাহিদের কাফেলাকে বিজয় দান করেন এবং রাজা আরমানুসকে গ্রেফতার করা হয়। ফকিহ আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক বুখারির পরামর্শে জুমআর সময়ে হামলা করা হয়; যেন হামলার সময় মুজাহিদদের জন্য খতিবদের দুআ অব্যাহত থাকে।^[২০] ঠিক তেমনিভাবে মাগরিবেও ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় জিহাদ অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে ৪৭৯ হিজরিতে পশ্চিমের শেষপ্রান্তের আমির ইউসুফ ইবনে তাশফিনের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক ‘যাল্লাকা’র

[২০] এটিই তো আমাদের সেই সোনালি অতীত; যাতে মুজাহিদদের কাফেলায় উলামা-ফুকাহার উপস্থিতি, তাদের মহামূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ এবং জিহাদ চলাকালে ইমাম-খতিবদের দুআ অব্যাহত থাকে। সোনালি সেই দিন + হয়ে গেলো কেনো লীন + মনে পড়ে বারবার + হারানো স্মৃতির দিন।

যুদ্ধে ক্রুসেডারদের এমন শোচনীয় পরাজয় হয়; ইতিহাসের পাতায় যেটির দৃষ্টান্ত পাওয়া মুশকিল। ক্রুসেডারদের ৫০ হাজার সৈন্য থেকে তিনশ জনও নাকি তাদের অঞ্চলে ফিরে যেতে পারেনি। আলহামদু লিল্লাহ।

কিন্তু ক্রুসেডাররা এতে থেমে যায়নি, বরং তারা সংঘবদ্ধ হতে থাকে। একপর্যায়ে তৎকালীন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কুস্তনতিনিয়ায় ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালিসহ বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে সৈন্যদল একত্রিত হয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ক্রুসেড যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করে অগ্রসর হতে থাকে। অপরদিকে সালজুকি শাসকগণ ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় লিপ্ত থাকার সুযোগে উবাইদি মুলহিদ শাসকরা তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে এবং ক্রুসেডারদের সঙ্গে আঁতাত করে মুসলিমদের নিঃশেষ করার প্রচেষ্টায় আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে। ক্রুসেডাররা একে একে আনতাকিয়াসহ দারুল ইসলামের বিভিন্ন অংশ দখল করে 'কুদস'র দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ৪৯২ হিজরিতে বাইতুল মাকদিস দখল করে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কিন্তু; যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে, এমন কঠিন মুহূর্তেও বীর মুজাহিদগণ বসে থাকেননি। দারুল ইসলামের হাতছাড়া হওয়া অংশ পুনরুদ্ধারে নববি পদ্ধতিতে ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় জিহাদ চালিয়ে গেছেন। দীর্ঘ সময়ব্যাপী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লাগাতার জিহাদের বিশদ বিবরণ ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে। সে সকল জিহাদে কখনো শত্রুপক্ষ জয়ী হয়েছে, আবার কখনো মুসলিমরা বিজয়ী হয়েছে। বিশেষকরে ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় সুলতান ইমাদুদ্দিন যানকি এবং তাঁর পুত্র সুলতান নুরুদ্দিন যানকির জিহাদ ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয়। সুলতান নুরুদ্দিন যানকি বাইতুল মাকদিস উদ্ধার করতে না পারলেও ফরাসি ক্রুসেডারের দখলে থাকা সিংহভাগ অঞ্চল দখলমুক্ত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উবাইদি ফিতনাও দমন করতে থাকেন। অপরদিকে মিশরে উবাইদি শাসন মূলোৎপাটনে এবং ফরাসি ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় জিহাদের নেতৃত্ব দিতে থাকেন সুলতান সালাহুদ্দিন আইউবি। এক পর্যায়ে ৫৬৭ হিজরিতে খলিফা মুসতামি বিআমরিলাহের যমানায় মিশরে সুলতান সালাহুদ্দিন আইউবি হাতে উবাইদি মুলহিদ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সুলতান নুরুদ্দিন যানকির ইত্তিকালের পর তাঁর স্থানে আল্লাহ তাআলা বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দিন আইউবিকে ক্রুসেডারদের আতঙ্ক হিসেবে প্রকাশ করেন। যিনি একদিকে মিশর, শাম, জাযিরাত ও মাওসিল শাসন করে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, অপরদিকে ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় একের পর এক জিহাদে জয়ী

হতে থাকেন। এক পর্যায়ে ৫৮৩ হিজরিতে সুলতান সালাহুদ্দিন আইউবি নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ‘হিভিন’র যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে ক্রুসেডারদের কোমর ভেঙে যায় এবং বাইতুল মাকদিস বিজয়ের পথ সুগম হয়ে যায়। সুলতান সালাহুদ্দিন আইউবি একে একে অগ্রসর হয়ে দীর্ঘ ৯২ বছর পর ক্রুসেডারদের হাত থেকে বাইতুল মাকদিস উদ্ধার করেন এবং ফরাসি ক্রুসেডারদের হাতে থাকা বহু অঞ্চল দখলমুক্ত করেন, আলহামদু লিল্লাহ।^[২১] আল্লাহ তাআলা পূর্বে যেভাবে ‘আলে যানকি’ এবং ‘আলে আইউবি’র নেতৃত্বে জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু রাখেন, তেমনিভাবে পশ্চিমে ‘মুরাবিতিন’ অতঃপর ‘মুওয়াহহিদিন’র পতাকাতলে ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় মুজাহিদগণকে জমা করে দেন, আর হিন্দুস্তানে শিহাবুদ্দিন ঘুরি এবং বাংলা ও বিহারে ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে মুশরিকদের মোকাবেলায় জিহাদের ধারাবাহিকতা চলমান রাখেন।

পরে পরেও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে জিহাদের ধারা চলমান থাকে। কিন্তু হিজরি সপ্তম শতকের শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় খিলাফত ও খলিফাদের দুর্বলতা, জিহাদের ব্যাপারে মুসলিমদের উদাসীনতা এবং শাসকশ্রেণির পারস্পরিক সংঘাত; সবকিছুর পরিণামে দারুল ইসলাম ও মুসলিমদের ভাগ্যাকাশে এমন এক ঘোর-অমানিশার ঘনঘটা দেখা দিতে শুরু করে যা সকল ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিয়েছে। যে নৃশংসতার সামনে সকল নৃশংস ঘটনা নসিঁ সাব্যস্ত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড এবং হিংস্রতা বহিঃপ্রকাশের ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়নি; যে নিষ্ঠুরতার বিবরণ দিতে ইতিহাসবিদ ক্লান্ত হয়ে যায়। রচিত হয় তাতারিদের উত্থান এবং মুসলিম জাতি নিধনের সেই ভয়ংকর ইতিহাস।

মঙ্গোলিয়া থেকে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে উত্থান হয় তাতারিদের। মুসলিমদের অধীনে থাকা কাশগড়, বুখারা, সমরকন্দ ইত্যাদি দখল করে তারা সামনে অগ্রসর হতে থাকে। মুসলিম সৈন্যরা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও এই যুদ্ধোন্মাদ সম্প্রদায়ের সামনে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছিলো না; যাদের মহিলারা পর্যন্ত পুরুষদের মতো যুদ্ধ করে। এক পর্যায়ে ৬১৭ হিজরিতে তৎকালীন খোরাসানের শাসক আলাউদ্দিন খুওয়ারিয়ুম শাহের শাসনাধীন সকল ভূখণ্ড দখল করে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালাতে থাকে। খুওয়ারিয়ুমের সিংহখ্যাত ইসলামের অন্যতম বীর মুজাহিদ সুলতান জালালুদ্দিন ইবনে আলাউদ্দিন

[২১] ৬২৬ হিজরিতে বাইতুল মাকদিস আবারও ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। তবে ৬৩৬ হিজরিতে পুনরায় মুজাহিদগণ তা দখলমুক্ত করেন এবং একেবারে শেষের দিকে এসে ইংরেজ ও জায়নবাদীদের কর্তৃত্বের পূর্ব পর্যন্ত তা মুসলিমদের দখলে থাকে।

খুওয়ারিয্ম শাহের দুঃসাহসিক জিহাদি অভিযান ৬২৮ হিজরি পর্যন্ত তাতারিদের অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসনের পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং জয়-পরাজয়ের মাঝে সুলতান জালালুদ্দিন চেঙ্গিস খান ও তাতারিদের জন্য প্রত্যক্ষ আতঙ্ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সুলতান জালালুদ্দিনের সেই বীরত্বগাথা জিহাদের বিবরণ ইতিহাসের পাতায় খুবই প্রসিদ্ধ। সুলতান জালালুদ্দিন কর্তৃক তাতারিদের প্রতিহত করা না হলে খুব সহজে অল্প সময়ে তারা মুসলিমবিশ্বকে তখনই করে দিতে পারতো। কিন্তু ৬২৮ হিজরির পর তাতারিদের অগ্রযাত্রার পথে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট থাকেনি। চেঙ্গিস খান, তারপর তার ছেলে তুলি খান এবং তারপর তার ছেলে হালাকু খানের নেতৃত্বে দশকের পর দশক ইসলামি ভূখণ্ডে তাদের আগ্রাসন অব্যাহত থাকে এবং একে একে তা দখল করে তৎকালীন দারুল খিলাফাহ বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অতঃপর ৬৫৬ হিজরিতে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য সেই কলঙ্কিত ইতিহাস রচিত হয় যা ইতোপূর্বে সাড়ে ছয়শত বছর পর্যন্ত এবং পরবর্তী আরো সাড়ে ছয়শত বছরের অধিককাল পর্যন্ত মুসলিমদের কল্লনাতেও ছিলো না। অর্থাৎ খিলাফতের পতন; যা হালাকু খানের হাতে দারুল খিলাফাহ বাগদাদের পতনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। ইতিহাসের অন্যতম গাদ্দার, রাফেযি মুলহিদ ওয়ির, ইবনুল আলকামি সন্ধির কথা বলে তৎকালীন খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহসহ অনেক আমির-উমারাকে একটি তাবুতে একত্রিত করে এবং সেখানে আরো অনেক উলামা-ফুকাহা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সন্ধির সময়ে উপস্থিত থাকার কথা বলে ডেকে পাঠায়। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর একে একে সবাইকে নির্মমভাবে শহিদ করে দেওয়া হয়। পরবর্তী চল্লিশ দিন বাগদাদে শুধু হত্যাযজ্ঞ এবং লুটপাট চলে; যা থেকে শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ কেউই রক্ষা পায়নি। অপরদিকে মিশর, শামসহ অন্যান্য ভূখণ্ডের সুলতানরা নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং ক্রুসেডারদের আগ্রাসনসহ চতুর্মুখী সংকটে বিপর্যস্ত থাকায় খলিফা দারুল খিলাফতকে সহযোগিতা তো দূরের করা; নিজেরাই তাতারিদের ভয়ে তটস্থ হতে থাকে। ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাসে এমন কালো অধ্যায় আর রচিত হয়নি; যদিও বর্তমান সময়কে সে সময়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। খলিফাবিহীন মুসলিমবিশ্ব, সমকালীন পরাশক্তি তাতারিদের ফুরাত নদী পার হয়ে শামের দিকে অগ্রসর হওয়া, সুলতানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ক্রুসেডারদের আগ্রাসন; চারদিকেই যেন হতাশা আর অন্ধকার।

কিন্তু যেকোনো অবস্থার জন্য উম্মাহর দায়িত্বও নির্ধারিত এবং তা আজ্ঞাম দেওয়ার মতো ব্যক্তিবর্গও আল্লাহ তাআলা তৈরি করে দেন। ব্যক্তিগত অজুহাতের

কারণে কেউ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে, কিন্তু অজুহাতকে শর্ত বানিয়ে উম্মাহকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার মিশনে ঝাঁপিয়ে পড়া কখনো গাইরতের পরিচয় হতে পারে না। অবশ্যই দ্বীনের জন্য ‘গাইরত’ হবে, পরিস্থিতি যতই জটিল হোক না কেনো এবং আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের শত্রুপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক না কেনো; জিহাদের ঝাণ্ডাকে উঁচু রাখতে উম্মাহকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং স্থান-কাল-পাত্রের ভিন্নতার বিবেচনায় সুপরিকল্পিত নিখুঁত মানহাজ তৈরি করা, যা শত্রুর সুখনিদ্রাকে হারাম করে দেবে।

তাতারিদের সেই আগ্রাসী সময়কালেও খিলাফাহ ও দারুল ইসলামের হাতছাড়া হওয়া অংশ পুনরুদ্ধারে উম্মাহর বীর মুজাহিদগণ নববি পদ্ধতি; তথা দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের মানহাজে অগ্রসর হয়েছেন। উলামায়ে কেরাম জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। আবুল আব্বাস কুরতুবি তখন সকলের উপর জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।^[২২] এক্ষেত্রে বিশেষভাবে যে ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন, ইমাম ইয়যুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম। তৎকালীন মিশরের সুলতানের সহকারী সাইফুদ্দিন কুতুযকে তাতারিদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং শক্তি-সাহস জুগিয়েছেন। স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, শত্রু যখন দারুল ইসলামে হামলা করে তখন সমগ্র বিশ্বের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়।^[২৩] অপরদিকে খলিফা না থাকা বা মিশরের সুলতান মানসুরের পক্ষ হতে জিহাদের ঘোষণা না আসা বা মানসুর অল্প বয়সি বালক হওয়া; ইত্যাদির অযুহাত দেখিয়ে সাইফুদ্দিন কুতুয বসে থাকেননি, বরং তার স্থানে নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ফুকহায়ে কেরাম ও কাযিদের নিকট ‘ওজরখাহি’ করে বলেন, ও এখনও বাচ্চা মানুষ অথচ অবস্থা খুবই জটিল। এ সময় জিহাদের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য একজন বীর পুরুষের প্রয়োজন।^[২৪]

বর্ষ তখন ৬৫৮ হিজরি। মুসলিমবিশ্ব খলিফাবিহীন। তাতারিরা ফুরাত অতিক্রম করে হলব পৌঁছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে হত্যাযজ্ঞ চালায়। অতঃপর দিমাশক দখল করে লুটপাট করতে করতে গায্যা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং মিশরের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছে করে। সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুযের নিকট যখন শামের এই করুণ পরিস্থিতির সংবাদ পৌঁছায়, তখন তিনি তাতারিদের

[২২] আলমুফহিম, ৩/৭১৩, দারু ইবনে কাসির।

[২৩] তারিখুল খুলাফা, সুয়ুতি, পৃ: ৪২৩।

[২৪] কুতুযের এই কাজকে হাফেয ইবনে কাসির মুসলিমদের জন্য রহমতস্বরূপ আখ্যা দিয়েছেন, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ১৩/১৯৩।

মোকাবেলা করার জন্য মুজাহিদদের কাফেলা নিয়ে শামের উদ্দেশে বের হয়ে পড়েন। অপরদিকে শামে হালাকু খানের নায়েব কাতবুগা নুবেনের নেতৃত্বে তাতারিরা একত্রিত হয়। ৬৫৮ হিজরির ২৫ রমজান, জুমআর দিন ছিলো মুসলিম উম্মাহর জন্য দীর্ঘ কালো রাত্রির অবসান এবং ইতিহাসের কলুষিত অধ্যায়ের পর এক আলোকিত সুপ্রভাত ও ইতিহাসের প্রস্ফুটিত অধ্যায়। ইসলামের বীর সিপাহসালার সাইফুদ্দিন কুতুয এবং তাঁর অন্যতম সহযোগী রুকনুদ্দিন বাইবার্স বন্দুকদারির বীরত্বগাঁথা নেতৃত্বে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক ‘আইনে জালুত’র যুদ্ধ; যাতে তাতারিদের শোচনীয় পরাজয় হয় এবং আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় দান করেন, আলহামদু লিল্লাহ। কাতবুগা নুবেনসহ বিশাল সংখ্যক তাতারিদের হত্যা করে তাদের অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসী অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়া হয় এবং শাম থেকে বিতাড়িত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাতারিদের সঙ্গে দেওয়া মুসলিম নামধারী মুনাফিকদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাতারিদের সহযোগিতা করে ‘যিম্মাহ’ চুক্তি ভঙ্গকারী খ্রিষ্টানদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাদের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত করা হয়।^[২৫] সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে এবং দীর্ঘ বিষাদের পর মুসলিম উম্মাহর চেহারায় ফিরে আসে সেই চিরচেনা উদ্যম ও আত্মতৃপ্তির হাসি। সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয মিশরে ফিরে আসার পথে বাইবার্সসহ অন্য আমিরদের হাতে নিহত হন এবং রুকনুদ্দিন বাইবার্স নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। বাইবার্স কর্তৃক এমন জঘন্যতম একটি অপরাধ সংঘটিত হলেও পরবর্তী সময়ে তাতার ও ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় জিহাদের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় তাঁর অস্বাভাবিক অবদান অনস্বীকার্য।

মুসলিমবিশ্ব তিন বছর খলিফাবিহীন থাকার পর ৬৫৯ হিজরিতে সালাফের দেখানো পদ্ধতি ‘আহলুল হাল্লি ওয়ালআকদ’র সিদ্ধান্তে পুনরায় খলিফা নিযুক্ত করা হয়। রুকনুদ্দিন বাইবার্স মিশরের সুলতান হওয়ার পর পূর্বের খলিফার চাচা মুসতানসির বিল্লাহ দীর্ঘ ফেরারি জীবন কাটিয়ে মিশর আসেন এবং ‘কাযিল কুযাত’-প্রধান বিচারপতি তাজুদ্দিনের (تاج الدين ابن بنت الأعز) নিকট নিজের বংশীয় পরিচিতি প্রমাণ করেন। তখন ক্রমান্বয়ে কাযিল কুযাত, সুলতান বাইবার্স, ইমাম ইয়যুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বাইআতের মাধ্যমে মুসতানসির বিল্লাহ খলিফা নিযুক্ত হন। খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় জনসাধারণ খুবই আনন্দ প্রকাশ করে।

পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী তাতার ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লাগাতার জিহাদের বিশদ বিবরণ ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে। সুলতান বাইবার্স

[২৫] আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ১৩/১৯৮।

সুলতান কালাউনসহ ইসলামের বহু বীর সিপাহসালারদের নেতৃত্বে বহু জিহাদ সংঘটিত হয়েছে। কাযি বদরুদ্দিন ইবনে জামাআহসহ অনেক ফকিহ-আলিম তাতারিদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। বিশেষকরে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার অবদান চিরস্মরণীয়। তাতারিরা যখন শাহাদাতাইন উচ্চারণ করে নিজেদের মুসলিম প্রকাশ করলেও কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে চেঙ্গিস খানের বানানো সংবিধান ‘ইয়াসাক’র আলোকেই বিচারকার্য পরিচালনা করছিলো, তখন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া সেটিকে ‘কুফরে বাওয়াহ’ আখ্যা দিয়ে এবং তাতারিদেরকে খারেজিদের সাথে তুলনা করে ‘তায়েফায়ে মুমতানিআ’ সাব্যস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তাতারিদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। অপরদিকে মাগরিবেও বনি মারিনের নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় জিহাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। আর এই সময়ে তথা হিজরি অষ্টম শতকের প্রথম অর্ধাংশে তৎকালীন বাংলার সুলতান ফিরুজ শাহ ও সিকান্দার শাহের সেনাবাহিনী শাহ জালাল ইয়ামানির নেতৃত্বে রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করে এবং সিলেট মুসলিমদের শাসনাধীন হয়।

আব্বাসি খিলাফতের স্থায়িত্ব নামেমাত্র ৯২২ হিজরি পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকলেও মূলত কর্তৃত্ব থাকে সুলতানদের। আর উসমানি শাসকবৃন্দ ৯২২ হিজরিতে খলিফা উপাধি ধারণ করলেও তাদের শাসনের সূচনাকাল ধরা হয় ৬৯৯ হিজরিকে। বলা যায়, ক্রুসেডার বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মোকাবেলায় ইসলামকে কর্তৃত্বের বিজয়ী করার জন্য সপ্তম শতকের একেবারেই শেষে আল্লাহ তাআলা আরেকটি শক্তির উত্থান ঘটিয়েছেন, আর তা হচ্ছে উসমানি শাসন।

□ খিলাফতে উসমানিয়া

উসমানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা উসমান গায়ির পিতা আরতুগরুল গায়ি ইবনে সুলাইমান শাহ তুরকুমানি হিজরি সপ্তম শতকের মাঝামাঝি আনাদুল/আনাতোলিয়ার (তুরস্ক) শহর কোনিয়ার (قونية) সর্বশেষ সালজুকি শাসক সুলতান আলাউদ্দিনকে তার শত্রুদের মোকাবেলায় সহযোগিতা করেন। সেটির প্রতিদানস্বরূপ সুলতান আলাউদ্দিন আরতুগরুল গায়িকে কিছু অঞ্চলের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ৬৮৭ হিজরিতে আরতুগরুল গায়ি মৃত্যুবরণ করলে সুলতান আলাউদ্দিন আরতুগরুল গায়ির বড়ো ছেলে উসমানকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং কাফেরদের মোকাবেলায় জিহাদের দায়িত্ব প্রদান করেন। উসমান

গায়ির নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চল বিজিত হয়। অতঃপর ৬৯৯ হিজরিতে তাতারিদের হামলায় সুলতান আলাউদ্দিন নিহত হলে অধিকাংশ যোদ্ধা উসমান গায়ির নিকট একত্রিত হয়ে তাঁকে সুলতান হওয়ার প্রস্তাব পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং সুলতান হিসেবে আবির্ভূত হন। আর এর মাধ্যমে সূচনা হয় ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সালতানাতের; যা উসমানি সালতানাত (অটোম্যান সাম্রাজ্য) হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

উসমানি শাসক ও খলিফাদের অবস্থাও অনেকটা উমাবি ও আব্বাসি খলিফাদের মতোই ছিল। উসমানি অনেক খলিফার যুলম, ফিসক ও শরিআতের বিভিন্ন বিষয়ে উদাসীনতার বিশাল দস্তান থাকলেও তাদের যুগেও মৌলিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ তথা শরিয়তে ইসলামিয়াই হাকেম ছিল।^[২৬] খলিফার নিযুক্তি

[২৬] উসমানি সালতানাত ও খিলাফতকালে বিচার ব্যবস্থাসহ ‘সিয়াসাতুন নাস’র মৌলিক বিষয়াদি সামগ্রিকভাবে শরিআ অনুযায়ী বাস্তবায়ন হওয়ার বিষয়টি বিস্তারিত দেখা যেতে পারে ‘তারিখুল কাযা ফিল ইসলাম’ (পৃ: ৪২৪-৪৭১) থেকে এবং সংক্ষেপে দেখা যেতে পারে ‘আলইমারাতুল ইসলামিয়া ওয়ানিয়ামুহা’ (পৃ: ২২২-২২৭) থেকে। উসমানি সালতানাতে বিচারকের জন্য অন্যতম শর্তই ছিলো হানাফি মাযহাবের হওয়া এবং ইলম ও আমলে মজবুত হওয়া। দেখুন, ‘তারিখুল কাযা ফিল ইসলাম’, পৃ: ৪৩৯-২৪০, ‘আলইমারাতুল ইসলামিয়া ওয়ানিয়ামুহা’, পৃ: ২২৫।

১০৯৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করা উসমানি খিলাফতের একজন সম্মানিত বিচারকের একটি বিচারের ঘটনা উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি,

أحمد بن حسن بن الشيخ سنان الدين البياضي الرومي الحنفي قاضي العسكر، واحد صدور الدولة العثمانية، من أجلاء علماء الروم..... ووقع في أيام قضاائه أنه ثبت على امرأة أنها زنى بها يهودي، وشهد أربعة بالزنا على الوجه الذي يقتضي الرجم، فحكم بربم المرأة فحفر لها حفرة في آت ميداني ورجمت، وهذا الأمر لم يقع إلا في صدر الإسلام. (خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي، ١٨١/١)

“আহম্মাদ ইবনে হাসান ইবনুস শাইখ সিনানুদ্দিন আলবায়্যাযি আররুমি আলহানাফি। সৈন্যদের বিচারক ও উসমানি সালতানাতের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং রোমের সম্মানিত আলেমদের একজন।..... তিনি বিচারক থাকাকালীন এক মহিলার ব্যাপারে প্রমাণিত হয়েছে যে, তার সঙ্গে এক ইহুদি বিনা করেছে এবং বিনার ব্যাপারে চারজন এমনভাবে সাক্ষ্য দিয়েছে যা ‘রজম’র বিধান কার্যকর করাকে আবশ্যক করে; তাই তিনি ‘রজম’র নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার জন্য নিম্নভূমিতে একটি গর্ত খনন করা হয় এবং তাকে ‘রজম’ তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। এমন ঘটনা শুধু ইসলামের শুরুর দিকেই ঘটেছিল।” (খুলাসাতুল আসার, ১/১৮১)

১২৫৬ হিজরি; যখন উসমানি খিলাফত অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখনও যে ‘কানুননামা’ তৈরি করা হয়েছিলো সেটির ব্যাপারে বক্তব্য হচ্ছে,

وقد أعدته هيئة قوامها أربعة وأربعون شخصاً من الوزراء التنفيذيين وكبار العلماء ومجلس الأحكام العدلية وبعض أركان الدولة، ويستنتج من النصوص الواردة ومحتواها أنها لا تتضمن أحكاماً مخالفة للأحكام الشرعية.... (قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي لأورهان صادق، ص ٦٤)

“কানুননামা তৈরি করেছে এমন কমিশন যেটির তত্ত্বাবধানে ছিলো কার্যনির্বাহী মন্ত্রী, নেতৃস্থানীয় আলেম, বিচার বিভাগীয় পরিষদ ও সালতানাতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ থেকে ৪৪জন সদস্য। তাতে উল্লিখিত পাঠ ও অন্তর্ভুক্ত বিষয় থেকে স্পষ্ট যে, শরিয় বিধিবিধানের বিপরীত কোনো বিধান তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না।.....” (কাওয়ানিনুদ

সাধারণত ‘ওলি আহদ’ পদ্ধতিতে হয়েছে, আবার কখনো ‘আহলুল হান্নি ওয়ালআকদ’র সিদ্ধান্তে হয়েছে। তবে জিহাদের মাধ্যমে কুফরি শক্তির আক্রমণ থেকে দারুল ইসলাম ও মুসলিমদের সুরক্ষায়, দারুল ইসলামের পরিধির বিস্তৃতিতে, হাতছাড়া হওয়া ভূখণ্ডের পুনরুদ্ধারে পূর্বের ধারাই পরিপূর্ণ অব্যাহত ছিল। বিশেষকরে গুরুর দিকের শাসকদের ইতিহাস তো খুবই গৌরবান্বিত ও প্রশংসনীয়। ইসলামের অগ্রগামী বীর সুলতান উসমান ইবনে আরতুগরুল সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন রোমান শাসকদের কাছে শরিআতের নীতি অনুসারে ইসলাম গ্রহণ অথবা জিয্যা প্রদান, অন্যথায় যুদ্ধের পয়গাম পাঠিয়ে দেন। ফলে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে সুলতানের অধীনে চলে আসে, আবার কেউ কেউ জিয্যা প্রদান করতে সম্মতি প্রকাশ করে, আরেক শ্রেণি সুলতান উসমানের মোকাবেলায় তাতারিদের সহযোগিতা কামনা করে। সুলতান উসমান তাতারিদের মোকাবেলায় জিহাদে অবতীর্ণ হন এবং তাতারিদের উপর বিজয় লাভ করেন। জিহাদের ময়দানে সুলতান উসমানের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস চিরস্মরণীয়। কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে ৭১৭ হিজরিতে তিনি তাঁর পুত্র ও তাঁর পরবর্তী শাসক উরখান গাযির নেতৃত্বে ক্রুসেডার বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্যতম শহর ‘বুরসা’ অবরোধ করেন; যা সুলতান উসমানের শাসনের একেবারে শেষের দিকে পূর্ণ বিজয় হয়। আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে সুলতান উসমানের বীরত্ব, অধীনস্তদের মাঝে ইনসাফের আচরণ এবং অন্যান্য গুণাবলীর এতোটাই প্রাবল্য ছিলো যে, অষ্টম শতকের একজন সুলতানকে "ثالث العمرين" বলা হতো। আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে এতোটাই সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাঁকে "ثالث القمرين" বলা হতো।

সুলতান উসমান গাযির মৃত্যুর পর তাঁর ‘ওলি আহদ’ হিসেবে তাঁর দ্বিতীয়

দাওলাতিল উসমানিয়া, পৃ: ৬৪)

লেনদেনের ক্ষেত্রে শরিআ আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই উসমানি খিলাফতের বাছাই করা উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছিলো ‘মাজল্লাতুল আহকামিল আদলিয়া’; যেটিকে ১২৯৩ হিজরিতে সুলতান আবদুল আযিয লিখিত আইন ঘোষণা দিয়ে সে অনুযায়ী বিধান কার্যকর করাকে আবশ্যক করেছেন। বিস্তারিত দেখুন, ‘তারিখুল কাযা ফিল ইসলাম’, পৃ: ৪৫৩, ‘কাওয়ানিনুদ দাওলাতিল উসমানিয়া’, পৃ: ৬৫-৬৬, ‘আলইমারাতুল ইসলামিয়া ওয়ানিযামুহা’, পৃ: ২২৭।

উসমানি খিলাফতে ‘কানুননামা, সিয়াসাতনামা, আদালতনামা’ ইত্যাদি নামে যে আইন রচনা করা হয়েছিলো, সেগুলোর মৌলিক উদ্দেশ্যই ছিলো শরিআ আইন বাস্তবায়ন করা এবং সেগুলো উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানেই তৈরি হতো। বিস্তারিত দেখুন, ‘কাওয়ানিনুদ দাওলাতিল উসমানিয়া’ পৃ: ৭৮, ১০২।

উসমানি খিলাফতের কানুনের ব্যাপারে যে প্রাচ্যবিদরা দাবি করেছে, এগুলো বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য থেকে ধার করা বা অনেকে যে দাবি করে, উসমানি খিলাফত শরিআ আইনের তোয়াক্কা করতো না; এ সকল অন্তঃসারশূন্য দাবির খণ্ডনের জন্য বিশেষভাবে দেখা যেতে পারে ‘কাওয়ানিনুদ দাওলাতিল উসমানিয়া’, পৃ: ১০৯-১১৫, ১৪৭-১৫০।

পুত্র উরখান গাঘি সুলতান নিযুক্ত হন। সুলতান উরখান গাঘির বীরত্ব কোনো অংশে তাঁর পিতা থেকে কম ছিলো না। জিহাদের ধারাবাহিকতা রক্ষায় তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁর শাসনকালে বহু অঞ্চল পূর্ণ বিজয় লাভ করে এবং দারুল ইসলামের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। পূর্ব ইউরোপের নতুন নতুন বিজিত অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থানের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সিংহাসন 'বুরসা'য় স্থানান্তর করেন। এক পর্যায়ে ৭৫৮ হিজরিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ শহর 'গ্যালিপোলি' বিজয় করেন; যেটিকে 'কুস্তনতিনিয়া'র চাবি মনে করা হতো। তাঁর আমলেই 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'কে সুশৃঙ্খলরূপে আঞ্জাম দিতে উসমানি সৈন্যবাহিনী 'ইনকিশারিয়া' গঠন করা হয়।

সুলতান উরখানের পর তাঁর পুত্র মুরাদ সালতানাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান মুরাদের আমলে জিহাদের ধারা আরো জোরালো গতিতে অব্যাহত থাকে। ক্ষমতা লাভের পরের বছরেই তাঁর হাতে 'আদরানা'র বিজয় সম্পন্ন হয় এবং রাজধানী সেখানে স্থানান্তর করা হয়; কুস্তনতিনিয়া বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেটিই ছিলো উসমানি সালতানাতের রাজধানী। সুলতান মুরাদ দারুল ইসলামের পরিধি এমনভাবে বিস্তৃত করতে থাকেন যে, উসমানি সালতানাত সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সিংহভাগ ভূমি উসমানি সালতানাতের অধীনে চলে আসায় কুস্তনতিনিয়া চতুর্দিক থেকে পরিপূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। 'আদরানা' রোমানদের হাতছাড়া হওয়ার পর বসনিয়া, সার্বিয়া ও মজরের (হাঙ্গেরি) ক্রুসেডার রাজারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জোটবদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু জোটবদ্ধ ক্রুসেডাররা ৭৬৫ হিজরিতে 'আদরানা' আক্রমণ করতে আসলে সুলতান মুরাদ তাদের খুব কঠিনভাবে পরাজিত করেন। মুসলিমদের বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকে এবং এক পর্যায়ে বুলগেরিয়ার পতন ও রাজাকে বন্দি করা হয়। তিন বছর অবরুদ্ধ থাকার পর 'সোফিয়া' উসমানিদের হস্তগত হয়। মুসলিমদের বিজয়ের দুর্বীর প্রবাহে আতঙ্কিত পূর্ব ইউরোপের ক্রুসেডার রাজারা সুলতান মুরাদের বিরুদ্ধে আবারও জোটবদ্ধ হতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭৯২ হিজরিতে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক 'কসোভো'র যুদ্ধ, যাতে মুসলিমদের অস্বাভাবিক বিজয় অর্জিত হয়। ক্রুসেডাররা শোচনীয় পরাজয়ের বিশ্বাদ আত্মদান করে এবং সার্বিয়ার রাজাকে বন্দি করে হত্যা করা হয়, আলহামদু লিল্লাহ। তবে সুলতান মুরাদ যুদ্ধ ময়দানের অবস্থা পর্যবেক্ষণকালে সার্বিয়ান এক আততায়ী সৈন্যের বর্শার আঘাতে শাহাদাতবরণ করেন। আর পরবর্তী উম্মাহর আমানতে রেখে যান জিহাদের মাধ্যমে বিজয় করা দারুল ইসলামের বিশাল-বিস্তৃত অঞ্চল।

সুলতান মুরাদের পর তাঁর পুত্র বায়েযিদ সুলতান হিসেবে নিযুক্ত হন। সুলতান বায়জিদের আমলে উসমানি সৈন্যবাহিনী ‘ইনকিশারিয়া’ আকাশচুম্বী আকাঙ্ক্ষা ও অসীম সাহসিকতার সহিত ইউরোপের মোকাবেলায় পূর্ণ মাত্রায় জিহাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে। তাদের হাতে বিজিত হয় রোমানিয়া, আলবেনিয়া ও গ্রিসের খুবই প্রসিদ্ধ ‘রোডস’ দ্বীপ। অপরদিকে এশিয়ায় রোমানদের হাতে থাকা সর্বশেষ শহর আশ্মান বিজয়ের মাধ্যমে মারমারা সাগরের পূর্বাংশ এককভাবে উসমানিদের দখলে চলে আসে। সুলতান বায়জিদের এমন অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় ভীত-সন্ত্রস্ত হাঙ্গেরির রাজা ইউরোপীয় ক্রুসেড হামলার জন্য অন্যান্য ক্রুসেডার রাজাদেরকে জোটবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাঙ্গেরির সৈন্যসহ জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালি ও স্পেনের লক্ষাধিক সৈন্য সুলতান বায়জিদের সৈন্যদলের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে ‘দানিউব’ নদী অতিক্রম করে। ৭৯৮ হিজরির ২৩ ফিলকা‘দা ছিলো ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাসে খুবই গৌরবান্বিত ও স্বর্ণোজ্জ্বল একটি দিন। সুলতান বায়েযিদ তাঁর সৈন্যদল নিয়ে ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতরণ করেন; যাতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় দান করেন, আলহামদু লিল্লাহ। এটি শুধু যুদ্ধে আসা ক্রুসেডারদেরই পরাজয় ছিলো না, বরং তা ছিলো উসমানিদের হাতে পুরো ইউরোপের এবং সামগ্রিকভাবে খ্রিষ্টানদের পরাজয়। ইউরোপের মোকাবেলায় জয়ী হওয়ার পর সুলতান বায়েযিদ কঠিনভাবে কুস্তনতিনিয়া অবরোধ করেন। সুলতান বায়জিদের হাতেই কুস্তনতিনিয়া বিজয় হয়ে যেত; যদি না তাগুত ল্যাংড়া তৈমুর পেছন থেকে আক্রমণ করে বসত। সুলতান বায়জিদের বিজয়ের ধারাবাহিকতা ইউরোপ অতিক্রম করার বিষয়টি ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা ভালোভাবেই অনুভব করছিলো। তাই তারা সুলতান বায়েযিদকে প্রতিহত করে হারানো ক্ষমতা ফিরে পেতে তৎকালীন মোঘলি (তাতারি) তাগুত ল্যাংড়া তৈমুরের সহযোগিতা কামনা করে; যাকে মুসলিমদের শাসক মনে করা হয়। আর ওই ল্যাংড়া তাগুত সুলতান বায়জিদের কুস্তনতিনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগকে কাজে লাগায়। ফলে ৮০৪ হিজরিতে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিহত করে ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করতে চেঙ্গিস খানের বংশধর হিংস্র তাগুত ল্যাংড়া তৈমুর সুলতান বায়জিদের সৈন্যদলের উপর আক্রমণ করে বসে। ‘আনকারা’য় উভয় সৈন্যদল যুদ্ধে লিপ্ত হলে সুলতান বায়জিদের সৈন্যরা পরাজয় বরণ করে এবং ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি দুঃখজনক অধ্যায় রচিত হয়। সুলতান বায়েযিদ শত্রুদের হাতে বন্দি হন এবং বন্দি অবস্থায় ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আতঙ্ক, ইসলামের এই বীর মুজাহিদ

সুলতান মৃত্যুবরণ করেন। ইসলাম ও মুসলিমদের দমনে ওই কুখ্যাত ল্যাংড়া তান্ত্রিক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড কোনো অংশে তার পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানদের চেয়ে কম ছিলো না।^[২৭]

সুলতান বায়জিদের বন্দি হয়ে মৃত্যুবরণ করার পর স্বভাবতই উসমানি সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং বিজিত বিভিন্ন অঞ্চল উসমানিদের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে যায়। তাই পরবর্তী সুলতান মুহাম্মাদ গায়ি সুলতান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মনোযোগ দেন এবং তাতে তিনি সফল হন। পরবর্তী সময়ে তাঁর পুত্র সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ইউরোপের বিরুদ্ধে আবারও জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করেন। কখনো তিনি জয়ী হয়েছেন, আবার কখনো পরাজিত হয়েছেন।

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের পর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ আলফাতেহ সুলতান হিসেবে নিযুক্ত হন। সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতেহ সালতানাতেহ আসনে সমাসীন হওয়ার পর উসমানিদের বীরত্বের সেই ঐতিহ্য পূর্ণমাত্রায় ফিরে আসে; সুলতান বায়জিদের মৃত্যুর পর যাতে কিছুটা ভাটা পড়েছিল। সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতেহ তাঁর শাসনের সূচনাই করেন কুস্তনতিনিয়া বিজয়ের প্রস্তুতির মাধ্যমে। সুলতানের এমন প্রস্তুতি দেখে রোমের সর্বশেষ শাসক কুস্তনতিন ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আহ্বান জানায় সুলতানের মোকাবেলায় আসার জন্য। ইউরোপীয় ক্রুসেডাররাও সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে সামনে আসে। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতেহের মতো সুনিপুণ সিপাহসালারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুচিন্তিত রণকৌশলের সামনে ক্রুসেডারদের সমস্ত কষ্ট-সাধনা ও পরিকল্পনা পণ্ড হয়ে যায় এবং তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। ইতোপূর্বে মুয়াবিয়া রা এর আমল থেকে এগারোবার অবরোধ করা হলেও যে কুস্তনতিনিয়া বিজয় করা সম্ভব

[২৭] ইসলাম ও মুসলিমদের দমনে ল্যাংড়া তৈমুরের (মৃ: ৮০৭ হি.) হিংস্রতা, পূর্বে-পশ্চিমে তার ধ্বংসাত্মক ও তান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পড়া যেতে পারে, ইবনে আরব শাহ (৭৯১-৮৫৪ হি.) কর্তৃক তার পূর্ণ জীবনের উপর রচিত গ্রন্থ «عجائب المقدور في أخبار تيمور» (আজায়েবুল মাকদুর ফি আখবারে তইমুর)।

আমাদের হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম ‘ফাতওয়া বাযযাযিয়া’র সংকলক হাফেযুদ্দিন ইবনুল বাযযায আলকারদারি (মৃ: ৮২৭ হি.) সুস্পষ্টভাবে ল্যাংড়া তৈমুরের কুফরের ফাতওয়া দিতেন। দেখুন, ‘আলআ‘লাম’, খাইরুদ্দিন আযযিরিকলি, ৭/৪৫।

আল্লাহমা আনওয়াহ শাহ কাশ্মীরি তাকে ইয়াজুজ-মাজুজের একজন মনে করতেন। আল্লাহমা কাশ্মীরি বলেন,
فإن تيمورلنك وجنكيزخان وهلاكوا؛ كلهم كانوا من يأجوج ومأجوج، ولم أرفع لهم بني آدم إلا التدمير، واستباحة بيضتهم.... (فيض الباري للكشميري، كتاب الجهاد والسير، باب قتال اليهود، ১/৭৭)
“কেননা, তৈমুরলং, চেঙ্গিস খান ও হালাকু; সবগুলো ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে ছিল। মানবজাতির বিনাশসাধন ও সম্মানহরণই ছিলো তাদের কাজ।” (ফাইয়ুল বারি, ৪/১৯৭)

হয়নি, ৮৫৭ হিজরিতে আল্লাহ তাআলা সেটিকে সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতেহের হাতে বিজয় দান করেছেন, আলহামদু লিল্লাহ। এই বিজয়ের আনন্দে পুরো মুসলিমবিশ্ব আলোড়িত হয়, আর অপরদিকে ইউরোপ ও পুরো বিশ্বের খ্রিষ্টান জাতিকে বিষণ্ণতা ও মর্মবেদনা আচ্ছন্ন করে নেয়। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির মাধ্যমে ইতিহাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কুস্তনতিনের শহর কুস্তনতিনিয়া হয়ে যায় ইসলামের শহর ‘ইসলামবুল’ (ইস্তাম্বুল), আর সেখানকার সবচেয়ে বড়ো গির্জা ‘আয়া সোফিয়া’ মুসলিমদের জামে মসজিদে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একের পর এক বিজয় সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতেহ আলফাতেহের কপাল চুম্বন করতে থাকে। মের্সিন (মের্সিন), সার্বিয়া, বসনিয়া, আলবেনিয়া ও আরনাউতকে উসমানি শাসনের অধীনে আনার পর ক্রিমিয়া (القرم) অভিযুখে রওয়ানা করেন এবং সেটিকেও আয়ত্তে নিয়ে আসেন। আর তৎকালীন ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ দুটি রাজ্য; বুনুকিয়া (ভেনিস) প্রজাতন্ত্র ও জেনোভা প্রজাতন্ত্রও সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। আনাতোলিয়ার (এশিয়া মাইনর) সকল অঞ্চল এবং হাঙ্গেরির অধীনস্থ বেলগ্রেড ও ভেনিসের অধীনস্থ কিছু দ্বীপ ব্যতীত পুরো বলকান অঞ্চলের সকল এলাকা বিজয় করে দারুল ইসলামের পরিধি বিস্তৃত করেন। মোটকথা, হিজরি নবম শতকের শেষ অর্ধাংশে ফাতেহে কুস্তনতিনিয়া সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতেহের হাতে উসমানি সালতানাত শক্তি, সাহস, বীরত্ব ও ক্ষমতার এমন উজ্জ্বল শিখরে অবস্থান করে যে, তৎকালীন বিশ্বের কোনো সাম্রাজ্যের পক্ষে উসমানি সালতানাতের সামনে দাঁড়ানোর সাহস ছিলো না। সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতেহের জিহাদি স্পৃহা এবং দারুল ইসলামের পরিধি আরো বিস্তৃত করার সুউচ্চ আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ মৃত্যুর সামনে থেমে যায়। জিহাদ ও বিজয়ের ধারাবাহিকতায় জীবন কাটিয়ে এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য গৌরবান্বিত ইতিহাস রচনা করে ৮৮৬ হিজরিতে ইসলামের এই মহান বীর মুজাহিদ সুলতান মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতেহের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দ্বিতীয় বায়েযিদ সুলতান হিসেবে নিযুক্ত হন। সুলতান দ্বিতীয় বায়েযিদ দীর্ঘ সময় তথা ৯১৮ হিজরি পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকলেও তার আমলে উল্লেখযোগ্য কোনো বিজয় সাধিত হয়নি। তবে দারুল ইসলামের সীমানা রক্ষায় তিনি কোনো ত্রুটি করেননি। দারুল ইসলামের সীমানা রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষামূলক জিহাদেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন। তবে এই সময়কালেই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে সেই কলঙ্কময় অধ্যায় রচিত হয়, যে কলঙ্ক পূর্ণমাত্রায় আজো মুসলিম উম্মাহর কপালে লেপটে আছে। আন্দালুসের মুসলিমদের জিহাদের ব্যাপারে উদাসীনতার সুযোগে স্পেনীয় ক্রুসেডাররা একে

একে আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ করে তা দখল করতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ৮৯৭ হিজরিতে মুসলিমদের দখলে থাকা আন্দালুসের সর্বশেষ অঞ্চল গারনাতায় স্পেনীয় ক্রুসেডাররা হামলা করে তা দখল করে নেয় এবং মুসলিমদের উত্তর আফ্রিকার দিকে তাড়িয়ে দেয়। আর এর মাধ্যমে প্রায় আটশত বছর মুসলিমদের অধীনে থাকার পর পুরো আন্দালুস মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে যায়; যা আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।^[২০] ঘটনাক্রমে সেই ৮৯৭ হিজরিতেই স্পেনীয় পর্যটক ক্রিস্টোফার কলম্বাস বর্তমানের অন্যতম ক্রুসেডার রাষ্ট্র আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করে।

যাহোক, সুলতান দ্বিতীয় বায়েযিদ মৃত্যুর পূর্বেই তার ছেলে সালিমের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। সুলতান সালিম সালতানাতের আসন পাকাপোক্ত করার পর ভেনিস, হাঙ্গেরি, মস্কো ও মিশর সালতানাতের সাথে দীর্ঘ মেয়াদি যুদ্ধবিরতি চুক্তি দৃঢ় করে পারস্যের প্রতি মনোযোগী হন। শিয়া মতাদর্শী সাফাবিদের সাম্রাজ্য সেখানে শক্তিশালী হয়ে উঠছিলো। সাফাবি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাইল সাফাবি একদিকে তাবরিয থেকে শিরায় পর্যন্ত এবং খোরাসানের বৃহৎ অংশ, ইরাক, বাগদাদ, আজারবাইজান ও দিয়ারে বকরসহ বহু অঞ্চল তার শাসনের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। সুলতান সালিম শিয়াদের হাত থেকে তা উদ্ধার করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ৯২০ হিজরিতে উভয় সৈন্যদলের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, আর উসমানি সৈন্যদল অস্বাভাবিক বিজয় অর্জন করে এবং ইসমাইল সাফাবি পালিয়ে যায়। সুলতান সালিমের সৈন্যদল একে একে মারদিন, রাক্কা, মাওসিল এবং পুরো দিয়ারে বকর বিজয় করে নেয়। শিয়াদের ক্ষমতা নিঃশেষ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং উসমানি সালতানাতের বিরুদ্ধে ইসমাইল সাফাবির সহযোগী তৎকালীন মিশরের সুলতান কানসু আলগুরির হাত থেকে মিশর উদ্ধার করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। উভয় সৈন্যদল ৯২২ হিজরিতে হলবের কাছাকাছি ‘মারজ দাবেক’ নামক প্রান্তরে মুখোমুখি হলে কানসু আলগুরির মামলুক সৈন্যরা পরাজয় বরণ করে এবং কানসু আলগুরিকে হত্যা করা হয়। অতঃপর সুলতান সালিম হলবে প্রবেশ করেন এবং হিমস, দিমাশকসহ অন্যান্য অঞ্চল খুব সহজেই বিজয় করে নেন। সেখানকার উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের প্রতি খুবই আন্তরিকতা প্রকাশ করেন। দিমাশকের জামে উমাবিকে মেরামতের নির্দেশ প্রদান করেন। সুলতান সালিম যখন তাতে জুমআ আদায় করতে যান, তখন জামে উমাবির খতিব সুলতানের নামের সঙ্গে ‘খাদেমুল হারামাইনিশ শারিফাইন’ উপাধি যোগ

[২০] বলা যায়, তখন থেকেই পুরো মুসলিম উম্মাহর উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে।

করেন; যা উসমানি খলিফাদের উপাধি হিসেবে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।^[২৯] সুলতান সালিম পরে পরে গায্যা ও কায়রো বিজয় করে মিশর থেকে মামলুক শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটান। আর সেই ৯২২ হিজরিতেই ইতিহাসের আরেকটি চিত্রপট পরিবর্তন হয়। এতদিন পর্যন্ত নামেমাত্র আব্বাসিদের একজনকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করা হতো; যদিও পরিপূর্ণ ক্ষমতা অন্যদের হাতে থাকতো। তারই ধারাবাহিকতায় মুতাওয়াক্কিল আল্লাহ খলিফা হিসেবে মিশরে ছিলেন। মিশর সুলতান সালিমের হস্তগত হলে সর্বশেষ আব্বাসি খলিফা মুতাওয়াক্কিল খিলাফতের দাবি থেকে সরে এসে সেটির অধিকার সুলতান সালিমকে ন্যস্ত করেন এবং হারামাইন শরিফাইনের চাবি সুলতানের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তখন থেকেই উসমানি শাসকগণ আমিরুল মুমিনিন ও খলিফাতুল মুসলিমিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

সুলতান সালিমের মৃত্যুর পর সালতানাতের আসনে সমাসীন হন উসমানি শাসকদের অন্যতম প্রসিদ্ধ, সম্মানিত ও দাপুটে সুলতান সুলাইমান আলকানুনি। তাঁর শাসনকাল যেমনিভাবে উসমানি সালতানাতের উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থানের সময়, তেমনিভাবে তা ছিলো ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর গৌরবান্বিত ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। সুলতান সুলাইমান তাঁর গভর্নরদের নিকট চিঠি প্রেরণ করলে তাতে কুরআনে কারিমের আয়াত উল্লেখ করে নসিহত করতেন, ইনসাফের ফজিলত ও যুলমের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। সুলতান সুলাইমান ৯২৬ হিজরি থেকে ৯৭৪ হিজরি পর্যন্ত দীর্ঘ শাসনকালে ধারাবাহিক জিহাদ ও বিজয়ের মাধ্যমে পুরো ইউরোপকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। জলে ও স্থলে তাঁর বিজয়ের ধারা সমানহারে চলমান ছিল। ৯২৭ হিজরিতে তিনি হাঙ্গেরির সবচেয়ে নিরাপদ দুর্গ বেলগ্রেড বিজয় করে নেন; যা দানিউব নদীর অপরপ্রান্তের অঞ্চলগুলো বিজয়ের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের সহযোগী ছিল। ৯৩২ হিজরিতে মোকরার যুদ্ধে হাঙ্গেরি ও তাদের সহযোগী জার্মানি-অস্ট্রিয়ার সৈন্যদলকে পরাজিত করে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট দখলে আনেন এবং হাঙ্গেরির রাজা দ্বিতীয় লুইসকে হত্যা করা হয়। ৯৩৫ হিজরিতে তিনি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা অবরোধ করেন। পরবর্তী সময়ে অস্ট্রিয়ার রাজা চুক্তি করে জিয্যা দিতে বাধ্য হয়। এভাবেই চলতে থাকে সুলতান সুলাইমানের দাপট ও বিজয়ের ঘোড়া। স্থলের ন্যায় সামুদ্রিক যুদ্ধেও ব্যাপকভাবে বিজয় আসতে

[২৯] পরবর্তী সময়ে «*خادم المستعمرين الملعونين*» তথা আমেরিকা-ইসরাইলের খাদেম আলে সাউদের বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আবদুল আযিয তা ছিনতাই করে নেয়; যা বর্তমানেও আলে সাউদের বাদশাহরা প্রত্যর্গা করে অসত্যরূপে ব্যবহার করে।

থাকে। বিশেষকরে তৎকালীন প্রখ্যাত সিপাহসালার খাইরুদ্দিন বারবারুসার সামুদ্রিক অভিযানের কথা খুবই প্রসিদ্ধ। ভীত-সন্ত্রস্ত ইউরোপের বেশিরভাগ রাজা সুলতান সুলাইমানের সঙ্গে চুক্তি করে জিয্যা দিতে বাধ্য হয়। সুলতানের সঙ্গে ফ্রান্সের কৃত চুক্তিনামা তৎকালীন উসমানিদের দাপট স্পষ্ট করে দেয়। মুসলিমদের উপর পর্তুগাল সৈন্যদের হামলাও কঠিন হস্তে প্রতিহত করা হয়। মোটকথা, দারুল ইসলামের বিস্তৃতি ও কুফরি শক্তির সংকোচন, জিহাদি চেতনা, সামরিক দক্ষতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্যচর্চা ও স্থাপত্যশিল্প; সকল বিবেচনায় সুলতান সুলাইমান আলকানুনির আমল ছিলো খিলাফতে উসমানির শীর্ষস্থানে। যদিও সুলতান সুলাইমানের শরিআত-বিরোধী কাজের ফিরিস্তি একেবারেই ছোটো ছিলো না, তবুও সামগ্রিক বিবেচনায় তাঁর শাসনামল মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের একটি গৌরবান্বিত অধ্যায় ছিল। তাঁর শাসনকালেই ৯৩২ হিজরিতে হিন্দুস্তানে জহিরুদ্দিন বাবরের হাতে মোঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।

সুলতান সুলাইমান আলকানুনির পর থেকেই বলা যায় উসমানি খিলাফতের অধঃপতন শুরু হয়। এর বড়ো কারণ ছিল, জিহাদের ব্যাপারে উদাসীনতা, শরিআত পরিপন্থি কাজের ব্যাপকতা এবং প্রচুর পরিমাণে বিজয় সাধিত হওয়ায় গনিমতের মাধ্যমে প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেওয়া এবং পারস্পরিক বিরোধ। তবুও মৌলিকভাবে শরিয়তে ইসলামিয়াই হাকেম ছিলো এবং জিহাদের মাধ্যমে দারুল ইসলামের সীমানা রক্ষা ও বিস্তৃত করার ধারা সামগ্রিকভাবে অব্যাহত ছিল। সুলতান সুলাইমানের পর দ্বিতীয় সালিম সুলতান হিসেবে নিযুক্ত হলে নতুন বিজয় তো দূরের কথা; বিজিত অঞ্চল ধরে রাখাও তার পক্ষে সম্ভব হতো না, যদি না দীর্ঘ দিনের ওঘির মুহাম্মাদ পাশা শত্রু হাতে তা আঞ্জাম দিতেন। ৯৭৯ হিজরিতে ভেনিস থেকে কুবরুস দ্বীপ বিজয় করা সম্ভব হলেও পরবর্তী সময়ে সমুদ্র পথে ভেনিস ও স্পেনের যৌথ আক্রমণে মুসলিমরা পরাজয় বরণ করে। তারপর সুলতান তৃতীয় মুরাদের আমলে উল্লেখযোগ্য কোনো বিজয় না হলেও হিজরি একাদশ শতকের শুরুতে আবারও জিহাদের ধারাবাহিকতায় কিছুটা গতি পায়। উসমানি সালতানাত সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে ইউরোপকে আবারও অধীনে আনতে সক্ষম হয় এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ বিজয় সাধিত হয়। সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদের যুগে ১০০৩ হিজরিতে হাঙ্গেরির বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় এবং ১০০৪ হিজরিতে ইউরোপীয় জোটের বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের বিজয় অর্জিত হয়। সুলতান আহমাদের পর সুলতান মুস্তফার অযোগ্যতার কারণে সালতানাতের মুফতি তাকে বরখাস্ত করে দ্বিতীয় উসমানকে সুলতান নিযুক্ত করেন। সুলতান দ্বিতীয় উসমানের শাসনকালে ১০৩০ হিজরিতে ইতালির

দক্ষিণে বোলগনা অঞ্চলের বিদ্রোহী এবং তাদের সহযোগী রাশিয়া, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার অধিবাসীদের কঠিনভাবে শাস্তা করে তাদের উপর জিযয়া আরোপ করা হয়। সুলতান চতুর্থ মুরাদ এবং সুলতান ইবরাহিমের আমলে উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন না হলেও সুলতান চতুর্থ মুহাম্মাদের আমলে ওঘির মুহাম্মাদ পাশা কুবরিলি এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে তাঁর সুযোগ্য সন্তান ওঘির আহমাদ পাশা কুবরিলির বীরত্বের কারণে ইউরোপের মোকাবেলায় উসমানিদের দাপটের ধারা অব্যাহত থাকে। ১০৮০ হিজরিতে ভেনিসদের থেকে ক্রিটি দ্বীপ বিজয় করা হয় এবং ১০৯১ হিজরিতে ভিয়েনাকে অবরোধ করা হয়। কিন্তু ১০৯৪ হিজরি থেকে আবারও ইতিহাসের দুঃখজনক অধ্যায় রচিত হয়। বিশ্বরাজনীতি থেকে ইসলামের রাজত্ব মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়া, জার্মানি, বোলগনা, ভেনিস, মাল্টা ও রাশিয়াসহ পুরো ইউরোপীয় গোষ্ঠী একজোট হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে উসমানি সালতানাতের অধীনস্থ অঞ্চলে আক্রমণ চালাতে থাকে। যার কারণে উসমানি সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং অস্ট্রিয়ার সৈন্যরা বেলগ্রেড অবরোধ করতে সক্ষম হয়। মোটকথা, হিজরি একাদশ শতকের শেষে এসে উসমানি সালতানাত মারাত্মক বিপর্যয়ের শিকার হয়। তবে সুলতান দ্বিতীয় সুলাইমানের সময়ে প্রধান ওঘির কুবরিলি মুস্তফা পাশার দক্ষতা ও বীরত্বের কারণে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং হারানো অনেক ভূখণ্ড উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সুলতান দ্বিতীয় আহমাদের পর সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা সালতানাতের আসনে আরোহণ করলে তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতায় অনেকটা ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়। জয়-পরাজয়ের মাঝে তাঁর জিহাদি তৎপরতা অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে ১১১০ হিজরিতে উসমানি সালতানাতের সঙ্গে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ভেনিস ও বোলগনার ঐতিহাসিক কার্লোভিটসের চুক্তি সম্পাদিত হয়; যা কোনো অবস্থাতেই কাম্য ছিলো না। ওই চুক্তির ফলে ইউরোপ নিরাপদ হয়ে যায়, আর উসমানি সালতানাতের অগ্রযাত্রা থেমে যায়।

হিজরি দ্বাদশ শতককে রাশিয়ার বিরুদ্ধে উসমানি খিলাফতের জিহাদের শতক বলা যায়। উসমানি খিলাফতের অধীনস্থ ‘আযাক’ অঞ্চলে রাশিয়া আক্রমণ করলে সুলতান তৃতীয় আহমাদের আমলে ১১২৩ হিজরিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হয়। উসমানি সৈন্যরা তাতে বিজয় লাভ করে এবং রাশিয়া চুক্তি করতে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময়ে রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জোট করে উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসলে সুলতান মাহমুদের আমলে ১১৪৮ হিজরিতে আবারও তারা পরাজয় বরণ করে। রাশিয়ার মোকাবেলায় যুদ্ধ জয়-পরাজয়ের মধ্যে অব্যাহত থাকলেও দ্বাদশ শতকের প্রথম অর্ধাংশে

উসমানিদের জয়ের পাল্লাই ভারী ছিল। তবে সুলতান মাহমুদের আমলে ক্রুসেডারদের মন ভোলানো উপটৌকনের আড়ালে কঠিন চক্রান্তের যে বীজ বপন করা হয়, সেটির বিষাক্ত ছোবল উসমানি খিলাফতকে তো নিঃশেষ করেছেই; আজো পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ তার গ্লানি বহন করে চলছে। ১১৫৩ হিজরিতে ফ্রান্সের সঙ্গে একটি চুক্তির প্রাক্কালে সুলতান মাহমুদ দূত মারেফত চুক্তির নমুনা সহ ফ্রান্সের রাজার জন্য কিছু উৎকৃষ্ট হাদিয়া প্রেরণ করেন। ফ্রান্সের রাজা খুব সম্মানের সহিত তা গ্রহণ করে এবং সুলতানের জন্য উপটৌকনস্বরূপ দুটি যুদ্ধজাহাজসহ একদল গোলন্দাজবাহিনীও প্রেরণ করে; যাতে গোলন্দাজ বাহিনী উসমানি সৈন্যবাহিনীকে নতুন নতুন যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দিতে পারে। অসতর্ক সুলতান খুব সহজেই এই বিষফোঁড়া উপটৌকন গ্রহণ করে নেয়; অথচ তা ছিলো ক্রুসেডারদের দীর্ঘমেয়াদি একটি ষড়যন্ত্রের সূচনা। এই গোলন্দাজ বাহিনী দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে ধীরে ধীরে উসমানি সৈন্যদেরকে খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা, জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতা বদ্ধমূল করে দেওয়া এবং ফ্রিম্যাসন (ইহুদিদের একটি গুপ্তসংঘ) নীতিতে বিশ্বাসীও করার জন্য মগজধোলাই করতে থাকে। ক্রুসেডারদের সেই চক্রান্তের ঘূর্ণিপাকে উসমানি খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটে।

যাহোক, হিজরি দ্বাদশ শতকের প্রথম অর্ধাংশে রাশিয়ার বিপরীতে উসমানি খিলাফতের জয়ের পাল্লা ভারী থাকলেও শেষ অর্ধাংশে রাশিয়ার জয়ের পাল্লা ভারী হতে থাকে। সুলতান মাহমুদের আমলে ১১৫২ হিজরিতে রাশিয়ার মোকাবেলায় এক যুদ্ধে উসমানি সৈন্যরা পরাজয় বরণ করার পর বেলগ্রেডে উভয়ের মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার তৎকালীন রাণী দ্বিতীয় ক্যাটরিনা চুক্তি ভঙ্গ করে ক্রিমিয়ায় আক্রমণ করলে ১১৮২ হিজরিতে সুলতান তৃতীয় মুস্তফার আমলে উসমানি খিলাফত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তবে দু-বছরের মাথায় ১১৮৪ হিজরিতে এজিয়ান সাগরের চিওস দ্বীপের যুদ্ধে উসমানি সৈন্যরা পরাজয় বরণ করে। পরবর্তী সময়ে রাশিয়া সুলতান প্রথম আবদুল হামিদকে ১১৮৮ হিজরিতে ওই চুক্তিতে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়, যে চুক্তিতে তারা সুলতান তৃতীয় মুস্তফাকে আবদ্ধ করতে পারেনি। ওই চুক্তির ধারাগুলোই উসমানি খিলাফতের অধঃপতনের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়। ১১৯৭ হিজরিতে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে নিজেদের দখলে নেওয়ার পর ১১৯৮ হিজরিতে আবারও রাশিয়ার সঙ্গে কুস্তনতিনিয়া চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এভাবেই উসমানি খিলাফতকে রাশিয়া পরাভূত করতে থাকে এবং সার্বিয়া ও হাঙ্গেরিসহ বিভিন্ন অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হিজরি ত্রয়োদশ শতকের সূচনা থেকেই মুসলিম উম্মাহ; বিশেষকরে উসমানি খিলাফতের দুর্বলতা ও অধঃপতনের ইতিহাস আরো বিস্তৃত হতে থাকে। একদিকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যৌথ আক্রমণে উসমানি খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চল হাতছাড়া হতে থাকে, অপরদিকে বাতেনি শিয়া সম্প্রদায় সাধারণ মানুষদের মাঝে শিরক-বিদআতের বীজ ব্যাপকভাবে বপন করতে থাকে। এতে আরো যোগ হয়, সুলতান তৃতীয় সালিম উসমানি সালতানাতের সামরিক বাহিনী ‘ইনকিশারিয়া’র বিপরীতে পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জায় ইউরোপীয় মানসিকতার আরেকটি সামরিক বাহিনী গঠন করার কারণে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা।^[৩০] অপরদিকে ১২১৩ হিজরিতে ফরাসি সামরিক অধিনায়ক (পরবর্তী সম্রাট) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশরে আক্রমণ করে।^[৩১] অবশ্য ফরাসিরা ১২১৬ হিজরি পর্যন্তই মিশরকে তাদের দখলে রাখতে পেরেছে। ইংরেজ ও ফরাসিদের পারস্পরিক শত্রুতাকে কাজে লাগিয়ে উসমানি খিলাফত ইংরেজদের সহযোগিতায় ফরাসিদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। ১২২২ হিজরিতে ইংরেজরা মিশরে হামলা করে ইস্কান্দারিয়া দখল করলে তৎকালীন মিশরের গভর্নর মুহাম্মাদ আলি পাশা তাদের পরাজিত করে এবং ইংরেজরা চুক্তি করে মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বলকান

[৩০] যদিও সালতানাতের মুফতি সুলতান তৃতীয় সালিমকে বরখাস্ত ঘোষণা করলে সুলতান তা থেকে ফিরে আসেন; তবে সুলতানের বরখাস্তের হুকুম বহাল রাখা হয় এবং মুফতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, কোনো সুলতান এমনটি করলে তিনি সুলতান হওয়ার অধিকার হারাবেন।

[৩১] আক্রমণের পূর্বে মিশরবাসীকে উদ্দেশ্য করে নেপোলিয়নের চিঠি থেকে শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু আছে। মুসলিমদের সরলতার সুযোগে ক্রুসেডাররা সর্বযুগে কীভাবে তাদেরকে দমন করেছে; তার নমুনা ওই চিঠিতে বিদ্যমান। আমরা নেপোলিয়নের চিঠির কিছু অংশ উল্লেখ করছি,

بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه. من طرف الفرنساوية المبني على أساس الحرية والتسوية..... يا أيها المصريون! قد قيل لكم إنني ما نزلت بهذا الطريق إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه، وقولوا للمفترين: إنني ما قدمت اليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وأنتي أكثر من الممالك أعبد الله سبحانه وتعالى، وأحترم نبيه والقرآن العظيم، وقولوا أيضاً لهم: إن جميع الناس متساوون عند الله..... (تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي، ৩/৫)

“বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তাঁর ক্ষমতায় কোনো অংশীদার নেই। ফরাসির পক্ষ হতে যেটির নির্ভরতা স্বাধীনতা ও সমতার ভিত্তির উপর।..... হে মিশরবাসী! তোমাদেরকে বলা হয়েছে, আমি এই পথে এসেছি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে। এটি স্পষ্ট মিথ্যা, তোমরা তা সত্য মনে করো না। অপবাদদাতাদের বলে দাও, আমি তোমাদের নিকট আসছি অত্যাচারীদের হাত থেকে তোমাদের অধিকার উদ্ধার করার জন্য। আমি গোলামদের চেয়েও বেশি আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি এবং তাঁর নবি ও কুরআনে আযিমকে সম্মান করি। তোমরা তাদেরকে বলে দাও, সকল মানুষ আল্লাহর কাছে সমান।.....” (তারিখু আজায়িবিল আসার, ৩/৫)

কীভাবে ধর্মের আবরণে তারা মুসলিমদের শাসন করেছে এবং মুসলিমদের মস্তিষ্কে স্বাধীনতা ও সমতার মতো বিষাক্ত কীটগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে; এটি তার একটি নমুনা মাত্র।

হিজরি ত্রয়োদশ শতকের সূচনা থেকেই মুসলিম উম্মাহ; বিশেষকরে উসমানি খিলাফতের দুর্বলতা ও অধঃপতনের ইতিহাস আরো বিস্তৃত হতে থাকে। একদিকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যৌথ আক্রমণে উসমানি খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চল হাতছাড়া হতে থাকে, অপরদিকে বাতেনি শিয়া সম্প্রদায় সাধারণ মানুষদের মাঝে শিরক-বিদআতের বীজ ব্যাপকভাবে বপন করতে থাকে। এতে আরো যোগ হয়, সুলতান তৃতীয় সালিম উসমানি সালতানাতের সামরিক বাহিনী ‘ইনকিশারিয়া’র বিপরীতে পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জায় ইউরোপীয় মানসিকতার আরেকটি সামরিক বাহিনী গঠন করার কারণে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা।^[৩০] অপরদিকে ১২১৩ হিজরিতে ফরাসি সামরিক অধিনায়ক (পরবর্তী সম্রাট) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশরে আক্রমণ করে।^[৩১] অবশ্য ফরাসিরা ১২১৬ হিজরি পর্যন্তই মিশরকে তাদের দখলে রাখতে পেরেছে। ইংরেজ ও ফরাসিদের পারস্পরিক শত্রুতাকে কাজে লাগিয়ে উসমানি খিলাফত ইংরেজদের সহযোগিতায় ফরাসিদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। ১২২২ হিজরিতে ইংরেজরা মিশরে হামলা করে ইস্কান্দারিয়া দখল করলে তৎকালীন মিশরের গভর্নর মুহাম্মাদ আলি পাশা তাদের পরাজিত করে এবং ইংরেজরা চুক্তি করে মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বলকান

[৩০] যদিও সালতানাতের মুফতি সুলতান তৃতীয় সালিমকে বরখাস্ত ঘোষণা করলে সুলতান তা থেকে ফিরে আসেন; তবে সুলতানের বরখাস্তের হুকুম বহাল রাখা হয় এবং মুফতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, কোনো সুলতান এমনটি করলে তিনি সুলতান হওয়ার অধিকার হারাবেন।

[৩১] আক্রমণের পূর্বে মিশরবাসীকে উদ্দেশ্য করে নেপোলিয়নের চিঠি থেকে শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু আছে। মুসলিমদের সরলতার সুযোগে ক্রুসেডাররা সর্বযুগে কীভাবে তাদেরকে দমন করেছে; তার নমুনা ওই চিঠিতে বিদ্যমান। আমরা নেপোলিয়নের চিঠির কিছু অংশ উল্লেখ করছি,

بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه. من طرف الفرنسيات المبنية على أساس الحرية والتسوية..... يا أيها المصريون! قد قيل لكم إنني ما نزلت بهذا الطريق إلا لأقصي إزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه، وقولوا للمفتريين: إنني ما قدمت اليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وأنني أكثر من الممالك أعبد الله سبحانه وتعالى، وأحترم نبيه والقرآن العظيم، وقولوا أيضاً لهم: إن جميع الناس متساوون عند الله..... (تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي، ٥/٣)

“বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তাঁর ক্ষমতায় কোনো অংশীদার নেই। ফরাসির পক্ষ হতে যেটির নির্ভরতা স্বাধীনতা ও সমতার ভিত্তির উপর।..... হে মিশরবাসী! তোমাদেরকে বলা হয়েছে, আমি এই পথে এসেছি তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে বিচ্যুত করতে। এটি স্পষ্ট মিথ্যা, তোমরা তা সত্য মনে করো না। অপবাদদাতাদের বলে দাও, আমি তোমাদের নিকট আসছি অত্যাচারীদের হাত থেকে তোমাদের অধিকার উদ্ধার করার জন্য। আমি গোলামদের চেয়েও বেশি আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি এবং তাঁর নবি ও কুরআনে আযিমকে সম্মান করি। তোমরা তাদেরকে বলে দাও, সকল মানুষ আল্লাহর কাছে সমান।.....”

(তারিখু আজায়িবিল আসার, ৩/৫)

কীভাবে ধর্মের আবরণে তারা মুসলিমদের শাসন করেছে এবং মুসলিমদের মস্তিষ্কে স্বাধীনতা ও সমতার মতো বিষাক্ত কীটগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে; এটি তার একটি নমুনা মাত্র।

অঞ্চলে রুশ সেনাদের মোকাবেলায় উসমানি খিলাফতের ধারাবাহিক পরাজয় দেখে রাশিয়া ও ইউরোপের সমর্থনে গ্রিকরাও বিদ্রোহ করে বসে। তবে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ১২৩৭ হিজরিতে মুহাম্মাদ আলি পাশার মাধ্যমে গ্রিকদের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। এই মুহাম্মাদ আলি পাশা ও তার ছেলে ইবরাহিম পাশার মাধ্যমেই উসমানি খিলাফত আলে সাউদের প্রথম পর্বের শাসনের মূলোৎপাটন করে। আর সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের হাতেই উসমানিদের সামরিক বাহিনী 'ইনকিশারিয়া' বিলুপ্ত হয়। একদিকে ফ্রান্স আর অপরদিকে রাশিয়া ও ইউরোপীয় জোটের আগ্রাসী মনোভাব এবং উসমানি খিলাফতের অধীনস্থ বিভিন্ন অঞ্চল; বিশেষকরে গ্রিসের স্বাধীনতা মেনে নিতে উসমানি খিলাফতকে বলপ্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ চতুর্দিকে ঘোষণাপত্র প্রেরণ করেন; যাতে দ্বীন ও দারুল ইসলামের সীমানা রক্ষা করতে সবাইকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১২৩৯ হিজরিতে রাশিয়া উসমানি সালতানাতে বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ইউরোপের প্রভাবশালী সাম্রাজ্যগুলো লন্ডনে সমাবেশ করে। সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ জিহাদি তৎপরতা চলমান রাখলেও একে একে বিভিন্ন অঞ্চল হাতছাড়া হতে থাকে। ১২৪৪ হিজরিতে ফ্রান্স মেসিডোনিয়া দখল করে নেয় এবং ১২৪৫ হিজরিতে রাশিয়া ও ইউরোপীয় জোট আদরানা চুক্তিতে উসমানি খিলাফতকে গ্রিসের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। ১২৪৬ হিজরিতে ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকার জাযায়ের অঞ্চল দখল করে নেয়।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের পর যখন সুলতান প্রথম আবদুল মাজিদ খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন তখন সালতানাতে মারাত্মক পর্যায়ের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিলো। মুহাম্মাদ আলি পাশার বিদ্রোহ এবং উসমানি সৈন্যদলের উপর বিজয় লাভ করা, অপরদিকে অন্যান্য শত্রুদের আগ্রাসন; সব মিলিয়ে শত্রুপক্ষকে বহু বিষয়ে ছাড় দিয়ে উসমানি সালতানাতকে বিভিন্ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হচ্ছিলো। ১২৬৪ হিজরিতে ইংরেজরা ইয়ামানের 'আদান' দখল করে নেয় এবং বাবুল মানদিব নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়। ১২৭৩ হিজরিতে রোমানিয়া উসমানি খিলাফতের হাতছাড়া হয়ে যায়; যা চার শতকের অধিককাল উসমানিদের অধীনে ছিল। ১২৬৯ হিজরিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শুরু হওয়া ক্রিমিয়া যুদ্ধ ১২৭৩ হিজরিতে প্যারিস চুক্তি সম্পাদন হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকে, আর উসমানি খিলাফতের বহু ভূখণ্ড হাতছাড়া হয়ে যায়। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের আমলের শুরুতেই ১২৯৩ হিজরিতে রাশিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যোগসাজশে উসমানি খিলাফত বসনিয়ার হার্জোগোভিনা অঞ্চলের দখল হারায়। ১২৯৭ হিজরিতে ফ্রান্স তিউনিসিয়া দখল করে এবং ১২৯৮ হিজরিতে ইংরেজরা আহমাদ উরাবি পাশার

বিদ্রোহ দমনের নামে মিশর ও মিশরের অধীনস্থ সুদান দখল করে। ১৩১৭ হিজরিতে সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে জায়োনিষ্টদের প্রথম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যে সমাবেশে ফিলিস্তিন ভূমিতে ইহুদিদের বসতি স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৩২১ হিজরিতে ফ্রান্স মারাকেশ দখল করার পর মাগরিবের অঞ্চলগুলো স্পেনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়। ১৩২৭ হিজরিতে পাঁচ শতকের অধিককাল উসমানিদের অধীনে থাকার পর বুলগেরিয়া হাতছাড়া হয়ে যায়। আর এই ১৩২৭ হিজরিতেই ‘ডোনমে’ ইহুদিদের^[৩২] ধর্মনিরপেক্ষ ও তুর্কি জাতীয়তাবাদী সংগঠন ‘জামইয়্যাতুল ইত্তিহাদ ওয়াততারাক্কি’র বিদ্রোহে উসমানিদের কার্যত সর্বশেষ খলিফা সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ক্ষমতাচ্যুত হন; যা ছিলো জায়োনিষ্টদের গুপ্তসংঘ ‘ফ্রিম্যাসন’র খুবই সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের অংশ। মূলত ফিলিস্তিন ভূমিতে জায়োনিষ্টদের বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিলো সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ। তিনি ফিলিস্তিনের এক বিঘত জমিনও ইহুদিদের দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তেমনিভাবে ডোনমে ইহুদি ইত্তিহাদিরা কোনোভাবেই যখন তাদের রচিত আইনে শাসনকার্য পরিচালনায় সুলতান আবদুল হামিদকে সম্মত করতে পারছিল না; বরং সুলতান তখনও ইউরোপীয় কর্তৃত্ব মোকাবেলা করার জন্য মুসলিম উম্মাহকে আহ্বান করছিলেন, তখনই তারা তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। আর এর মাধ্যমেই কর্তৃত্বের ইসলামকে বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা যায়, ফিলিস্তিন তখনই ইহুদিদের হাতে চলে যায়। ধারণা করা হয়, এর পূর্বের দুই সুলতান তথা আবদুল আযিয ও পঞ্চম মুরাদকেও একই কারণে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, যদিও মুস্তাশরিকিন-প্রাচ্যবিদরা এই তিন খলিফা তথা আবদুল আযিয, পঞ্চম মুরাদ ও দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে বহু গালগল্প ও শাইখুল ইসলাম কর্তৃক ফাতওয়ার কথা উল্লেখ করে; যেগুলো বিশেষকরে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের ক্ষেত্রে সর্বৈব মিথ্যা। ডোনমে ইহুদিরা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ক্রমান্বয়ে মিদহাত পাশা, তালআত পাশা, আনওয়ার পাশা, জামাল পাশা ও কামাল আতাতুর্ক নামক তাদের পোষ্য কুকুরগুলোকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমেই মূলত ইসলামি খিলাফত বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী তিনজন মুহাম্মাদ রাশাদ, মুহাম্মাদ অহিদ্দিন ও দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ; তাদের নামেমাত্র খলিফা নিযুক্ত করে প্রাসাদে আবদ্ধ রাখা হয়। ইত্তিহাদি শয়তানগুলো তখন ইহুদিদের কুমন্ত্রণায়

[৩২] উসমানি সালতানাতের সাব্বাতিয়ান ক্রিপ্টো-ইহুদিদের একটি দল; যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করলেও মূলত ছিলো ইহুদি।

ক্রিম্যাসনের নীতি অনুসারে এবং ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে উসমানি খিলাফতবে টুকরো টুকরো করে চলছিলো। ইতিহাদি মূলহিদগুলোই ১৩৩৪ হিজরি থেকে ১৩৩৮ হিজরি পর্যন্ত চলমান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অক্ষশক্তির পক্ষে উসমানি খিলাফতকে জড়িয়ে দেয়। মিত্রশক্তি বিজয়ী হওয়ায় উসমানি খিলাফতকে খণ্ডবিখণ্ড করা আরো সহজ হয়ে যায়। প্রায় চার শতক উসমানিদের দখলে থাকা আলবেনিয়া ১৩৩২ হিজরিতে হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৩৩৪ হিজরিতে ইতালি লিবিয়া দখল করে নেয়। ১৩৩৬ হিজরিতে হিজাযের ভূমিতে আরবের অন্যতম গাদ্দার শরিফ হুসাইন ইবনে আলি যখন ইংরেজদের সহযোগিতায় আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য ওই গাদ্দারের দখলকৃত অঞ্চল রক্ষা করার নামে ইরাক, সিরিয়া, আরব সাগর, ফিলিস্তিন ও জর্ডানের অঞ্চলগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। ১৩৩৭ হিজরিতে যুক্তরাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের পররাষ্ট্র সচিব ‘আর্থার জেমস বেলফোর’ কর্তৃক ফিলিস্তিনে ইহুদি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য সমর্থনের নিশ্চয়তাপত্র প্রকাশ করা হয়। এই বৎসরেই ইংরেজ সেনাপতি ‘এডমন্ড হেনরি অ্যালেনবি’ আলকুদসে প্রবেশ করে ঘোষণা দেয়, আজ ক্রুসেড যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে। তেমনিভাবে তারা বাগদাদে প্রবেশ করে এবং এর পরের বছরেই ফ্রান্স বৈরুতে প্রবেশ করে।

এভাবেই বিশাল-বিস্তৃত দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হতে থাকে আর ইউরোপ ছয় শতকের অধিককালের পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সক্ষম হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩৪০ হিজরিতে ইতিহাসের কুখ্যাত ‘লুজান’ চুক্তির মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর উজ্জ্বল যুগের অবসান হয়ে নব্য জাহেলি যুগের সূচনা হয়; যে চুক্তিটি ইহুদির বাচ্চা ও ডোনমে ইহুদিদের পোষ্য কুকুর যিন্দিক কামাল আতাতুর্ক ও ব্রিটেনসহ মিত্রশক্তির সঙ্গে সম্পাদিত হয়। ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ‘জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন’^[৩৩] চারটি শর্ত আরোপ করে: তুর্কিস্তান থেকে খিলাফত বিলুপ্ত করতে হবে, খিলাফত পুনরুদ্ধারের সকল প্রচেষ্টা নিঃশেষ করতে হবে, ইসলামের সকল নিদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এবং ইসলামি শরিআতের পরিবর্তে তুর্কিদের জীবন বিধানের জন্য পাশ্চাত্য নীতি গ্রহণ করতে হবে। কামাল আতাতুর্ক সবগুলো মেনে নেয় এবং মিত্রশক্তি তুরস্ক ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। মিত্রশক্তির কেউ কেউ যখন মন্তব্য করে বলে, তুরস্ক আবারও ইউরোপ দখল করবে; তখন কার্জন তাদের আশ্বস্ত করে বলে, তোমরা নিশ্চিত থাকো, তুরস্ককে ইসলাম ও খিলাফত থেকে মুক্ত করার পর

[৩৩] যে ইতোপূর্বে ব্রিটিশ উপনিবেশ হিন্দুস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিল।

তুরক আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ধর্মনিরপেক্ষতার স্বাভাবিক প্রতারণা অনুযায়ী কামাল আতাতুর্ক প্রথমে খুব দরবেশের বেশ-ভূষা গ্রহণ করে। ঈদুল আযহার দিন আলেমদের পোশাক পরিধান করে এবং লম্বা তাসবিহ হাতে নিয়ে জনসাধারণকে ইসলামি বিধিবিধান পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে কয়েক দিন যাওয়ার পর একদিন উলামায়ে কেরামকে ডেকে "فصل الدين عن الدولة" তথা রাষ্ট্রকে ধীন থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে পরামর্শ করে। উলামায়ে কেরাম কঠিন ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করলে ওই হিংস্র কুকুর বহু সংখ্যক আলেমকে হত্যা করে এবং ১৩৪২ হিজরির রজবের ২৭ তারিখে খিলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা দেয়।^[৩৪] খিলাফত ও খলিফা শব্দের প্রতি মানুষের তখনও এতোটাই মুহাববত ছিলো যে, এই বিষাদময় সময়েও মানুষ আর্তনাদ করে শুধু এতটুকু দাবি জানায়, কোনো একজনকে খলিফা নিযুক্ত করা হোক; চাই তিনি ইংরেজ সমর্থিত মিশরের শাসকই হোক না কেনো। কিন্তু ইংরেজদের জন্য এই শব্দও আতঙ্কের কারণ ছিল; তাই তারা এই দাবিও প্রত্যাখ্যান করে। ইংরেজদের চাওয়া আজ পর্যন্ত পূরণ হয়ে চলছে। তখন থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কেউ খলিফা হয়নি এবং ইসলামি খিলাফত পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।^[৩৫] বিশ্বব্যাপী জায়েনিষ্টদের ষড়যন্ত্র এবং ডোনমে ইহুদিদের এই ভয়ংকর খেলার সামনে অসহায় ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ। খিলাফত পতনের পর হিংস্র যিন্দিক কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক ইংরেজদের দেওয়া শর্ত পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে যে কালো অধ্যায় রচনা করেছে, তা উল্লেখ করতে আমি অক্ষম। মুসলিম শাসকবৃন্দ ও মুসলিম উম্মাহর জিহাদ বিমুখতা, বিলাসিতা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও শরিআতের ব্যাপারে উদাসীনতা ছাড়াও যে সকল মতাদর্শ কাজে লাগিয়ে বিশ্ব কুফরি শক্তি খিলাফতকে বিলুপ্ত ও দারুল ইসলামকে গ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে সেগুলো ছিল, জাতীয়তাবাদ (বিশেষকরে আরব ও তুর্কি জাতীয়তাবাদ), মানব রচিত আইন, ধর্মনিরপেক্ষতা, অতঃপর গণতন্ত্র।

ইংরেজ কর্তৃক ক্রুসেড যুদ্ধ সমাপ্তির ঘোষণা দিয়ে একে একে মুসলিম ভূখণ্ডে তারা তাদের কর্তৃত্ব দৃঢ় করছিলো। এই পর্বে খ্রিষ্টানরা ধীনের নামে ক্রুস

[৩৪] আহ! যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রত্যাখ্যান করায় উলামায়ে কেরামকে প্রাণ দিতে হয়েছে, আজ তাদেরই একশ্রেণি ইনিযে বিনিযে সেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে (فعلیهم لعنة الله والملائكة) (والناس أجمعين، اللهم! العنهم لعناً كبيراً وخذهم أخذ عزيز مقتدر)। ধর্মনিরপেক্ষতার কুফর ও ভয়াবহতা এতোটাই জঘন্য যে, এমন কঠিন মুহূর্তেও উলামায়ে কেরাম ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে চুপ থাকাকে হিকমাহ মনে করেননি।

[৩৫] হ্যাঁ! আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং আফ্রিকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে শরিআ আইন বাস্তবায়িত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খিলাফত পুনরুদ্ধারের পথে উম্মাহ অগ্রসর হয়ে চলছে।

হয়েছে এবং আলহামদু লিল্লাহ, সেই ধারাবাহিকতা এখনও চলমান ও দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত চলমান থাকবে; যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

□ খিলাফত ও ইমারতে ইসলামিয়া দুর্বল ও পতনের পর

খিলাফত ও ইমারতে ইসলামিয়া দুর্বল ও পতনের পরও ‘সিয়াসাতে শারইয়া’ পুনরুদ্ধারে আকাবিরে হিন্দসহ উম্মাহর দ্বীনি ‘গাইরত’সম্পন্ন অংশ সালাফের দেখানো পথেই অগ্রসর হয়েছেন। হিন্দুস্তানসহ বিভিন্ন ভূখণ্ডে দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়ার কিছু দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

□ হিন্দুস্তান

জিহাদের মাধ্যমে হিন্দুস্তানের অংশবিশেষ দারুল ইসলাম ও শরিআ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সূচনা সাহাবাদের যুগেই সম্পন্ন হওয়ার কথা ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ আছে। পরবর্তী সময়ে মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেমের সিন্ধ বিজয়ের পর; বিশেষকরে সুলতান মাহমুদ গযনবির হিন্দুস্তান বিজয়ের পর হিন্দুস্তানে ইসলামের কর্তৃত্বের আসন ভালোভাবেই পাকাপোক্ত হয়। মৌলিকভাবে শরিআ শাসন কার্যকর হওয়া^(৩৭), জিহাদের মাধ্যমে দারুল ইসলামের সীমানা বিস্তৃতি ও

[৩৭] প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তুঘলকি সুলতান মুহাম্মাদ শাহ ইবনে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক শাহের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন প্রশংসনীয় দিক উল্লেখ করার এক পর্যায়ে বলেন,

وكان شديداً في إقامة الشرع. (رحلة ابن بطوطة، ص ৬৭)

“শরিআ বাস্তবায়নে তিনি খুবই কঠোর ছিলেন।” (রিহলাতু ইবনে বতুতা, পৃ: ৪৬৯)

সুলতান মুহাম্মাদ শাহের শাসনামলেই তার বৈমাত্রেয় ভাই মাসউদ খানের মা, সুলতান আলাউদ্দিনের মেয়েকে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে যিনার কারণে ‘রজম’ করা হয়। কাযি কামালুদ্দিন তাকে ‘রজম’ করেন। দেখুন, ‘রিহলাতু ইবনে বতুতা, পৃ: ৪৭১। তবে সুলতান মুহাম্মাদ শাহের অত্যাচারের ফিরিস্তিও একেবারে ছোটো ছিলো না।

শরিআ আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে পূর্ববর্তী সুলতানদের তুলনায় মোঘলদের উদাসীনতা বেশি থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের হিন্দু ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার বলে,

“মোঘল আমলের বিচারব্যবস্থার স্থূলতা, অপরিপক্বতা, কৌশলহীনতা ও অপরিপক্বতার মূল কারণ ছিলো সম্রাট ও কাজিদের কুরআনের আইন, যাহা ভারতের বাহিরে উৎপত্তি লাভ করে পরিপক্ব হইয়াছে, উহাকে একমাত্র আইনরূপে স্বীকৃতি প্রদান করা।” (ভারতে মুসলিম শাসনব্যবস্থার ইতিহাস, এ. কে. এম. আবদুল আলীম, পৃ: ১৭৫)

মোঘল শাসনামলেও মৌলিকভাবে কুরআনের আইন গ্রহণ করার বিষয় স্পষ্ট। তবে যদুনাথ সরকার সেটির কারণে যে অসারতার চিত্র তুলে ধরেছে তা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়; যা আল্লাহর আইনের শত্রুদের বাস্তবরূপের বহিঃপ্রকাশ।

সুরক্ষাসহ সিয়াসাতে শারইয়্যার অন্যান্য বিষয়াদি উমাবি, আক্বাসি ও উসমানি খিলাফতের মতোই প্রতিষ্ঠিত ছিল; যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু অংশ ইতোপূর্বের আলোচনায় বিক্ষিপ্তভাবে আমরা দেখেছি। গয়নি বংশের শাসনের পর ক্রমান্বয়ে ঘুর বংশ, খিলজি বংশ, তুঘলক বংশ, সৈয়দ বংশ, লোদি বংশ এবং মোঘল শাসকরা এই হিন্দুস্তান শাসন করে। ৯৬৩ হিজরি থেকে ১০১৪ হিজরি পর্যন্ত মোঘলদের মুলহিদ সম্রাট অসভ্য আকবরের 'দ্বীনে ইলাহি' প্রবর্তনের কারণে হিন্দুস্তানে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে; যার অসারতা থেকে মুসলিম উম্মাহকে মুক্ত রাখতে মুজাদ্দিদে আলফে সানি আহমাদ ইবনে আবদুল আহাদ সারহিন্দির অসাধারণ অবদান চিরস্মরণীয়। ১০৬৯ হিজরি থেকে ১১১৮ হিজরি পর্যন্ত হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠতম সম্রাট মুহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব আলমগিরের আমলে ইসলামের ঐতিহ্য অনেকাংশে ফিরে আসে। কিন্তু এই মহান সম্রাটের মৃত্যুর পর থেকেই একদিকে অভ্যন্তরীণ মুশরিক শিখ, মারাঠা, রাজপুত ও জাঠদের আন্দোলন ও বিদ্রোহের দাবানলে এবং অপরদিকে বহিরাগত খ্রিষ্টান ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার ও ষড়যন্ত্রের বিষাক্ত ছোবলে হিন্দুস্তানের ইসলামি শাসন খুব দ্রুত গতিতে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে ইউরোপীয় অনুপ্রবেশের সূচনা মুলহিদ আকবরের আমলেই হয়েছে। ১০০৯ হিজরিতে পর্তুগাল অতঃপর হল্যান্ড এবং ১০১২ হিজরিতে ইংরেজরা প্রবেশ করে। পরবর্তী সময়ে ১০৫২ হিজরিতে ফ্রান্স এবং ক্রমান্বয়ে স্পেন, জার্মানি, সুইডেন ও ডেনমার্ক প্রবেশ করে। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আড়ালে কার্যত অবস্থান পাকাপোক্ত করতে সক্ষম হয় ফরাসি ও ইংরেজরা। ১১৭১ হিজরিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসক নবাব সিরাজুদ্দৌলা পলাশির আত্মকাননে এবং ১২১৪ হিজরিতে মহিশুরের (কর্ণাটক) শাসনকর্তা ফতেহ আলি টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করায় ইংরেজদের জন্য হিন্দুস্তানকে উপনিবেশ বানানোর পথ আরো মসৃণ হয়ে যায়। ১১৭১ হিজরিতে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবির অনুরোধে আফগান শাসক আহমাদ শাহ আবদালির হিন্দুস্তান অভিযান শিখ ও মারাঠা শক্তিকে চরমভাবে বিধ্বস্ত করলেও মোঘল শাসকরা এই বিজয়ের সুফল ধরে রাখতে পারেনি, বরং আহমাদ শাহ আবদালি চলে যাওয়ার পর হিন্দুস্তান পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসে। পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা পুরো হিন্দুস্তানে তাদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে ১২১৮ হিজরিতে 'আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর' ঘোষণার মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্বের প্রকাশ্য জানান দেয়।

কিন্তু; যেমনটি আমরা বলেছিলাম, এমন কঠিন মুহূর্তেও অস্তিত্বহীন বিভিন্ন

শর্তেরা^{৩৮} অজুহাতে আকাবিরে হিন্দ হাল ছেড়ে বসে থাকেননি, বরং আহমেদ নববি থেকে চলে আসা ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতি তথা দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছেন। আহমাদ শাহ আবদালি হিন্দুস্তানে অভিযান শেষ করে চলে যাওয়ার পর যখন হিন্দুস্তান পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে, তখন শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবির সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিহাদ-কিতাল ব্যতীত এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে ইসলামি সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যে তিনি দাওয়াতুল জিহাদের কাজ শুরু করেন এবং তাঁর শিষ্যদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি সুসংঘবদ্ধ জামাআত প্রতিষ্ঠা করে সেটির কার্যক্রম সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১১৭৬ হিজরিতে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবির ইন্তিকালের পর তাঁরই যোগ্য সন্তান সিরাজুল হিন্দ শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির নেতৃত্বে জিহাদের দাওয়াহ ও জিহাদের প্রস্তুতির কাজ আরো ব্যাপকভাবে বেগবান হয়। বিশেষকরে ১২১৮ হিজরিতে ইংরেজরা যখন ক্ষমতাসীন সম্রাট থেকে ‘আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর’ মর্মে ফরমান আদায় করে প্রকাশ করে, তখনই শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি পুরো হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ফাতাওয়া প্রদান করেন। এই ফাতাওয়া জিহাদের দাওয়াহ ও জিহাদের প্রস্তুতির জন্য মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে। শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি ১২৩৯ হিজরিতে মৃত্যুর আগপর্যন্ত জিহাদের দাওয়াহ ও ইদাদের কাজ চলমান রাখেন। তৎকালীন পরাশক্তি ইংরেজদের মোকাবেলায় দাঁড়ানোর জন্য যখন কোনো শক্তিই সাহস করছিলো না, তখন একটি শক্তিই অগ্রসর হয়েছে, আর তা ছিলো শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবির হাতে তরবিয়ত পাওয়া কাফেলা। শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি যখন একেবারে বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং চোখেও দেখছিলেন না, তখনও তিনি পিছপা না হয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন। জিহাদের কর্মপন্থা তৈরি করে নিজের মুরিদ ও শিষ্যদের মাঝে যোগ্যতার বিবেচনায় দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছেন। তাঁর অন্যতম মুরিদ সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবিকে প্রধান এবং আপন ভাতিজা মাওলানা শাহ ইসমাইল ও জামাতা মাওলানা আবদুল হাই বুড়হানবিকে সহযোগী মনোনীত করে একটি মজবুত জিহাদি কাফেলা গড়ে তোলেন।

সাইয়েদ আহমাদ জিহাদের ফরয দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে নিজেকে পরিপূর্ণ

[৩৮] বর্তমান সময়ে দিয়ায়ি জিহাদের ক্ষেত্রেও যেগুলোর ব্যাপক চর্চা হয়, অর্থাৎ কর্তৃত্বসম্পন্ন আমিরুল মুমিনিন ও ভিন্ন ভূখণ্ড থাকা, ভিন্নগ্রহের ‘ইস্তিতাআত’ অর্জিত হওয়া - যা অর্জন হওয়ার কোনো পর্যায় নেই- এবং বিজয় সুনিশ্চিত হওয়া ইত্যাদির মতো হাস্যকর শর্তাবলী।

উৎসর্গ করেন। জিহাদি চেতনা সৃষ্টি এবং মুজাহিদ সংগ্রহের জন্য তিনি প্রচুর পরিমাণে সফর করেন এবং মুসলিমদের থেকে তায়কিয়ার বাইআতের পাশাপাশি জিহাদের বাইআত গ্রহণ করেন। কিতালের ইদাদের জন্য দিল্লি নিরাপদ না হওয়ায় তিনি সীমান্ত প্রদেশে হিজরত করেন এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন শাসক ও গোত্র প্রধানের নিকট দূত ও চিঠি পাঠিয়ে নুসরত কামনা করেন। সেখানেই তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কিতালের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। সাইয়েদ আহমাদের খানকা জিহাদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যে সময়গুলো জিকির-মুরাকাবায় ব্যয় হতো সেগুলো এখন যুদ্ধের কলা কৌশল রপ্ত করতে ব্যয় হতে লাগলো।^[۷۹] দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত ও ইদাদের মারহালা অতিক্রম করার পর তিনি চূড়ান্ত মারহালা তথা কিতালের ময়দানে অবতরণ করেন। ۱۲۸۲ হিজরির ۲۰ জুমাদাল উলা সর্বপ্রথম শিখদের মোকাবেলায় আকুড়ার যুদ্ধ এবং কিছুদিন পর হাজারুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দাওয়াতের পর্ব থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের কিতালের পর্ব পর্যন্ত কর্তৃত্ব সম্পন্ন আমিরুল মুমিনین না থাকা, নিজ কর্তৃত্ব সম্পন্ন পৃথক ভূখণ্ড না থাকা, ইংরেজ ও মুশরিকদের অস্বাভাবিক শক্তির বিপরীতে জিহাদি কাফেলার শক্তির ভারসাম্য না থাকা^[۸۰]

[۷۹] উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযি, ۲/۸۵۰।

[۸۰] সাইয়েদ আহমাদ শহیدির জিহাদের ব্যাপারেও 'ইস্তিতাত' সক্ষমতার প্রশ্ন উঠেছিল। শাহ ইসমাইল শহিদ সেই আপত্তির বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। আমরা সেখান থেকে প্রথম দিকের কিছু অংশ উল্লেখ করছি। শাহ ইসমাইল শহিদ বলেন,

باقی آپ نے جو اس کا ذکر کیا ہے کہ اہل شوکت کے مقابلے کے لئے مقابل شوکت چاہئے، پس اول تو یہ مقدمہ ممنوع ہے، کیونکہ شوکت کی تحصیل کی کوشش بقدر استطاعت کافی ہے، مخالفین کی شوکت کے مماثل ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَعِدُوا لَكُمْ سُلُطَةً، یہ نہیں فرماتا: وَأَعِدُوا لَكُمْ مِثْلَ مَا أَعِدُوا لَكُمْ۔ دوسرے یہ کہ شوکت کے وجود کے یہ معنی نہیں کہ امام کے جسم میں ایسی قوت پیدا ہو جائے کہ اس قوت سے مخالفین کی سلطنت کو درہم برہم کر دے اور اکیلے ان کے لشکروں اور فوجوں کو شکست دے دے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ موافقین کی ایسی جماعت اس کے ساتھ ہو جائے کہ باعتبار ظاہر عقل ان کی قوت سے مخالفین کی مدافعت کر سکے، اور اجتماع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ان کے چاروں طرف وہ لوگ کھڑے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کی ذات سے ایسا تعلق ہو کہ اس سے وہ اس کے احکام کی اطاعت کرنے لگے۔۔۔۔۔ (سیرت سید احمد شہید، ابوالحسن علی ندوی، ۱/۵۳۰)

“باقی آپ نے یہ বলلے، شক্তیشالیদের বিপরীতে সে পর্যায়ের শক্তির প্রয়োজন; প্রথমত: এ দাবি অগ্রহণযোগ্য। কেননা, সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা যথেষ্ট; বিরোধীদের শক্তির সমপর্যায়ের হোক বা না হোক। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আর তাদের মোকাবেলা করার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করো’। আল্লাহ তাআলা এভাবে বলেননি, তারা তোমাদের মোকাবেলায় যে পর্যায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে তোমরা সে পর্যায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। দ্বিতীয়ত: শক্তি অর্জনের অর্থ এই নয়, ইমামের শরীকে এমন শক্তি অর্জিত হয়ে যাবে যে শক্তির উপর নির্ভর করে তিনি বিরোধীদের ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং একাই তাদের সৈন্যদলকে পরাজিত করে ফেলবেন। বরং সেটির অর্থ হচ্ছে, আমিরের সমর্থকদের এমন একটি জামাআত তার সঙ্গে দেওয়া; বাহ্যত বিবেকে যাদের শক্তির উপর নির্ভর করে বিরোধীদের প্রতিরোধ করা যায়। আর একত্রিত হওয়ার অর্থ এই

এবং বিজয় সুনিশ্চিত না হওয়া ইত্যাদি কোনো কিছুই সাইয়েদ আহমাদের এই দিফায়ি জিহাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি, আর ফিকহে ইসলামির আলোকে দিফায়ি জিহাদের জন্য এগুলোকে শর্ত মনে করার কোনো সুযোগও নেই। সাইয়েদ আহমাদের নেতৃত্বে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধের প্রায় বাইশ দিন পর ১২৪২ হিজরির জুমাদাল আখেরার ১২ তারিখে বিভিন্ন মাসলাহাতের বিবেচনায় সাইয়েদ আহমাদ ইমামতের বাইআত গ্রহণ করেন।^[৪১] যাহোক, সাইয়েদ আহমাদের জিহাদি কাফেলা দুর্বীর গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। তৎকালীন লাহোরের শিখ রাজা রঞ্জিত সিংহের অত্যাচারে পেশওয়ার, কাবুল, কান্দাহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলিমরা ছিলো অতিষ্ঠ। সাইয়েদ আহমাদ তার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন। শরিআতের নীতি অনুসারে তাকে মুসলমান হওয়ার আহ্বান জানান, অথবা জিয্যা প্রদান করে বশ্যতা স্বীকার করতে বলেন। রঞ্জিত সিংহ এ দুটি প্রস্তাব অস্বীকার করে সাইয়েদ আহমাদের মোকাবেলায় সাত হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করে। সাইয়েদ আহমাদ মাত্র সাতশত মুজাহিদ নিয়ে তার মোকাবেলায় জিহাদের ময়দানে অবতরণ করেন এবং আল্লাহর নুসরতে রঞ্জিত সিংহের বাহিনীকে পরাজিত করেন। বিজিত অঞ্চলে তিনি শরিআ আইন চালু করেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মুদ্রাও চালু করা হয়। জয়-পরাজয়ের মাঝেই চলতে থাকে সাইয়েদ আহমাদের জিহাদি তৎপরতা। ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, শিখদের সশস্ত্র অবস্থান এবং মুসলিম নামধারী বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসক ও গোত্র প্রধানদের বিশ্বাসঘাতকতার সামনে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবির জিহাদি তৎপরতা বারবার থমকে দাঁড়িয়েও আবার নতুন উদ্যমে সামনে অগ্রসর হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১২৪৬ হিজরির ২৪ ফিলকা'দা হিন্দুস্তানের ইতিহাসে রচিত হয়েছে এক হৃদয়বিদারক অধ্যায়। রঞ্জিত সিংহের ছেলে শের সিংহের দশ হাজার সৈন্যের মোকাবেলায় মাত্র সাতশত মুজাহিদ নিয়ে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবি ঐতিহাসিক বালাকোটের ময়দানে অবতরণ করেন। সেখানেই বীরত্বের সহিত লড়াই করতে করতে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবি ও মাওলানা শাহ ইসমাইলসহ প্রায় তিনশত মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন। শিখদের বিজয় হলেও মুজাহিদদের

নয়, সার্বক্ষণিক আমিরের চতুর্পাশে সে সকল লোক দাঁড়িয়ে থাকবে। বরং তা দ্বারা উদ্দেশ্য, আমিরের সঙ্গে তাদের এমন সম্পর্ক তৈরি হওয়া যাতে তারা আমিরের অনুসরণ করতে থাকে।.....” (সিরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহিদ, ১/৫৩৫)

[৪১] তবে এটি বাস্তব অর্থে ইমামতে উযমা ছিলো না। কারণ, তখনো সাইয়েদ আহমাদের অধীনে কোনো ভূখণ্ড ছিলো না। গোত্র প্রধানদের যারা বাইআত দিয়েছিলেন তারা শুধু জিহাদের বাইআত দিয়েছিলেন এবং অন্যান্য বিষয়ে তারা স্বাধীন ছিলেন। সাইয়েদ মিয়া এটিকে বারবার ‘আরেযি’ অস্থায়ী-সাময়িক হুকুমত হিসেবে ব্যক্ত

হাতে তাদের প্রায় সাতশ সৈন্য খোঁয়াতে হয়।

সাইয়েদ আহমাদ শহিদ বেরেলবি ও মাওলানা শাহ ইসমাইল শহিদের জিহাদি তৎপরতার প্রভাব বাংলা মুলুকেও ছড়িয়ে পড়ে। সাইয়েদ আহমাদ শহিদের মুরিদ নিসার আলি তিতুমীর ইংরেজ মদদপুষ্ট বাংলার হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বিরাট বাহিনী গড়ে তোলেন। কলকাতার অদূরে নারিকেল বাড়িয়ায় তিনি একটি মজবুত বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। চব্বিশ পরগনা, নদিয়া ও ফরিদপুর জেলার বেশ কিছু জমিদারকে পরাজিত করে তিনি অধিকৃত অঞ্চলে শরিআ আইন চালু করেছিলেন। তিতুমীরকে দমন করতে জমিদাররা ইংরেজদের কাছে সহযোগিতা চাইলে ইংরেজরা আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের সৈন্যদলের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১২৪৭ হিজরিতে কর্নেল স্টুয়ার্ডের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করলে তিতুমীরের বাহিনী তাদের মোকাবেলায় বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু ইংরেজদের কামানের গোলায় বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং লড়াই করতে করতে তিতুমীর শাহাদাতবরণ করেন। তেমনিভাবে শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি ও সাইয়েদ আহমাদ শহিদের জিহাদি কর্মধারা অনুসরণ করে হাজি শরিয়তুল্লাহ বাংলাকে দারুল হারব ঘোষণা করেন।^[৪২] কুফর-শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ঢাকা, বরিশাল, পাবনা ও ময়মনসিংহসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করে তিনি ইংরেজ ও ইংরেজদের মদদপুষ্ট হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে কঠিন আন্দোলন গড়ে তোলেন যা ফরায়েযি আন্দোলন হিসেবে প্রসিদ্ধ। ১২৫৬ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র মুহসিনুদ্দিন দুদু মিয়া ফরায়েযি আন্দোলনকে আরো বেগবান করেন।

বালাকোটের ময়দানে মুজাহিদগণের পরাজয় হয়েছে ঠিক, কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের প্রহরীগণ পিষ্ট হলেও পিছিয়ে যান না। মুমিন পরাজিত হয়, কিন্তু মনোবল হারায় না এবং হারানোর সুযোগও নেই। বারবার হোঁচট খেয়েও আবার উঠে দাঁড়ায়। সাইয়েদ আহমাদ শহিদ ও শাহ ইসমাইল শহিদের উত্তরসূরিগণ আবারও সেই ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতিতেই অগ্রসর হয়েছেন। গোপনে-প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজকে আরো বেগবান করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য মুজাহিদগণকে প্রস্তুত করায় আত্মনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই যে ব্যক্তিত্বের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন মাওলানা আহমাদুল্লাহ শাহ। ‘জিহাদের শুকনো রণে তাজা খুন প্রবাহিত করা ও হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত করার’ শর্তে

[৪২] দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস-ঐতিহ্য অবদান, আবুল ফাতাহ ইয়াহইয়া, পৃ: ১৩৮।

তাঁর পীর মেহরাব আলি শাহ তাঁকে বাইআত প্রদান করেন।^[৪৩] ১২৬২ হিজরি থেকেই মাওলানা আহমাদুল্লাহ শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য নিজের পুরো জীবন ওয়াকফ করে পুরো দেশে দাওয়াতুল জিহাদের কাজে সফর শুরু করেন। তিনি মুজাহিদ সংগ্রহ করা, জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, মুজাহিদদের জন্য রসদের ব্যবস্থা করা এবং সেনাবাহিনীর মাঝেও জিহাদের ফাতাওয়া বিলি করা ইত্যাদি সকল কাজ পূর্ণ গোপনীয়তার সহিত আঞ্জাম দিতে থাকেন। তাঁর কার্যক্রম এতোটাই গোপন থাকত যে, তাঁর অনেক মুরিদ পর্যন্ত তাঁর আসল নাম জানতো না। কখনো এক জায়গায় স্থির থাকতেন না। তিনি গোপনে সড়কে, মসজিদের সামনে ও ঈদগাহের মতো মানুষের চোখে পড়ার স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতাওয়া বুলিয়ে দিতেন। উন্নত গোয়েন্দা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা তাঁর ব্যাপারে কোনো সুনিশ্চিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি।^[৪৪] অপরদিকে সাইয়েদ আহমাদ শহিদ ও মাওলানা শাহ ইসমাইল শহিদ থেকে জিহাদি কার্যক্রমের যে ধারাবাহিকতা চলে আসছিলো, তা তিনটি কেন্দ্রের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। মূলকেন্দ্র ছিলো দিল্লিতে। এ কেন্দ্রের নেতৃত্বে ছিলেন ক্রমান্বয়ে শাহ ইসহাক, শাহ আবদুল গনি, মাওলানা মামলুক আলি ও হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি। আরেকটি কেন্দ্র ছিলো পাটনায়। সেটির নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা এনায়েত আলি, মাওলানা বেলায়েত আলি ও মাওলানা ফরহাত আলি। তৃতীয় আরেকটি কেন্দ্র ছিলো আফগান সীমান্ত অঞ্চলের সিত্তানায়। এটির নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলি, মাওলানা ফয়েয আলি, ইয়াহইয়া আলি ও আকবর আলি প্রমুখ। তাঁরা দাওয়াত ও ইদাদের মাধ্যমে জনসাধারণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। গোপনে গোপনে পুরো হিন্দুস্তানে জিহাদের প্রস্তুতি চলতে থাকে।^[৪৫] তৎকালীন পরাশক্তি ইংরেজদের মোকাবেলায় শর্তের নামে কোনো বাহানা তাদের জিহাদের পথে বাধা হয়নি। ইংরেজদের কর্তৃত্বের বাইরে পৃথক ভূখণ্ড না থাকা, কার্যত মুসলিম শাসক না থাকা, ইংরেজদের সৈন্যবাহিনী ও অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের তুলনায় পর্যাণ্ড ‘ইস্তিতাআত’ না থাকা, বিজয় সুনিশ্চিত না হওয়া এবং ব্যাপকভাবে উলামায়ে কেরাম ও মুসলিম উম্মাহ ইংরেজ কর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা; কোনো বাহানাই তাঁদের জিহাদি তৎপরতাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি, মাওলানা কাসেম নানুতুবি, মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি, মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবি ও হাফেয যামেনসহ হিন্দুস্তানের আকাবিরে আসলাফ যখন ইংরেজদের

[৪৩] উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযি ৪/৯১৩।

[৪৪] ১৮৫৭ স্বাধীনতা যুদ্ধের উপাখ্যান, ইমরান রাইহান, পৃ: ১০৪-১০৫।

[৪৫] দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস-ঐতিহ্য অবদান, আবুল ফাতাহ ইয়াহইয়া, পৃ: ১৪৩।

বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন, তখন মাওলানা মুহাম্মাদ থানবি আপত্তি করে বলেছিলেন, আমাদের কাছে তো অস্ত্রশস্ত্র নেই, আমরা একেবারেই নিরস্ত্র। তৎক্ষণাৎ মাওলানা নানুতুবি বললেন, বদরের যুদ্ধে যে পরিমাণ অস্ত্র ছিলো সে পরিমাণও কি আমাদের কাছে নেই! এবার মাওলানা মুহাম্মাদ থানবি বললেন, আমাদের তো ইমাম নেই যার অধীনে জিহাদ করবো। তখন মাওলানা নানুতুবি বললেন, এটি কতক্ষণের ব্যাপার। হাজি সাহেব বসা আছেন, আমরা তাঁর হাতে জিহাদের বাইআত করবো। অতঃপর সকলে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কির হাতে বাইআত করেন।^[৪৬] যাহোক, আকাবিরে হিন্দ কর্তৃক জিহাদের দাওয়াত ও ইদাদের ধারাবাহিকতায় ১২৭৪ হিজরিতে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে উলামায়ে কেরামসহ জনসাধারণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই জিহাদের নেতৃত্ব দেওয়া হয় মূলত দুটি কেন্দ্র থেকে। একটি ছিলো দিল্লির সন্নিকটে থানাভবনে; যার নেতৃত্বে ছিলেন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি, মাওলানা কাসেম নানুতুবি ও মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি। অপর কেন্দ্র ছিলো আম্বালায়; যার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা জাফর থানেশ্বরী ও মাওলানা ইয়াহইয়া আলি। কিন্তু ইংরেজদের বিশাল সৈন্যবাহিনী, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ও বিশালাস্রাঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতার সামনে এই জিহাদে তাঁরা বিজয়ী হতে পারেননি। শামলির ময়দানে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কির বাহিনীও পরাজয় বরণ করেন এবং হাফেয মুহাম্মাদ যামেন শাহাদাতবরণ করেন। পুরো হিন্দুস্তানে ইংরেজদের কর্তৃত্ব আরো পাকাপোক্ত হয়ে যায় এবং গণমানুষের রক্তের উপর দিয়ে তারা তাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। শুরু হয় আলিম-

[৪৬] উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযি, ৪/৮৩৭।

মাওলানা কাসেম নানুতুবির শামলির ময়দানে সংঘটিত একটি ঘটনার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি শুধু এটি দেখানোর জন্য যে, আমাদের আকাবিরে হিন্দ জিহাদের ময়দানেও কতটা কৌশলী ছিলেন এবং বীরত্ব প্রকাশ করেছেন। মুফতি রশিদ আহমাদ লুখিয়ানবির ভাষ্যে বর্ণিত ঘটনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, মাওলানা কাসেম নানুতুবি শামলির ময়দানে তুমুল লড়াই করতে করতে এক পর্যায়ে কিছু সময়ের জন্য একটু স্থির হতে ময়দানের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইংরেজ সৈন্যদের এক বিশালদেহী শিখ সৈনিক; যে শরীর-স্বাস্থ্যের দিক থেকে নানুতুবির চারগুণ বেশি হবে সে দূর থেকে নানুতুবিকে ময়দানের এক প্রান্তে দেখে ফেলো। তখন ওই সৈনিক ক্রোধান্বিত হয়ে নানুতুবির দিকে তেড়ে এসে ধমক দিয়ে বললো, ‘তুমি বহুত হস্তিত্বি করেছ, এখন আমার আক্রমণ পারলে প্রতিহত করো’। এরপর তরবারি উঁচু করে চিৎকার দিয়ে বলল, ‘এই খড়্গ তোমার মৃত্যুর পয়গাম’। সে পূর্ণ শক্তি দিয়ে ধারালো তরবারি দ্বারা নানুতুবির উপর আক্রমণে উদ্যত হতেই নানুতুবি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ঘটনা কী ঘটছে, নিজের পেছনের খবর আছে! সে ঘুরে পেছনে ফিরতেই নানুতুবি বিদ্যুৎ গতিতে তরবারি দ্বারা তার ডান কাঁধে এমন তীব্র আঘাত করলেন, তরবারি তার ডান কাঁধ পার হয়ে বাম পায়ে এসে ঠেকলো। ওই সৈন্যের বিশালদেহ দুটুকরো হয়ে একভাগ একদিকে আর অপরভাগ অন্যদিকে মাটিতে পড়ে ছিল। নানুতুবি ক্লান্ত হয়ে কিছুটা স্থির হতে গিয়েছিলেন, কিন্তু এই ঘটনায় আরো উদ্যমী হয়ে উঠলেন। তিনি ওই লাশ মাড়িয়ে আবার জিহাদের কাতারে

ولاما نلنہنر مہاۛسب۔ ٲرای اہل لکھاہک آالہمکے فاسل دےوفا ہف اہف ہاآار ہاآار آالہمکے دہلٲاآتر کرا ہف۔ اآدےر سآآرل باآےفاآا کرے آرہاڈل آآاللف دےوفا ہف اہف دہمفل شلکفاٲرلآانآولہ بآک کرے دےوفا ہف۔

کلسآ؛ فہمناآل آامرا ٲرآم فوآ آہکے دےآہ آاسآل، ؤمماہر دہلنل آالہرآ سآآرل اآش کولہ اہآآاآہل آال آہڈے دن نا۔ باربار ٲراآلآل آوفا ؤ آلرےآدےر اہمنا کآرآآسآآرل آآل ٲرہکفاٲآےؤ آاکاہلرے آلنل آسلالمرے کآرآآ ٲنررکآارےر ٲرآہآا آہکے آاآ آآلفے بسے آاکےنلنل با 'مآاؤراراس' ٲکآآلر بکآآ کلآ آلسآا کرےنلنل۔ بارآ آلآاڈےر داؤاآ ؤ آداآ-ٲرآآآلر آنا آارہ دلرآمےفاآل سآآلسآل ٲرلکآآنا آرآآ کرےن۔ اہل مہان لکآلر دورآ لسلےے اہف دہلنر آارہ کلآ موللک بلسآکے سامنل رےآہ ١٢٢٣ لآلرلآل مآدزل آلمل دارلل ؤلوم دےؤبند ٲرلآا کرا ہف۔^[٨٩] لآآاآول

[٨٩] دارلل ؤلوم دےؤبند ٲرلآار ؤدءشل کل؟ آا آامرا مآدزل آلملر ٲرآم آآر شالآول آلنلر باآل دےآہل ٲارل؛ فا آلنل مآؤلانا ماناآلر آاسانل آللانلر سامنل باآآ کرےآلنل۔ شالآول آلنل بلنل،

آآرلآاآلآل اس مدرسہ کو کلا درس و آدرلس، آعللم و آعلم کلئلے قائم کلا آآا؟ مدرسہ مرلے سامنلے قائم ہوا، آہاں آک ملل آانا ہول سنہ ١٨٥٧ع کے آنگلے کل ناآا کل بآلر ارادہ کلا کلا کہ کوآل آلسا مرآر قائم کلا آآا، آس کے زلر آرلوآول کوآلر کلا آآا کہ ١٨٥٧ع کل ناآا کل آلانی کل آآا۔

آعللم و آعلم، درس و آدرلس آن کا مقصد اور نصب العلن ہے، ملل ان کل راہ ملل مزآم نللل ہول، لکلن آوآاٲنلے لے آواسل راہا کل ملل نل آآاب کلا ہے، آس کلئلے دارالعلوم کا لے نظام مرلے زراآک آآرلآاآلآل آآا۔ (آاطر اورالعلوم ملل آللے ہولے دن، مناظر آسن آلانی، ص ١٧٠ - ١٧١)

“آآرآول ؤسآاآ (کاسم ناآولل) کل اہل مآداراسا دلس-آادرلس ؤ آلم آاآن-ٲرلآانلر ؤدءشل ٲرلآا کرےآلنل؟ مآداراسا آمار سامنل ٲرلآا لےآہل۔ آمل فاآولکو آانل، ١٢٤٩ آسآاڈلر لآاللے ٲراآلےر ٲر اہل اآلٲراآ آآآرآ لہلہ فہ، اہمنا اآآل مارکاآ ٲرلآا کرا آہک فوآلر اآلنل مانوللڈلرکے ٲرآآ کرا آہل؛ فاآل ١٢٤٩ آسآاڈلر ٲراآلےر ٲرلآار کرا فاآا۔

آلم آاآن-ٲرلآانل فاڈلر لکآ ؤ مولآ ؤدءشل آمل آاڈلر ٲآہ ٲرلآکک نا۔ کلسآ آمل آمار آنا سہ ٲآآل نلرآاآن کرےآل آمار دسآلآل فوآلر ؤدءشل آآرآول ؤسآاآ دارلل ؤلوملر اہل باآآآاآنا ٲرلآا کرےآلنل۔” (آآاآاآل دارلل ؤلوم ملل بآلے آلے دن، ٲ: ١٩٠-١٩١)

مآؤلانا ساللےآل مآآامآل ملساؤ دارلل ؤلوم دےؤبند ٲرلآار اہل ؤدءشللر دلکے آلرالہل آلسآل کرےآلنل۔ آلنل شالآول آلنلر ؤٲرآآ بآآاآ ؤلآلآ کرار ٲرلے بلنل،

بانی دارالعلوم (آآرآل مولانا قاسم رآلہ اللہ) نلے دارالعلوم کے لے کآھ اصول آآرلر فرمالے آہے، وہ آوڈ (دارالعلوم دلوہند کا مقصد) آآرآل مدوآ کے قلم کے لکآے ہولے نہ صرف دارالعلوم دلوہند؛ بلکہ جامعہ قاسمہ مدرسہ شالآل مرادآاڈلر آل آل آل آل۔ اس آآرل آرامل کا فوآول «سوال قاسم» آلڈوم ملل ملاحظہ فرمالا آآا، (ماللن ص ٢٢٠ و ٢٢١)۔ ان اصول کل بناٲر دارالعلوم دلوہند کے مقاصد مآلن ہولے ہل، ان کل آفلل آلماء آق آلڈاول ملل ملاحظہ فرمالل آآا، (از ص ٦٢١٤)۔ لے مقاصد کس نصب العلن اور مطمح نظر کل ٲرل آشارہ کرتے ہل، لے شلآ آلنڈ آآرآل مولانا محمود آسن رآلہ اللہ سہ درلآل آآا آآا؛ آوڈ دارالعلوم دلوہند کے سب سہ ٲلے مآلم

ইসলাম কাসেম নানুতুবির একনিষ্ঠ শিষ্য এবং দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর 'হযরতুল উস্তায'র (কাসেম নানুতুবির) অন্যতম উদ্দেশ্য ভালোভাবেই অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে মুদাররিস হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পাঁচ বছরের মাথায় ১২৯৭ হিজরিতে 'সামারাতুত তারবীয়ত' নামে একটি কাফেলা তৈরি করেন। বাহ্যত এটির উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে দারুল উলুমের প্রাক্তন ছাত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা। মূলত উদ্দেশ্য ছিল, প্রাক্তন ছাত্রদের মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য একটি মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলা।^[৪৮] শাইখুল হিন্দ অত্যন্ত গোপনীয়তার সহিত জিহাদের দাওয়াত ও ইদাদের কার্যক্রম জারি রাখেন। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও হাকিম আজমল খানসহ অনেকেই শাইখুল হিন্দের জিহাদি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে পৃথক সংগঠন পরিচালনা করলেও সবাই গোপনে গোপনে শাইখুল হিন্দের তত্ত্বাবধানে

اور بانی دارالعلوم کے مزاج شناس اور رازدار شاگرد رشید اور پختہ مغز مرید باصفاتی۔ (اسیرانِ مالٹا، سید محمد میاں، ص ۱۹)

“(দারুল উলুম দেওবন্দের উদ্দেশ্য) দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা (হযরত মাওলানা কাসেম رحمہ) দারুল উলুমের জন্য কিছু মূলনীতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেগুলো স্বয়ং হযরত মুহতারামের কলমে লেখা; যা শুধু দারুল উলুম দেওবন্দে নয়, বরং জমিআ কাসেমিয়া মাদরাসা শাহি মুরাদাবাদেও সংরক্ষিত আছে। ওই গুরুত্বপূর্ণ লেখার ফটো ‘সাওয়ানেহে কাসেমি’তে (২/২২০-২২১) দেখা যেতে পারে। ওই সকল মূলনীতির ভিত্তিতে দারুল উলুম দেওবন্দের উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। এটির বিস্তারিত বিবরণ দেখুন ‘উলামায়ে হক’ (পৃ: ১৪-৬২) গ্রন্থে। এ সকল উদ্দেশ্য কোন আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ইঙ্গিত করে তা শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান رحمہ-কে জিজ্ঞাসা করা হোক; যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের সর্বপ্রথম ছাত্র এবং যিনি দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতার স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত, তাঁর বিশ্বস্ত অনুগত শিষ্য ও সচেতন খাটি মুরিদ ছিলেন।” (আসিরানে মাল্টা, পৃ: ১৯)

মুফতি রশিদ আহমাদ লুথিয়ানবি «دارالعلوم دیوبند کا مقصد تائیس» (দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য) শিরোনামের অধীনে খুব স্পষ্ট ভাষায় বিষয়টির বিবরণ দিয়েছেন। সকলে সাধারণত দারুল উলুম দেওবন্দকে একটি ইলমি প্রতিষ্ঠান মনে করে। আবার অনেকে আরেকটু অগ্রসর হয়ে তাসাউফের কেন্দ্রও মনে করে; এ বিষয়টি উল্লেখ করার পর মুফতি রশিদ আহমাদ লুথিয়ানবি বলেন,

حالا نكہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا سب سے بڑا مقصد انگریز کے خلاف جہاد تھا۔ یہ بات آج کے اکثر علماء کی نظروں سے بھی اوجھل ہے۔ دیوبند کو صرف علم و تحقیق اور درس و تدریس کا مرکز سمجھتے ہیں۔ (خطبات الرشید، ۶/۲۹۳)

“অথচ দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি রাখার সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য ছিলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ। এ বিষয়টি বর্তমানের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামেরও দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। দেওবন্দকে শুধু ইলম ও তাহকিক এবং দরস-তাদরিসের কেন্দ্র মনে করে।” (খুতবাতুর রশিদ, ৬/২৯৩)

অতঃপর মুফতি রশিদ আহমাদ লুথিয়ানবি আরো দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং থানাভবনের খানকার ব্যাপারে বলেছেন, বর্তমানে উলামায়ে কেরামও এটিকে শুধু খানকাই মনে করে। অথচ সেটি জিহাদের কেন্দ্র ছিল। জিহাদের সূচনা সেখান থেকেই হয়েছে।

[৪৮] আসিরানে মাল্টা, পৃ: ২৪-২৮।

কাজ করেছেন। শাইখুল হিন্দের জিহাদি কার্যক্রম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হাজি সাহেব তুরাউজাই সেটির গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য ছিলেন। শাইখুল হিন্দ সেখানে জমিয়তে হিব্বুল্লাহ নামে একটি গোপন সংগঠন তৈরি করেছিলেন। সাধারণ জনতাকে সম্পৃক্ত না করে শুধু নিকটজন, যোগ্য ব্যক্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরই এই গোপন সংগঠনের সদস্য করা হয়েছিলো। কয়েক দশক ধরে গোপনে শাইখুল হিন্দ ও অন্যান্য নেতা এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যান।^[৪৯] এভাবেই চলতে থাকে শাইখুল হিন্দের তত্ত্বাবধানে জিহাদের দাওয়াত ও ইদাদের কাজ। ১৩২৭ হিজরিতে শাইখুল হিন্দ তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্য মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধিকে দেওবন্দে ডেকে এনে দারুল উলুমের প্রাক্তন ছাত্রদের সমন্বয়ে ‘জমিয়তুল আনসার’ নামক এক সংগঠন গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। মূলত ‘সামারাতুত তরবিয়ত’ নামে যে কাফেলা তৈরি করা হয়েছিল, ত্রিশ বছর পর সেটিই ‘জমিয়তুল আনসার’ নামে প্রকাশ হয়। উদ্দেশ্য অভিন্ন, অর্থাৎ মুজাহিদ বাহিনী তৈরি করা।^[৫০] অপরদিকে খিলাফতে উসমানি তখন ইউরোপীয় শক্তিগুলোর কাছে প্রায় অবরুদ্ধ। এটি শাইখুল হিন্দকে আরো অস্থির করে তোলে। তিনি সম্ভাব্য সকল পন্থায় অর্থের জোগান ও খিলাফত রক্ষায় মুসলিমদের সব ধরনের সহযোগিতা ফরয হওয়ার ফাতাওয়া দিয়ে খিলাফতে উসমানি রক্ষায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শাইখুল হিন্দ তখন সমগ্র বিশ্বে জিহাদের দাবানল ছড়িয়ে দিতে বড়ো ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মাওলানা আবদুর রহিম রায়পুরি ও মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরির সঙ্গে ধারাবাহিক গোপন বৈঠক করেন। পরিকল্পনার অংশ ছিল, নুসরত কামনা করে তুরস্ক ও আফগানিস্তানকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদে নামানো হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে মুজাহিদ বাহিনী ইংরেজদের উপর আক্রমণ করবে। তখন ইংরেজরা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হবে। আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তান খিলাফতের অধীনে আসলে খিলাফত শক্তিশালী হবে এবং একে একে ইংরেজ উপনিবেশের অধীনে থাকা সমগ্র মুসলিমবিশ্বকে মুক্ত করা সম্ভব হবে। পরিকল্পনার বিস্তারিত কর্মপন্থা তৈরি করে ফেললেও গোপনীয়তা রক্ষার লক্ষ্যে এটা তাঁরা কাউকে খুলে বলেননি। প্রত্যেক সদস্যকে শুধু তার কাজটুকু বুঝিয়ে দেওয়া হতো। পুরো পরিকল্পনা কখনো কারও সামনে উপস্থাপিত হয়নি। পরিকল্পনা মতে মাওলানা আবুল কালাম আযাদকে হাজি সাহেব তুরাউজাইয়ের নিকট পাঠান এবং তাঁরা গোপনে বৈঠকে মিলিত হন। হাজি সাহেবের নিকট বার্তা

[৪৯] তারিখে আফগানিস্তান, ইসমাইল রাইহান, ১/৩৮৬।

[৫০] আসিরানে মাস্টা, পৃ: ৪০-৪৩, দেওবন্দ আন্দোলন, পৃ: ১৯৯।

[৫১] এটিই সর্বযুগে কুফরি শক্তির কৌশল। একদিকে শাসকদেরকে তাদের দাস বানিয়ে রাখবে আর অপরদিকে একশ্রেণির আলেম ফাতওয়া প্রচার করবে যে, জিহাদের জন্য শাসকের ঘোষণা শর্ত। জামিআতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানুরি টাউনের উস্তাযুল হাদিস মাওলানা ফযল মুহাম্মাদ এ প্রসঙ্গে খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

یہاں پر مسئلہ امیر کی بحث میں انگریز کی رائے معلوم کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ انگریز کا بھی ایک دارالافتاء ہے جہاں سے وہ باقاعدہ فتویٰ جاری کرتا ہے، اور اسلام کے جس حکم میں اپنے لئے خطرہ محسوس کرتا ہے وہ نہایت مضامیٰ سے اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے اور پھر پیسہ اور نشریات کے زور سے اسے عام کرتا ہے، اور اس کے ذریعہ تمام مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اور مسلمانوں کو غیر ضروری مسائل اور دور دراز کی موٹاگانیوں میں الجھائے رکھتا ہے۔ (دعوتِ جہاد۔ فضل محمد، ص ۶۹)

“এখানে আমিদের মাসআলার আলোচনায় ইংরেজদের মতামত জানাও অনর্থক হবে না। কেননা, ইংরেজদেরও একটি দারুল ইফতা আছে যেখান থেকে তারা নিয়মিত ফাতওয়া প্রদান করে থাকে। ইসলামের যে বিধানের ব্যাপারে নিজেদের জন্য তারা আশঙ্কা অনুভব করে, খুব সাধু সেজে সেটির বিরুদ্ধে ফাতওয়া প্রদান করে এবং অর্থ ও প্রচার মাধ্যমের শক্তি ব্যবহার করে তা ব্যাপক করে দেয়। এর দ্বারা সকল মুসলিমের অন্তরে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে, আর মুসলিমদেরকে অপ্রয়োজনীয় মাসআলা এবং দূর্বতী জটিল বিষয়াদিতে ব্যস্ত করে রাখে।” (দাওয়াতে জিহাদ, পৃ: ৬৯)

অতঃপর তিনি ইংরেজ কর্তৃক গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি ও স্যার সাইয়েদ আহমাদ খানকে ব্যবহার করে জিহাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের ফাতওয়া এবং শাইখুল হিন্দদের জিহাদের বিরুদ্ধে তাদের ফাতওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

[৫২] তারিখে আফগানিস্তান, ১/৩৮৭-৩৯০।

শাসককে মুজাহিদদের সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানানো হয় এবং উসমানি খিলাফতের সেনাবাহিনী এগিয়ে আসলে যেন হিন্দুস্তানে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এই গোপন ও স্পর্শকাতর চিঠিটি শাইখুল হিন্দ হিজায় থেকে অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার সহিত একটি রেশমের রুমালে অঙ্কিত করে ফেলেন এবং যথাস্থানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী সময়ে যা রেশমি রুমাল আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যাহোক, শেষপর্যন্ত এই রুমাল ইংরেজদের হাতে পৌঁছে যায় এবং সমস্ত পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। ইংরেজরা তখন ইউরোপীয় পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে তুরস্ক, হিজায়, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং খিলাফত ও জিহাদি চেতনাকে গোড়া থেকে নির্মূল করার পথে অগ্রসর হতে থাকে। জিহাদি চেতনাকে নির্মূল করার ক্ষেত্রে ইংরেজদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে বেরেলবি, আহলে হাদিস ও দরবারি তথাকথিত আলেমরা। ইংরেজবিরোধী জিহাদ ইসলামে হারাম ও হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম মর্মে তারা ফাতাওয়া দিতে থাকে, আর ইংরেজরা নিজ দায়িত্বে তা প্রচার করতে থাকে।^[৫৩] শাইখুল হিন্দ গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘ তিন বছর চার মাস বন্দিজীবন কাটিয়ে হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন। বিশ্বময় পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হিন্দুস্তানি এই জিহাদি তৎপরতা সফল না হলেও বিশ্বময় জিহাদি জয়বা ছড়িয়ে পড়ে। একে একে আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন ভূখণ্ডে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। (যেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সামনে আসছে)। ইসলামের কর্তৃত্ব ও দারুল ইসলামের হাতছাড়া হওয়া অংশ পুনরুদ্ধারে হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবির হাতে তারবিয়ত পাওয়া একনিষ্ঠ শিষ্য শাইখুল হিন্দ জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত আহদে নববি থেকে চলে আসা ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতি তথা দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের পথেই অগ্রসর হয়েছেন। জিহাদের ময়দানে শহিদ হতে না পারা ছিলো তাঁর মৃত্যুশয্যার শেষ আফসোস।^[৫৪] তবে কারা প্রকোষ্ঠে নির্মম নির্যাতনের কারণে জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে যখন তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন এবং ইসলামের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে নতুন করে পরিকল্পনা করার মতো পরিস্থিতিও ছিলো না, তখন তিনি সাময়িকভাবে হিন্দু-মুসলিম মিলে বিভিন্ন মিছিল-সমাবেশ ও বয়কট ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বৃটিশ খেদাও আন্দোলনকে সমর্থন করেন; যেটির সঙ্গে ইসলামের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। সেটির সম্পর্ক ছিলো শুধুই হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করার সঙ্গে। বাস্তবেও তাই

[৫৩] তারিখে আফগানিস্তান, ১/৩৯৬। এই ধারাবাহিকতা আজো সমানহারে বিদ্যমান।

[৫৪] নকশে হযাতি, সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি, ২/৬৮৭।

হয়েছে: ইংরেজরা হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত হয়েছে, কিন্তু ইসলামের কর্তৃত্ব আজ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে কায়েম হয়নি। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের যে মজলিসে ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের ফর্মুলা পেশ করা হয়েছিল, সে মজলিসে শাইখুল হিন্দ উপস্থিতও হতে পারেননি। বরং তাঁর পক্ষ থেকে মাওলানা শাকিবর আহমাদ উসমানি সেটি পাঠ করেছিলেন। আর এর এক সপ্তাহ পরেই ১৩৩৯ হিজরিতে শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি ۞ ইত্তিকাল করেন। বলা যায়, ইসলামের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করতে না পারার অব্যক্ত ব্যথা নিয়েই তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করেন আর উম্মাহর জিম্মায় রেখে যান আরো সুদীর্ঘ ও সুপরিকল্পিত জিহাদি তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব।

□ আফগানিস্তান

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাতাব ۞ এর যুগেই জিহাদের মাধ্যমে আফগানের (তৎকালীন খোরাসান) একাংশ দারুল ইসলাম ও শরিআ আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। প্রখ্যাত বীর মুজাহিদ আহনাফ ইবনে কায়েস ২২ হিজরিতে উত্তর আফগানিস্তানে সর্বপ্রথম ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচু করেন। বলখ থেকে খোরাসানের তাখার পর্যন্ত তিনি খিলাফতের সীমানা বিস্তৃত করেন এবং বিখ্যাত বীর মুজাহিদ সাহসী সাহাবি রিবয়ি ইবনে আমের ۞ এর হাতে ওই অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করেন। অপরদিকে দক্ষিণ আফগানিস্তান আসেম ইবনে আমেরের হাতে বিজিত হয়। উসমান ۞ এর যুগেও আহনাফ ইবনে কায়েসের নেতৃত্বে আফগানের আরো অঞ্চল বিজিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ۞ এর হাতে কাবুল বিজয় লাভ করে। পরবর্তী সময়ে ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম বীর মুজাহিদ কুতাইবা ইবনে মুসলিমের বিজয়াভিযানে আফগানে ইসলামের কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ হলেও সে সকল বিদ্রোহ দমন করে আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ পর্যন্ত আফগান কেন্দ্রীয় খিলাফতের অধীনেই ছিল। কিন্তু খলিফা মামুন তার বিশ্বস্ত সেনাপতি তাহের ইবনে হুসাইনকে খোরাসানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর তাহের ইবনে হুসাইন খোরাসান থেকে সিন্ধ পর্যন্ত শাসন পাকাপোক্ত করে নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করে বসে। এই সালতানাতে তাহেরিয়া আফগানে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল টিকে ছিল। অতঃপর ক্রমান্বয়ে সাফফারি

সালতানাত,^[৫৫] সামানি সালতানাত^[৫৬] গযনি সালতানাত, ঘুরি সালতানাত, খুওয়ারিয়ম সালতানাত, তাতার, কুরত বংশ, তৈমুরি শাসকগোষ্ঠী, মুহাম্মাদ খান শাইবানির উজবেক সালতানাত এবং মোঘল শাসকবৃন্দ আফগান শাসন করে।

মোঘল আমলে আফগানিরা বৈষম্যের শিকার হলেও তারা তা সহ্য করেছিল। কিন্তু মোঘলদের মুলহিদ সম্রাট আকবর কর্তৃক ‘দ্বীনে ইলাহি’ প্রবর্তনের মাধ্যমে যখন তার ‘কুফরে বাওয়াহ’ প্রকাশ পেলো, তখন আফগানের গাইরত সম্পন্ন তাওহিদি কাফেলা তার বিরুদ্ধে ‘খুরুজ’র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বিলম্ব করেনি। সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফি শাইখ আবদুল্লাহ আনসারির সুযোগ্য পুত্র শাইখ বায়েযিদ আনসারি তথা পীর রওশনের নেতৃত্বে মুলহিদ আকবরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ‘খুরুজ’র সূচনা হয়। মুলহিদ আকবরের মতো দাপুটে শাসকের শক্তিশালী শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার ক্ষেত্রে কোনো অজুহাতকে তিনি বাধা মনে করেননি। পৃথক ভূখণ্ড না থাকা, ইমাম না থাকা, পর্যাণ্ড শক্তি না থাকা এবং বিজয় সুনিশ্চিত না হওয়া; কোনো কিছুই তিনি পরোয়া করেননি, বরং মুলহিদ আকবরের শাসনের বিরুদ্ধে ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছেন। শাইখ বায়েযিদ আনসারি বয়ান ও লিখনির মাধ্যমে জনগণকে ‘খুরুজ’র জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি মোঘল সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সরহদ-সীমান্তবর্তী প্রদেশে জিহাদের ঘোষণা দেন। তাঁর খোদাভীরুতা, আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা যেমনিভাবে প্রসিদ্ধ ছিল, তেমনিভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শিতা, অসীম সাহস ও বীরত্বও জনমনে স্বীকৃত ছিল। তাই আফগান জনগণ ধীরে ধীরে তাঁর পতাকাতে একত্রিত হতে থাকে। জালালাবাদে তিনি প্রথম বড়ো ধরনের আক্রমণ করেন এবং তাতে বিজয় লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ৯৮৭ হিজরিতে মুলহিদ আকবরের কাবুল শাসকের বিশাল বাহিনীর কাছে শিনওয়ারের ময়দানে শাইখ বায়েযিদ আনসারির মুজাহিদগণ পরাজিত হন এবং শাইখ বায়েযিদ আনসারি শাহাদাতবরণ করেন। যা পরবর্তী সময়ে ‘রওশনি আন্দোলন’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

শাইখ বায়েযিদ আনসারির শাহাদাতের পর মুজাহিদগণ দমে যাননি, বরং তাঁর পুত্র জালালুদ্দিন আনসারির নেতৃত্বে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন।

[৫৫] ইয়াকুব ইবনে লাইস সাফফারির হাতে সাফফারিদের উত্থান পরবর্তী সময়ে হুবহু আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদদের নেতৃত্বে তালেবানের উত্থানের মতোই ছিল।

[৫৬] সাফফারি সালতানাত বিলুপ্ত করে সামানি সালতানাতের উত্থান কেন্দ্রীয় খিলাফত তথা আব্বাসি খিলাফতের সহযোগিতায় হয়েছে।

জালালুদ্দিন আনসারি কোনো অংশে পিতা থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। তিনি আধুনিক সমরাস্ত্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করে মুজাহিদ বাহিনীকে পুনর্গঠন করেন। এর পর শুরু হয় মুলহিদ আকবরের বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ। মধ্যখানে তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য আত্মগোপনে চলে যান। মূলত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মোঘলদের মতো পরাশক্তিকে খোলা ময়দানে যুদ্ধে ডেকে এনে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি গুহায় বসে সীমিত শক্তি নিয়ে পরাশক্তিকে পরাজিত করার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকেন। মাসের পর মাস চিন্তাভাবনা, গবেষণা ও পরামর্শের পর তিনি সেই ঐতিহাসিক প্রতিরোধ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যা ব্যবহার করে আধুনিক যুগেও মুজাহিদগণ কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, চেকেনিয়া, ইয়েমেন ও সুবিশাল আফ্রিকায় বিশ্ব-পরশক্তিদের নাকানিচুবানি খাইয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ সীমিত শক্তি নিয়ে পরাশক্তিকে পরাজিত করার অন্যতম মাধ্যম গেরিলাযুদ্ধ। শাইখ জালালুদ্দিন আনসারি এই অভিনব সমরনীতিতে অল্পসংখ্যক মুজাহিদকে প্রশিক্ষিত করে চার বছর পর মুলহিদ আকবরের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে পুনরায় জিহাদের ঘোষণা দেন। এবার হিন্দুকুশের প্রতিটি পাহাড় হয়ে উঠে মুলহিদ আকবরের সেনাদের কবরস্থান। অনেক বিখ্যাত সেনাপতি পর্যন্ত পলায়ন করতে বাধ্য হয়। ১০০০ হিজরিতে শাইখ জালালুদ্দিন আনসারি গেরিলাযুদ্ধের পাশাপাশি বড়ো ধরনের হামলার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে বাজৌড় অঞ্চলে উপস্থিত হন; যেখানে মুলহিদ আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি বীরবল তার বাহিনী নিয়ে উপস্থিত ছিল। মুজাহিদগণ তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বীরবরের ৪০ হাজার সেনাকে মুজাহিদগণ হত্যা করতে সক্ষম হয়। এমন শোচনীয় পরাজয়ের পর মোঘল সালতানাতের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কাবুল প্রশাসন ভেঙে পড়ে। মুজাহিদগণ সমগ্র আফগানিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, আলহামদু লিল্লাহ। তবে ১০০৬ হিজরিতে শাইখ জালালুদ্দিন আনসারি বিরুদ্ধে মুলহিদ আকবর আবার শক্তিশালী এক বাহিনী প্রেরণ করে। গমনিতে উভয় সৈন্যদলের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুজাহিদ বাহিনী জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, এমন সময় শাইখ জালালুদ্দিন আনসারি আহত হয়ে বন্দি হয়ে যান এবং মুলহিদ আকবরের সৈন্যরা সাথে সাথে তাঁকে শহিদ করে দেয়। শাইখ জালালুদ্দিন আনসারির শাহাদাতের পর তাঁর উত্তরসূরীরা মুলহিদ আকবরের বিরুদ্ধে জিহাদের ধারাবাহিকতা জারি রেখেছেন। তবে মুলহিদ আকবরের মৃত্যু এবং মুজাহিদে আলফে সানির দীর্ঘ মেহনতের বদৌলত যখন স্বীনে ইলাহির

প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করে এবং শাসন ব্যবস্থায় মৌলিকভাবে শরিআতের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপরদিকে এখন আর সালতানাতের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সমীচীন নয় বলে উলামায়ে কেরাম মতামত প্রদান করেন, তখন থেকে রওশনি আন্দোলন স্তিমিত হতে হতে এক পর্যায়ে এসে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে যেগুলো হয়েছে সেগুলো ছিলো জাতীয়তাবাদী মানসিকতা থেকে স্বাধিকার আন্দোলন। মোঘলদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বাদশাহ আলমগির অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার সহিত সে সকল আন্দোলনকে অনেকটা দমন করতে সক্ষম হন। তারপর সেখানে ইরানের শিয়া সাফাবি শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময়ব্যাপী জিহাদের পর মির ওয়াইসের হাতে হোকি শাসনের সূচনা হয় এবং হোকি শাসক শাহ মাহমুদ ইরানও শাসন করেন। এরপর উত্থান হয় সাফাবি সাম্রাজ্যের গভর্নর হিংস্র নাদির শাহের; যার হাতে হোকি সালতানাতের পতন হয়। আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানে নাদির শাহের হিংস্রতার ইতিহাস খুবই প্রসিদ্ধ। তবে হিংস্রতার সেই দীর্ঘ ইতিহাসের পর আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানের ইসলামি ইতিহাসের আরেকটি উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করার জন্য আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেন বীর মুজাহিদ আহমাদ শাহ আবদালিকে। আহমাদ শাহ আবদালি শুধু আফগানিস্তানের জন্য নয়, বরং হিন্দুস্তানের জন্যও তিনি ছিলেন রহমত স্বরূপ। মারাঠা, শিখ, জাঠ প্রমুখ জাতের মুশরিকদের আত্মসন দমন করে ইসলামকে বিজয়ী রাখতে তিনি বহুবার হিন্দুস্তানে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম বীর মুজাহিদ সুলতান মাহমুদ গযনবির প্রতিচ্ছবি। শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবিও তাঁকে হিন্দুস্তানে অভিযান চালাতে চিঠি প্রদানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর বীরত্বগাঁথা বিজয়াভিযান ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে সংরক্ষিত। আহমাদ শাহ আবদালি নিজে হিন্দুস্তানের শাসক না হয়ে মোঘল সালতানাতকে সুসংহত করে আফগানিস্তানের পথে রওয়ানা হয়ে যান। কিন্তু হতভাগা মোঘলরা সেটির সুফল ধরে রাখতে পারেনি; যেমনটি পেছনে আলোচনা হয়েছে। আহমাদ শাহ আবদালির পর ইসলামের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে আর কোনো বিজেতা আজ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে আগমন করেননি। এই মহান বীর মুজাহিদ ১১৮৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। আহমাদ শাহ আবদালির পর তাঁর প্রথমদিকের উত্তরসূরীরা আফগানিস্তানে ভালোভাবেই শাসন করছিলো। পরবর্তী সময়ে নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিদ্রোহে আফগানিস্তানের অবস্থা জটিল হয়ে উঠে এবং এটির সুযোগে এক পর্যায়ে পাঞ্জাবের শিখ রাজা রঞ্জিত সিংহ আফগানে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর তখনই শুরু হয় সীমান্ত প্রদেশে সাইয়েদ আহমাদ শহিদের জিহাদি তৎপরতা; যেটির আলোচনা পেছনে উল্লেখ হয়েছে।

বালাকোটের ময়দানে সাইয়েদ আহমাদ শহিদের মুজাহিদ বাহিনীর পরাজয়ের পর ইংরেজরা যেমনিভাবে হিন্দুস্তানে তাদের কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করতে থাকে, তেমনিভাবে আফগানিস্তানেও তাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। আফগানিস্তানে তারা একজন আজ্ঞাবহ শাসক খুঁজছিল। আবদালি বংশের এক অপদার্থ, স্বার্থান্বেষী, লোভী ও কাপুরুষ শাহ সুজাকে দিয়ে তাদের আশা পূর্ণ হয়। আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খান (পরবর্তী সময়ে সেও ইংরেজদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়) কর্তৃক জিহাদের ঘোষণার মাধ্যমে ইংরেজরা বারবার বাধার মুখে পড়লেও শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতা, বারেকজাই গোত্র কর্তৃক আফগানকে টুকরো টুকরো করে রাখা এবং শিখদের সহযোগিতাসহ ইংরেজদের কঠিন সামরিক অভিযানের মুখে আফগানিস্তানও হিন্দুস্তানের ভাগ্য বরণ করে। হিন্দুস্তানের ন্যায় আফগানিস্তানেও নামেমাত্র একজনকে তথা শাহ সুজাকে পুতুল শাসক বানিয়ে ইংরেজরা তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু; যেমনটি আমরা সালাফের যুগ থেকে দেখে আসছি, এ পর্বেও মুজাহিদগণ পৃথক ভূখণ্ড না থাকা, সম্মিলিত নেতৃত্ব দেওয়ার মতো একজন আমিরও না থাকা এবং পর্যাপ্ত শক্তি না থাকার বাহানায় হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। ১২৫৬ হিজরি থেকেই প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে জামাআতবদ্ধ হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতা জারি রাখেন। এ সময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন আফগান মোল্লাগণ; যাদেরকে আফগান জনগণ যথেষ্ট সম্মান করতো। তারা প্রতিটি মসজিদের মিম্বার থেকে জিহাদের ফজিলত ও ফরযিয়াত সম্পর্কে অগ্নিবরা বয়ান দিতে থাকেন। উলামায়ে কেরাম আফগানিস্তানের প্রতিটি শহর, নগর, গ্রাম ও বসতিতে ঘুরে ঘুরে জনগণকে জিহাদে উৎসাহিত করতে থাকেন। তবে মুজাহিদদের পৃথক পৃথক দলগুলো বৃদ্ধিতে পারে যে, সম্মিলিত জোট গঠিত হলেই কাজক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব। সে বিবেচনায় কাবুলে তারা গোপনে বৈঠক করে এবং একজন আমির নির্ধারণের পরিবর্তে একটি মজলিসে গুরা গঠন করা হয়। এই মজলিসে গুরার তত্ত্বাবধানে জিহাদের ইদাদ চলতে থাকে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ১২৫৭ হিজরির ১৭ রমজান আফগানিস্তানে নতুন প্রভাত নিয়ে সূর্যোদয় হয়। মুজাহিদগণ কাবুলে অবস্থিত ইংরেজদের শক্তিশালী কেন্দ্র ধ্বংস করতে অগ্রসর হতে থাকে। কাবুলের প্রতিটি মসজিদ থেকে আলজিহাদ আলজিহাদ শ্লোগান ভেসে আসতে থাকে। অত্যন্ত বীরত্বের সহিত মুজাহিদগণ ইংরেজ জেনারেল আলেকজান্ডার বার্নিসের মহলে আক্রমণ করে তাকে বন্দি করে এবং হত্যা করে তার কর্তিত লাশ ও মাথা

কাবুলের প্রধান সড়কের চৌরাস্তায় বুলিয়ে দেয়। আর এতেই আফগানিস্তানে ইংরেজদের কোমর ভেঙে যায়। ইংরেজরা পরবর্তী সময়ে বহু ষড়যন্ত্র করলেও শেষ পর্যন্ত সন্ধি করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে অবস্থার পুনরাবৃত্তি আফগানের মাটিতে বারবার ঘটেছে, এবারও তাই হয়েছে; অর্থাৎ যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির না থাকায় পরস্পর গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে ক্ষমতা আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানের হাতে চলে যায় এবং ইংরেজরা আবারও ষড়যন্ত্রের সুযোগ হাতে পেয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ১২৯৭ হিজরিতে গান্দমাক চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজরা আফগানিস্তানে পরিপূর্ণ উপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তবে এবারও আফগান জাতি হতাশা ও গাফলতের চাদর মুড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েনি, বরং উলামায়ে কেরাম জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা অব্যাহত রেখেছেন এবং বিভিন্ন গোত্র নেতাদের অধীনে মুজাহিদগণ কঠোর প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই পুরো প্রক্রিয়া অত্যন্ত সংগোপনে আজ্জাম দেওয়া হয়। ১২৯৮ হিজরিতে গযনিতে মোল্লা মুশক আলম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা প্রদান করেন। একে একে জিহাদের দাবানল বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং জয়-পরাজয় ও বহু বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত আফগান বীর মুজাহিদগণের হাতে ইংরেজরা পরাজয় বরণ করে। যদিও আফগানিস্তানের শাসনভার আমির দোস্ত মুহাম্মাদ খানের পৌত্র আমির আবদুর রহমান খানের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় কাক্ষিত ফলাফল অর্জন হয়নি এবং ইংরেজরা পরাজিত হয়েও তার থেকে বেশ কিছু স্বার্থ আদায় করে নিতে সক্ষম হয়, তবে এটি বাস্তব যে, কোনো একক আমির না থাকা, ইংরেজদের উপনিবেশের বাইরে পৃথক কোনো ভূখণ্ড না থাকা এবং আধুনিক সমরাস্ত্র ও পর্যাপ্ত সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত একটি জাতির কাছে সমকালীন বিশ্বপরাশক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ন্যাকারজনকভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলো। চূর্ণ হয়েছিল পরাশক্তির দম্ভ-অহংকার। পরবর্তী সময়ে আমির আবদুর রহমান খান এবং তার পুত্র আমির হাবিবুল্লাহ খানের মতো ইংরেজভীরু শাসকদের ইংরেজ তোষামোদ নীতির কারণে আফগান জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষায় বারবারই আঘাত এসেছে। ডুরাভ চুক্তির মতো হীনতার চুক্তিও আমির আবদুর রহমানের হাতেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে শাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ‘খুরুজ’ এবং ইংরেজদের বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় মুজাহিদগণের জিহাদি তৎপরতা সর্বাবস্থায় বহাল ছিল। বিশেষকরে ইয়াগিস্তান অঞ্চল থেকে উমরা খান এবং তার পরে হাজি সাহেব তুরাউজাই কর্তৃক জিহাদের মাধ্যমে ইংরেজদের প্রতিহত করার ইতিহাস খুবই প্রসিদ্ধ। শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দির জিহাদি তৎপরতার সঙ্গে হাজি সাহেব

তুরান্ডজাই ও সীমান্ত অঞ্চলের জিহাদের সম্পৃক্ততা এবং আমির হাবিবুল্লাহ খানের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে হিন্দুস্তানের আলোচনায় দেখেছি।

আমির হাবিবুল্লাহ খান নিহত হওয়ার পর তার পুত্র আমির আমানুল্লাহ খান যদিও বাপ-দাদার অবস্থানের বিপরীতে ইংরেজ শক্তিকে পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করেছে, তবে সেটির পেছনে শরিআ বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে একদিকে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এবং অপরদিকে রুশপ্রীতি বেশি কাজ করেছে। হিংস্র কুবুর কামাল আতাতুর্কের কর্মকাণ্ডে সে প্রভাবিত ছিলো এবং তার আমলেই আফগানে গণতন্ত্রের ছোঁয়া লাগে। ১৩৪০ হিজরিতে লেলিনের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং এর মাধ্যমে আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের রাস্তা উন্মুক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে নাদির শাহ^[৫৭] যদিও শরিআ বিরোধী প্রগতিবাদী নীতি পরিহার করে পরিপূর্ণ শরিআ বাস্তবায়নে সচেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি মডার্নিজমের (যেটির বিষাক্ত বীজ বপন হয়েছিল আমির আমানুল্লাহ'র আমলে) দাবিদারদের ষড়যন্ত্রের মুখে তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেননি। ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র চার বছরের মাথায় ১৩৫৩ হিজরিতে এক অনুষ্ঠানে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নাদির শাহের পর তার ছেলে যাহের শাহের মতো অনভিজ্ঞ শাসক ক্ষমতায় বসার কারণে রুশদের জন্য সহযোগিতার আড়ালে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠা আরো সহজ হয়ে যায়। বিশেষকরে তার প্রধানমন্ত্রী দাউদ খানের ছত্রছায়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনে কমিউনিজম ও গণতন্ত্রের কালো ছায়া গভীর থেকে গভীর হতে থাকে। এক পর্যায়ে দাউদ খান যাহের শাহকে সরিয়ে আফগানিস্তানের মসনদে আসীন হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে আফগানিস্তান তার অবস্থান হারিয়ে পরিপূর্ণভাবে রুশ রুকে ঢুকে পড়ে। গণতান্ত্রিক প্রতারকদের সাধারণ রীতি অনুযায়ী দাউদ খানও ক্ষমতা দখল করে জনসাধারণকে বোকা বানানোর জন্য ঘোষণা দেয়, 'এখন থেকে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল "রিপাবলিক শাসনপদ্ধতি" প্রবর্তন করা হবে।' পরবর্তী সময়ে 'সাওর' বিপ্লবের মাধ্যমে দাউদ খানকে হত্যা করে কমিউনিজমের পতাকাবাহী নুর মুহাম্মাদ তারাকি, বাবরাক কারমাল ও হাফিযুল্লাহ আমিনের সরকার গঠন হয়। যথারীতি জনগণকে প্রতারিত করতে তারাকি ঘোষণা দেয়, 'ইসলাম হবে দেশের আদর্শিক ভিত্তি'। কিন্তু এর পরই হিংস্র তারাকি তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে। রুশ সহযোগিতায় শুরু হয় আলিম-উলামা, মুজাহিদ ও জনগণের উপর অমানবিক নির্যাতন। তারাকিকে

[৫৭] আকবিরে দেওবন্দের সঙ্গে যার শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো এবং ফকিহুন নফস রশিদ আহমাদ গান্ধুহির হাতে যিনি বাইআতবদ্ধ ছিলেন।

হত্যা করে হাফিযুল্লাহ আমিন ক্ষমতাসীন হয়ে যখন আমেরিকার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছিল, তখনই সোভিয়েত বাহিনী কোনো রাখঢাক ছাড়াই আগ্রাসনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৪০০ হিজরিতে সোভিয়েত রাশিয়া বিশাল সেনাবহর নিয়ে আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে এবং হাফিযুল্লাহ আমিনকে সরিয়ে তাদের কাঠপুতুল বাবরাক কারমালকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করে আফগানিস্তানে সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে। সূচনা হয় একদিকে কমিউনিজম প্রচার-প্রসারের, আর অপরদিকে নির্যাতনের বিতীষিকাময় দৃশ্যের। গণহত্যা ও পাশবিকতার লোমহর্ষক কর্মকাণ্ডে যেন পৃথিবী থরথর করে কেঁপে উঠত। হিংস্র রুশ ভল্লুকরা এমনভাবে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতো, যেন কেউ মোকাবেলার সাহসটুকু পর্যন্ত করতে না পারে। রাসায়নিক অস্ত্র ও নাপাম বোমা ব্যবহার করে জনপদগুলো ঝলসে দিতে লাগলো। বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় মসজিদ-মাদরাসাগুলো। মুজাহিদদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে গ্রেফতার করে চলন্ত ট্রাকের নিচে ফেলে অথবা পেট্রোল টেলে আগুনে পুড়িয়ে বা গর্তে ফেলে উপর দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে শহিদ করে দেওয়া হতো। এতেই শেষ নয়, বরং এই অমানবিক ঘটনার দায় মুজাহিদদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হতো। আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার নিষ্ঠুরতা কোনো অংশে বাগদাদে তাতারিদের নিষ্ঠুরতার চেয়ে কম ছিলো না।

কিন্তু পরিস্থিতি যতো জটিল থেকে জটিলতর হোক না কেনো, কুফরি শক্তিকে প্রতিহত করা থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে এবারও আহদে নববি থেকে চলে আসা ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতির ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের পথেই কাফেলা অগ্রসর হয়েছে। কর্তৃত্বসম্পন্ন ইমাম না থাকা, পৃথক ভূখণ্ড না থাকা, তৎকালীন অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়ার মোকাবেলায় পর্যাপ্ত শক্তি না থাকা এবং প্রচুর পরিমাণে রক্তপাতের শুধু আশঙ্কা নয়, বরং নিশ্চিত বাস্তবতা; কুফরি শক্তির ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত কাপুরুষদের বানানো কোনো বাহানাই রুশ ভল্লুকদের প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। যাহের শাহের আমল থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে জিহাদের প্রস্তুতি চলতে থাকে। বিশেষকরে রুশদের সরাসরি আগ্রাসনের পর থেকেই উলামায়ে কেরাম বয়ান ও ফাতওয়ার মাধ্যমে উম্মাহকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। অনেকে আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থান করে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। নুসরত আসতে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। বিশেষকরে আরব মুজাহিদগণের বিশাল কাফেলা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আফগানিস্তানে

চলে আসেন। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে যে সকল জিহাদি কাফেলা জিহাদের প্রস্তুতি ও বিক্ষিপ্তভাবে হামলা জারি রেখেছিল, সেগুলোর অন্যতম হলো, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস খালিসের হিযবে ইসলামি (খালিস গ্রুপ), মাওলানা মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদির হরকতে ইনকিলাবে ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হিযবে ইসলামি, প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রব্বানির জমিয়তে ইসলামি, পীর সাইয়েদ আলি গিলানির ইসলামি মাহায ইত্যাদি। এছাড়াও যে সকল ব্যক্তিত্ব নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মাওলানা জালালুদ্দিন হক্কানি, মাওলানা আরসালান খান রহমানি, মাওলানা নিয়ামুদ্দিন হক্কানি, মাওলানা নাসরুল্লাহ মানসুর, প্রফেসর সিবগাতুল্লা মুজাদ্দিদি, আহমাদ শাহ মাসউদ, আবদুর রব রাসুল সাইয়াফ প্রমুখ।^[৫৭] রাশিয়ার লাল ভল্লুকদের হিংস্রতার তোয়াক্কা না করে প্রত্যেকে আপন আপন অবস্থান থেকে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু জিহাদি কাফেলার বিক্ষিপ্ততায় ততোটা সুফল পরিলক্ষিত হচ্ছিলো না। এক পর্যায়ে মুজাহিদ নেতাগণ ঐক্যের প্রয়োজন অনুভব করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৪০১ হিজরিতে জিহাদি কাফেলাগুলোর ঐক্য সংঘটিত হয়। এর পরপরই রুশবিরোধী প্রতিরোধমূলক জিহাদ শক্তিশালী হয়ে উঠে। সোভিয়েত রাশিয়ার হিংস্র লাল ভল্লুকদের মোকাবেলায় পুরো আফগানজুড়ে বেজে উঠে দীর্ঘমেয়াদি জিহাদের দামামা। জয়-পরাজয়ের মাঝে চলতে থাকে কাফেলার পথচলা। সোভিয়েত রাশিয়ার হাজারো ষড়যন্ত্র, হিংস্রতা ও পূর্ণ শক্তির ব্যবহার দমাতে পারেনি জিহাদি কাফেলাকে। বিশেষকরে গেরিলাযুদ্ধ রুশ বাহিনীকে অস্থির করে তোলে। অতঃপর ১৪০৯ হিজরিতে আফগানিস্তানের ইতিহাসে রচিত হয় সেই ঐতিহাসিক দিন যা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। রাশিয়ান ভল্লুকদের শেষ সেনাটিও আফগানিস্তান ছেড়ে আমু দরিয়ার ওপারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। হাজারো-লাখে প্রাণের কুরবানি, বহু জনপদ ও সম্পদ-সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি, হাজারো পরিবারের বাস্তুচ্যুতি এবং অগণিত মসজিদ-মাদরাসা বিসর্জনের বিনিময়ে অর্জিত হয় এই ঐতিহাসিক বিজয়। তবে রুশ বাহিনী পলায়ন করলেও তখনও থেকে যায় তাদের কাঠপুতুল শাসক হিংস্র নাজিবুল্লাহ। তাকে পরাজয় করতে আরো কয়েক বছর জিহাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। অবশেষে ১৪১২ হিজরিতে কাবুল বিজয়ের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জিত হয়। এই ঐতিহাসিক জিহাদে ১৪১০ হিজরিতে শাহাদাতবরণ করেন নেতৃস্থানীয় ঐতিহাসিক দুই আরব মুজাহিদ; বিশ্বব্যাপী ইসলামি জিহাদের

[৫৮] তবে এদের অনেকে; বিশেষকরে আলেক্সেণি ব্যতীত অন্যান্যরা যদিও জিহাদ শিরোনামে রুশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, কিন্তু ই'লায়ে কালিমা তুল্লাহের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ও ক্ষমতার লড়াই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; যেমনটি পরবর্তী সময়ে স্পষ্ট হয়েছে।

প্রাণপুরুষ শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম এবং প্রত্যেক আরব মুজাহিদের প্রাণপ্রিয় নেতা ও শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শাইখ তামিম আদনানি। আফগান জিহাদের ইতিহাসে এই দুই বীর মুজাহিদের নাম সোনালি অক্ষরে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

তবে জিহাদের মূল লক্ষ্য ‘ই’লায়ে কালিমা তুল্লাহ’ তখনও অর্জিত হয়নি। যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ও পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির না থাকায় আবারও সেই পুরানো অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শুরু হয় পারস্পরিক যুদ্ধ; যা এক পর্যায়ে গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। বিশেষকরে হেকমতিয়ারের হিযবে ইসলামি এবং রব্বানির জমিয়তে ইসলামির মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘাত শুরু হয়ে যায়। প্রফেসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদিকে দুই মাসের জন্য অস্থায়ী সরকারপ্রধান এবং দুই মাস পর রব্বানিকে প্রেসিডেন্ট ও হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেও এই সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়নি। মাওলানা জালালুদ্দিন হক্কানি এই বিশৃঙ্খলা রোধে বহু দৌড়ঝাঁপ করে দলগুলোর মাঝে পারস্পরিক কিছুটা সমঝোতা করাতে পারলেও তা স্থায়ী হয়নি। এর একটি মৌলিক কারণ ছিল, মাওলানা ইউনুস খালিস, মাওলানা জালালুদ্দিন হক্কানি প্রমুখ নেতাদের; বিশেষকরে নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরামের ‘ই’লায়ে কালিমা তুল্লাহ’ উদ্দেশ্য থাকলেও সোভিয়েত রাশিয়া বিরোধী সকল নেতা ইখলাসের সহিত ‘ই’লায়ে কালিমা তুল্লাহ’র জন্য জিহাদ করেনি। এদের অনেকে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা লালন করতো এবং ক্ষমতার জন্য লড়াই করেছে। রব্বানি ও হেকমতিয়ার জাতীয় নেতারা সাইয়েদ জামালুদ্দিন আফগানি ও মাওলানা মওদুদির মডারেট আদর্শে প্রভাবিত ছিল, আর আহমাদ শাহ মাসউদের মতো লোকগুলো শুধুই ক্ষমতার জন্য লড়াই করেছে। তাই ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। ক্ষমতার জন্য আফগানকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় এবং ক্ষমতাধীন অঞ্চলে শরিআ বাস্তবায়নের কোনো তোয়াক্কা করা হয়নি। নয় ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় আফগানিস্তান। এই নয় ভাগের মধ্যে শুধু খোস্ত ও এর নিকটবর্তী এলাকায় মাওলানা জালালুদ্দিন হক্কানির অধীনে এবং কুনার প্রদেশে মুজাহিদদের তত্ত্বাবধানে পুরোপুরি ইসলামি শরিআ অনুযায়ী শাসনকাজ পরিচালনা করা হয়। এই কুনার প্রদেশ শুরু থেকেই মুজাহিদদের দখলে ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া তাদের ১২ বছরের আগ্রাসনযুগে কখনো এ এলাকায় পা জমাতে পারেনি। এখানকার আহলে হাদিসের একজন আলিম মাওলানা জামিলুর রহমানকে এই অঞ্চলের জিহাদের প্রবক্তা বলা হয়ে থাকে। যাহোক, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পুরো আফগানিস্তানে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। এমন কোনো হীন কর্ম নেই যা দৈনন্দিন সংঘটিত হতো না। খুন,

জবরদখল, লুণ্ঠন, অপহরণ, ধর্ষণ, বাণিজ্যিক কাফেলা ও ব্যবসায়ীদের থেকে অন্যায়ভাবে ট্যাক্স আদায় এবং মাদক কারবারিসহ সব ধরনের অপরাধ সর্বত্র বিরাজ করছিলো। মোটকথা, মুসলিমদের এই গৌরবময় ভূমি হিংস্র পশুদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু হতাশা আর দুর্ভাগ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের একপ্রান্তে হঠাৎ করে এক চিলতে আলোর দেখা মেলে। যে আলো এক সময় পুরো আফগানকে আলোকিত করে দেয় এবং বিশ্ব কুফরি শক্তির সুখনিদ্রা হারাম করে দেয়। একজন সাধারণ মোল্লা; যিনি না ছিলেন কোনো অঞ্চলের আমির বা কোনো দলের নেতা, ছিলো না হাতে কোনো জনবল বা অস্ত্রের বাহার। কিন্তু অন্তরে ছিলো মুসলিম উম্মাহর দরদ ও 'ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ'র অদম্য স্পৃহা। যে একটি নাম একটি ইতিহাস হয়ে উন্মোচিত হয়; মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ ও তাঁর হাতে গড়ে উঠা বিশ্বকুফরি জোটের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ইতিহাসের মোড় আমূল পালটে দেওয়া 'তালেবান' শক্তি। মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ ১৮ বছর বয়সেই সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। মাওলানা ইউনুস খালিসের হিযবে ইসলামি এবং মৌলভি মুহাম্মাদ নবি মুহাম্মাদির হরকতে ইনকিলাবে ইসলামির অধীনে আঞ্চলিক কমান্ডার হিসেবে বীরত্বের সহিত জিহাদ পরিচালনা করেছেন। নাজিব সরকারের বিরুদ্ধেও তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ তাঁকে খুবই ব্যথিত করে। ১৪১৫ হিজরির শীতকালীন একটি ঘটনা তাঁর জীবন এবং পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানের ইতিহাস পরিবর্তন করে দেয়। তিনি জানতে পারেন, এক অত্যাচারী কমান্ডার দুই কুমারী বালিকাকে অপহরণ করে তাদের মাথা মুণ্ডিয়ে দেয় এবং পুরুষের পোশাক পরিয়ে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে পালাক্রমে বারবার তাদের ধর্ষণ করা হয়। হৃদয়বিদারক এ সংবাদ মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। এ ধরনের আরো ঘটনা তাঁকে বিচলিত করে তোলে। গুরু হয় অস্ত্র হাতে 'নাহি আনিল মুনকার'র পথে অগ্রসর হওয়া। মাত্র ৩০ জনের মতো মাদরাসা ছাত্রকে একত্রিত করে শুধু ১৬টি রাইফেল নিয়ে ওই কমান্ডারের শক্তিশালী 'পাশমুন' ফাঁড়িতে হামলা করে বসেন। আল্লাহর রহমতে তাঁরা হামলায় সফল হয়ে ওই তরুণীদ্বয়কে উদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং কমান্ডারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়ে পুরো ফাঁড়ি দখল করে নেন। কান্দাহারের উপকণ্ঠস্থ 'পাশমুন' ফাঁড়ি দখলই ছিলো তাঁদের দীর্ঘ জিহাদি সফরের প্রথম মাইলস্টোন।

কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনো ইমাম নেই, পৃথক কোনো ভূখণ্ড নেই, এত বিশাল

অঞ্চলের বিভিন্নমুখী শক্তির বিপরীতে ‘ইস্তিতাআত’ শূন্যের কোটায় বললেও ভুল হবে না, আর বাহ্যত বিজয়ের নিশ্চয়তাই বা কোথায়! তবে কোনো বাহানা মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ‘সঙ্গে হিসার’র আশপাশের মাদরাসার ছাত্র তথা তালেবানকে জড়ো করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। তাখতাপুলের যুদ্ধে কমান্ডার মানসুর ও গুল আগার বাহিনীকে পরাজিত করে কান্দাহার অভিমুখে এগিয়ে যান। এ সময়ে দক্ষিণ আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে দলে দলে মাদরাসার ছাত্ররা তাঁদের সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আসতে থাকে। মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে তালেবানরা আফগানিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কান্দাহার দখল করে নেয়। কান্দাহার থেকে স্পিনবুলদাক পর্যন্ত এক বিশাল অঞ্চল তাদের কর্তৃত্বে এসে পড়ে। ১৪১৫ হিজরিতে কান্দাহার বিজয় করেই তারা শরিআ আদালত প্রতিষ্ঠা করে শরিআ শাসনের ঘোষণা দিয়ে দেয়। ১৪১৫ হিজরির রমজান মাসে তারা গযনির দ্বারে করাঘাত করে। হেকমতিয়ারের হিযবে ইসলামির প্রতিরোধের মুখে পড়লেও শেষ পর্যন্ত গযনি তালেবানের দখলে চলে আসে। একে একে তারা ওয়ারদাক, ময়দান, লোগার ও চার আসিয়াব বিজয় করতে সক্ষম হয়। কান্দাহার বিজয়ের পর যেহেতু রক্বানি তার প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে তালেবানের জিহাদি তৎপরতাকে সমর্থন করেছিল এবং মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের হাতে বাইআত করেছিল, তাই তালেবান চার আসিয়াব বিজয়ের পর সাময়িক কাবুল দখল করা এড়িয়ে গিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে মনোনিবেশ করে এবং হেরাত বিজয় করে নেয়। রক্বানি কাবুলের ক্ষমতা তালিবানের হাতে হস্তান্তর না করায় হেরাত বিজয়ের পর তালেবান কাবুল অবরোধ অব্যাহত রাখে। তখন পর্যন্ত আফগানিস্তানের ৩০টি প্রদেশের ১৫টি তালেবানের দখলে চলে আসে। এ পর্যায়ে এসে মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নিষ্ঠাবান আলিম ও মুজাহিদ সঙ্গীরা জিহাদি তৎপরতা আরো শক্তিশালী করা এবং পুরো আফগানিস্তানকে শরিআ আইনের অধীনে আনার লক্ষ্যে মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদকে শুধু জিহাদের আমিরের পরিবর্তে আমিরুল মুমিনিন হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কান্দাহারে সমবেত হয় শত শত উলামায়ে কেরাম। কোনো ভোটাভুটি নয়, কোনো তন্ত্র-মন্ত্র নয়, কোনো মতবাদ থেকে ধার করা কোনো পদ্ধতি নয়, বরং খুলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে চলে আসা ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতি ‘আহলুল হাল্লি ওয়ালআকদ’ তথা নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরামের বাইআতের মাধ্যমে আমিরুল মুমিনিন নিযুক্ত করা হয়। ১৪১৬ হিজরির ১০ যিলকা‘দা ছিলো আফগানিস্তানের ইতিহাসের এক সোনালি দিন। মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদের হাতে বাইআত প্রদান করে তাঁকে আমিরুল মুমিনিন হিসেবে বরণ করে নেওয়া

হয়। উসমানি খিলাফতের পক্ষ হতে আহমাদ শাহ আবদালিকে দেওয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামা হিসেবে প্রসিদ্ধ একটি জুব্বা কান্দাহারের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ছিল। আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ যখন জুব্বাটি পরিধান করে জনসম্মুখে আসেন, তখন হাজার হাজার আলেমসহ কাবায়েলি নেতারা একযোগে আমিরুল মুমিনিন আমিরুল মুমিনিন শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলেন।

এই ঘটনায় বিশ্বসন্ত্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকার ঘুম হারাম হয়ে যায়। দীর্ঘ পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের ফলে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের মাধ্যমে যে খিলাফত-ইসলামি শাসন ব্যবস্থার কবর রচনা করতে তারা সক্ষম হয়েছিল, আবারও সেই ইসলামি শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের পথে মুসলিম উম্মাহ; ক্রুসেডারদের জন্য এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। শুরু হয় তাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া। তবে এসব কিছুর তোয়াক্কা না করে তালেবান সামনে অগ্রসর হতে থাকে। ১৪১৭ হিজরিতে একে একে জালালাবাদ, নঙ্গারহার, কুনার ও পাগমান বিজয় হয়। জালালাবাদেই তালেবান নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় পঞ্চদশ শতকের মুজাদ্দিদ, বিশ্বময় জিহাদের কারিগর, ক্রুসেডার আমেরিকার আতঙ্ক, বিশ্বখ্যাত আরব বীর মুজাহিদ শাইখের সঙ্গে।^[৫৯] তারা শাইখকে সশ্রদ্ধভাবে বরণ করেন এবং সর্বাত্মক নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে আমিরুল মুমিনিনও শাইখকে কান্দাহারে আমন্ত্রণ জানান এবং আফগানিস্তানে অবস্থান করার জোর তগিদ জানিয়ে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। শাইখ নঙ্গারহারে ফিরে এসে নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে আমিরুল মুমিনিনকে সে বিষয়ে অবগত করলে তিনি শাইখকে কান্দাহার চলে আসতে বলেন। শাইখ এই প্রস্তাবে খুবই আনন্দিত হন এবং কান্দাহারে স্থানান্তরিত হয়ে যান।^[৬০] যাহোক, জালালাবাদ, নঙ্গারহার, কুনার ও পাগমান বিজয়ের পর তালেবান মুজাহিদগণ কাবুল বিজয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন এবং কাবুল বিজয় করে নেন। রব্বানি ও আহমাদ শাহ মাসউদ কাবুল থেকে পলায়ন করে এবং হাজার হাজার মানুষের হস্তারক নাজিবুল্লাহ ও তার ভাইকে হত্যা করে আরিয়ানা ঝুয়ারে লাশ বুলিয়ে দেওয়া হয়। কাবুল বিজয়ের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে ইসলামি শরিআ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাবুল বিজয় হলেও আমিরুল মুমিনিন কান্দাহারেই থেকে যান এবং সেখান থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা

[৫৯] শাইখ ইতোপূর্বে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে বীরত্বের সহিত অংশগ্রহণ করেছিলেন। গৃহযুদ্ধের সময় শাইখ আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যান এবং পুনরায় আফগানিস্তানে ফিরে আসেন।

[৬০] আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদের মুখপাত্র আবদুল হাই মুতময়িন কর্তৃক রচিত গ্রন্থ 'আলমোল্লা মুহাম্মাদ উমর', পৃ: ১৬৮।

করতে থাকেন। আমেরিকার বহুমুখী ষড়যন্ত্র, অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দল; বিশেষকরে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের প্রতিরোধকে প্রতিহত করেই সামনে অগ্রসর হতে থাকে তালেবান মুজাহিদগণ। একে একে অন্যান্য অঞ্চল তালেবানের অধীনে আসতে থাকে। শরিআর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় না দিয়েই আমিরুল মুমিনিন শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা যখন তাদের আতঙ্ক আরব বীর মুজাহিদ শাইখকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে, তখন আমিরুল মুমিনিন ১৪২০ হিজরির এক ভাষণে স্পষ্ট করেন যে, 'শাইখকে সমর্পণ করা ইসলামি বিধান লঙ্ঘনের নামান্তর। তিনি একজন মুসলমান, বিশিষ্ট মুজাহিদ এবং আমাদের সম্মানিত অতিথি। যদি অর্ধেক আফগানিস্তানও ধ্বংস হয়ে যায়, তবুও তাঁকে কারও হাতে তুলে দেওয়া হবে না'।^[৬১] ইতিহাদে উলামায়ে আফগানিস্তানের প্রধান এই মর্মে ফাতাওয়া প্রদান করেন এবং আমিরুল মুমিনিনও তা সমর্থন করেন যে, শাইখকে হস্তান্তর করা কোনোভাবেই জায়েজ হবে না। তারা একের পর এক বাহানা তাল্লাশ করে আক্রমণের পথ খুঁজতেই থাকবে। শাইখকে হস্তান্তর করলেও তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ বন্ধ হবে না।^[৬২] বরং আমিরুল মুমিনিন শাইখকে স্বেচ্ছায় আফগানিস্তান ত্যাগ করার কথা বলতেও সম্মত ছিলেন না।^[৬৩] তেমনিভাবে উলামায়ে কেরামের ফাতওয়ার ভিত্তিতে ১৪২১ হিজরিতে বামিয়ানের ২ হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তি ধূলিসাৎ করে দেন এবং কারযাবির মতো মডারেট মুফতিকে শরিয়তে ইসলামিয়ার অতদ্র প্রহরী আমিরুল মুমিনিন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেন। জাপানসহ কয়েকটি দেশ তালেবানকে মূর্তি না ভাঙার শর্তে মোটা অঙ্কের সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব দিলে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর সুলতান মাহমুদ গয়নবির ভাষায় বলেন, 'আমরা মূর্তি বিক্রেতা নই; বরং মূর্তির সংহারক হওয়াই বেশি পছন্দ করি।' ইসলামের প্রশ্নে কোনো সমঝোতাই আমিরুল মুমিনিন ও তালেবানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ১৪২১ হিজরিতেই পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পেশাওয়ারে 'আলামি দেওবন্দ কনফারেন্স'র আয়োজন করলে সেখানে অংশগ্রহণকারী তালেবান প্রতিনিধি আমিরুল মুমিনিনের এই বাণী পাঠ করে শোনান, 'বিশ্বশক্তি আমাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হতে চলছে; কিন্তু ইসলামের প্রশ্নে আমরা কোনো ধরনের সমঝোতায় যেতে রাজি নই।'^[৬৪] আমিরুল মুমিনিন ও তালেবান নেতাদের এ সকল অবস্থান ও বক্তব্য সবই ছিলো নিউইয়র্ক ও

[৬১] তারিখে আফগানিস্তান, ২/২৭৯।

[৬২] শাযারাত, পৃ: ২২৮-২৩০।

[৬৩] আলমোল্লা মুহাম্মাদ উমর, পৃ: ২২৯।

[৬৪] তারিখে আফগানিস্তান, ২/২৯৮-২৯৯।

ওয়াশিংটন জিহাদের পূর্বে। এ থেকে স্পষ্ট যে, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন যুদ্ধ সংঘটিত না হলেও বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা আফগানিস্তানে নিশ্চিতভাবে আগ্রাসন চালাতো। ইতোপূর্বে ১৪১৮ হিজরির দিকেও আমেরিকা একবার আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছিল এবং ১৪২০ হিজরিতে মার্কিন জয়েন্ট অব চিফ স্টাফ জেনারেল হেনরি শেলটন এক সাক্ষাৎকারে বলে, 'আমেরিকা দ্রুত আফগানিস্তানে জবাবি হামলা চালাতে পারে।'^[৬৫]

আরব বীর মুজাহিদ শাইখের নেতৃত্বে ইতোপূর্বে নাইরোবি ও দারুস সালাম ইত্যাদির জিহাদে পর্যুদস্ত বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা জানতো না যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরো একটি শোচনীয় পরাজয়ের দিন। ১৪২২ হিজরির ২৩ জুমাদাল আখেরা মঙ্গলবার; ইসলামি ইতিহাসের একটি বরকতময় দিন। সূর্য উদিত হয়ে অপেক্ষা করছে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন জিহাদের জন্য। আমেরিকার স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৪৮ মিনিটে একটি যাত্রীবাহী বিমান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারের দক্ষিণ টাওয়ারে গিয়ে আছড়ে পড়ে। ৯টা ৩ মিনিটে আরেকটি বিমান প্রচণ্ড গতিতে উত্তর টাওয়ারে ঢুকে পড়ে। দেখতে দেখতেই পাহাড়সদৃশ ১১০ তলা বিন্ডিং ভূমিশ্যা নেয়। ৯টা ৩৮ মিনিটে আরেকটি বিমান আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্র পেন্টাগনের সদর দপ্তরে আছড়ে পড়ে। ২৯ একর জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হেডকোয়ার্টারের পাঁচটি তলা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এখানে নিহতের বেশিরভাগই ছিলো সেনাবাহিনীর সদস্য। আলহামদু লিল্লাহ। ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এই হামলা বিশ্বসন্ত্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকার মোড়লগিরির মূলে কুঠারাঘাত করে। কাপুরুষ বুশ ভয়ে দিনভর আত্মগোপনে থাকে। এটিই ছিলো আমেরিকার পতনের শুরু এবং ইসলামি ইতিহাসের নতুন এক সোনালি অধ্যায়ের সূচনা। এই জিহাদে শাইখের বিজয়ের সবচেয়ে বড়ো দিক হলো, এর মাধ্যমে শাইখ পুরো বিশ্বকে কুফর ও ইমান; দু-ভাগে বিভক্তির বিষয়টি স্পষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। এক ভাগে কাফের ও মুনাফিকের দল এবং অপর ভাগে খাঁটি মুমিনদের জামাআহ। এটি ছিলো বদরের প্রতিচ্ছবি আরেকটি "يوم الفرقان"। এর মাধ্যমে হয়তো বাস্তবায়িত হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী;

حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ، فُسْطَاطِ إِيْمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ، وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيْمَانَ فِيهِ

অবশেষে সব মানুষ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি হবে ইমানের

[৬৫] বিস্তারিত দেখুন: তারিখে আফগানিস্তান, ২/৩৩৪-৩৩৫।

শিবির, যেখানে নিফাক থাকবে না। আর একটি হবে নিফাকের শিবির, যেখানে ইমান থাকবে না।^[৬৬]

যাহোক, ওই হামলার পরপরই হিংস্র বুশ সীমান্তের বাইরে হলেও শত্রুর উপর হামলা চালানোর ঘোষণা দেয় এবং এটিকে ক্রুসেড যুদ্ধ আখ্যা দেয়। বুশ তালেবানকে হুমকি দেয়, এই মুহূর্তে আরব বীর মুজাহিদ শাইখকে তাদের হাতে তুলে না দিলে আফগানিস্তানকে একেবারে তছনছ করে ছাড়বে। আমেরিকার এক ফোনেই পাকিস্তানের গাদ্দার মুরতাদ প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফ মিত্রবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। অপরদিকে আমিরুল মুমিনিনের সঙ্গে শাইখকে হস্তান্তরের বিষয়ে কথা বলার জন্য পাকিস্তানের সরকারের পক্ষ হতে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয় যাদের মাঝে কয়েকজন উঁচু মাপের আলেমও ছিলেন। আমিরুল মুমিনি প্রতিনিধিদলের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'তিনি কোনো মূল্যেই তাঁদের মেহমান ও মুসলিম ভাইকে শত্রুর হাতে তুলে দেবেন না। এজন্য যদি তাঁর হুকুমত বা তাঁর নিজের প্রাণ চলে যায়, তাতেও তিনি কোনো পরোয়া করবেন না।'^[৬৭] আমিরুল মুমিনি প্রতিনিধিদলের উলামায়ে কেরামের নিকট জানতে চেয়েছেন যে, শাইখকে হস্তান্তর করার ফাতাওয়া তাঁরা দিতে পারবেন? সকলে বলেছিলেন, না! এই ফাতাওয়া দেওয়া সম্ভব নয়।^[৬৮] নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন জিহাদের তিন দিনের মাথায় জুমাদাল আখেরার ২৬ তারিখে প্রকাশিত আমিরুল মুমিনিনের স্পষ্ট ভাষ্য ছিল, 'বিশ্বের কুফরি শক্তি ইসলামি শাসনব্যবস্থা মিটিয়ে দিতে জোট বেঁধেছে। অতএব, আফগান মুজাহিদ ও জনতাকে প্রাণের নজরানা দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। নামাজের পর যেন কনুতে নাজিল পাঠের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।' এর আট দিনের মাথায় আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাকে কিংবা শাইখকে হত্যার মাধ্যমে আমেরিকা চরম বিপর্যয় থেকে বেরোতে পারবে না। তারা সত্যিকার অর্থে সন্ত্রাস দমন করতে চাইলে আপন সেনাবাহিনী আরব উপদ্বীপ থেকে যেন সরিয়ে নেয়। ফিলিস্তিন প্রশ্নে যেন পক্ষপাতিত্ব ছেড়ে দেয়। ইসলামি জীবনধারা ও বিধানে হস্তক্ষেপ করা থেকে নিজেদের যেন গুটিয়ে নেয়।'^[৬৯] পরবর্তী সময়ে রজবের ১৬ তারিখে আমিরুল মুমিনি আরেকটি ভাষণে পুরো বিশ্বের মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ

[৬৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪২৪২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ৬১৬৮

[৬৭] তারিখে আফগানিস্তান, ২/৩০৩।

[৬৮] উলামায়ে কেরামের সঙ্গে আমিরুল মুমিনিনের কথোপকথনের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন: আলমোম্বা মুহাম্মাদ উমর, পৃ: ২৩১-২৩২।

[৬৯] তারিখে আফগানিস্তান, ২/৩০৩-৩০৪।

করেন এবং ক্রুসেডারদের সঙ্গে ত্যাগ করতে বলেন। আফগান জাতিকে উদ্দেশ্য করে সর্বশেষ ভাষণে আমিরুল মুমিনিনের শুরুর কথাগুলো ছিল, ‘আপনারা ভালো করেই জানেন, ইংরেজরা আফগানিস্তানে আক্রমণ করেছিল; তখন কি এখানে আরব বীর মুজাহিদ শাইখ ছিলেন? সোভিয়েত রাশিয়া হামলা করেছিল; তখন কি তিনি এখানে ছিলেন? এখন তৃতীয় আরেক সাম্রাজ্যবাদী হামলা করতে আসছে। আপনারা ভালো করে জানেন, এটি কোনো ব্যক্তি বিশেষের মাসআলা নয়, বরং বিষয় হলো ইসলাম। তাদের শত্রুতা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের সঙ্গে।’ তেমনিভাবে কান্দাহারের গভর্নর ও আমিরুল মুমিনিনের নায়েব মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান ও মোল্লা দাদুল্লাহসহ তালেবানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও তাদের এ ধরনের অবস্থান তুলে ধরেন।^[৭০]

আমিরুল মুমিনিনের ইমান জাগানিয়া এই ধরনের বক্তব্যে বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকার গাত্রদাহ আরো বেড়ে যায়। অবশেষে ১৪২২ হিজরির রজবের ২০ তারিখে বিশ্বসন্ত্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকা ন্যাটোর ১৯ দেশসহ ২৩টি দেশের সরাসরি সম্পৃক্ততা ও প্রায় পুরো বিশ্বের শাসকশ্রেণির সমর্থন নিয়ে আফগানিস্তানে ক্রুসেড আক্রমণ শুরু করে। বাহ্যত যদিও এটি ইসলামি ইমারত ও তালেবান-আরব মুজাহিদগণকে নিঃশেষ করার যুদ্ধ মনে হচ্ছিলো, কিন্তু বাস্তবে তা ছিলো আফগানিস্তানে বিশ্বসন্ত্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকা ও তার মিত্রদের লজ্জাজনক পরাজয় ও তাদের সৈনিকদের কবর রচিত হওয়ার সূচনা। ইংরেজ ও সোভিয়েত রাশিয়ার সিংহের মতো এসে বিড়ালের মতো পালিয়ে যাওয়া থেকে ক্রুসেডার আমেরিকা শিক্ষা নেয়নি। আল্লাহ তাআলার ফয়সালা কতই না সুন্দর; বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা ও তার মিত্রদের স্ব স্ব অবস্থানে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে জিহাদ করার ‘ইস্তিতাআত’-সক্ষমতা আপাতত যেহেতু মুজাহিদগণের নেই, তাই আল্লাহ তাআলা তাদের আফগানিস্তানের মাটিতে টেনে এনেছেন; মুমিন-মুজাহিদগণের হাতে তাদের শাস্তি দেওয়া ও লাঞ্ছিত করার জন্য এবং মুমিন-মুজাহিদগণের অন্তর জুড়ানো ও মনের ক্ষোভ মিটানোর জন্য। যাহোক, ক্রুসেডাররা কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ, মাজার শরিফ ও হেরাতে একযোগে ক্রুজ মিসাইলের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করে। কান্দাহারে অব্যাহতভাবে ১৬ ঘণ্টা ভয়ংকর বোমা হামলা চালায়। ব্যাপক বিধ্বংসী ক্লাস্টারবোমা ব্যবহার শুরু করে। মুজাহিদগণ যতটুকু সম্ভব প্রতিরোধ করছেন, আর যেখানে সম্ভব হচ্ছে না সেখান থেকে পিছিয়ে আসছেন। এক পর্যায়ে তালেবান মুজাহিদরা কাবুলও ত্যাগ করেন। প্রায় মাসখানেক মুজাহিদগণ বিশ্বয়জাগানিয়া প্রতিরোধ করেন। এই

[৭০] শাযারাত, পৃ: ৩০৪-৩১৫

বিশাল শক্তিদ্র আমেরিকার বর্বর বাহিনীকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত আফগানের মাটিতে পা লাগানোর সুযোগটুকুও দেওয়া হয়নি। পুরো আফগানজুড়ে চলতে থাকে মার্কিন বাহিনীর বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা। তাদের বর্বরতার সঙ্গে যুক্ত হয় উত্তরাঞ্চলীয় জোটসহ তালেবানবিরোধী অন্যান্য দলগুলো। তালেবান ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে সরতেই বুরহানুদ্দিন রব্বানি তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু কেউ এটিকে পাত্তা না দিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে কর্তৃত্ব করতে থাকে। আর তখন আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী জার্মানির বন শহরে পুতুল সরকার গঠনের জন্য আফগান নেতাদের একত্র করে। বন কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪২২ হিজরির শাওয়াল মাসে হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বাধীন ৩০ সদস্যের পুতুল সরকারকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কারজাই প্রথম ভাষণেই তালেবানকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে সকলকে এক হয়ে কাজ করার প্রতি আহ্বান জানায়। শুরু হয় তালেবান সম্পৃক্ততার অজুহাতে আফগান জনতার উপর অত্যাচারের এক নতুন অধ্যায়। প্রায় ১ হাজার দ্বীনি মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আফগানের মাটি আবারও সকল হিংস্রতা, বর্বরতা ও অন্যায়-অপরাধের ক্ষেত্র হয়ে উঠে। বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা তালেবান ও আরব মুজাহিদদের কঠিন প্রতিরোধের মুখে দিশেহারা হয়ে ন্যাটোবাহিনীকে সামনে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৪২৪ হিজরিতে ন্যাটোর সেনারা কাবুলে এসে হিংস্রতার চূড়ান্ত পর্বে অবতরণ করে। আমেরিকা কর্তৃক আগ্রাসনের তিন বছরের মাথায় রাজনৈতিক বিন্যাস সম্পন্ন করে এবং মুজাহিদগণের কোমর ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে আমেরিকা অনেকটা প্রশান্ত ও নির্ভর হয়ে উঠে।

কিন্তু; যেমনটি এই উম্মাহর গাইরত সম্পন্ন কাফেলার বীরত্ব আমরা সালাফের যুগ থেকে দেখে এসেছি, এই পর্বেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বরং একটিমাত্র ভূখণ্ডের জিহাদি কাফেলার এমন কঠিন পরিস্থিতির শিকার হওয়ার দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে খুঁজে বের করা দুষ্কর। ইংরেজ, সোভিয়েত রাশিয়া বা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যেকোনো জিহাদের কথাই বলি না কেনো; সেগুলো দেখা যাবে একটি পরাশক্তির বিরুদ্ধে ছিলো বা মুসলিমদের বিশাল বাহিনী ও ভূখণ্ড জিহাদের ময়দানে তৎপর ছিল। কিন্তু এবার আফগানিস্তানে অবস্থিত তালেবান ও আরব মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে বিশ্বপরাশক্তি আমেরিকাসহ বহু ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের সরাসরি ও অন্যান্য প্রায় সকল রাষ্ট্রের সমর্থনে সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আগ্রাসন। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে আফগানের প্রায় সকল দল একজোট ছিলো এবং পাকিস্তানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতা পেয়েছে, কিন্তু এ

পর্বে অভ্যন্তরীণ অন্যান্য দল আমেরিকার পুতুল হয়ে তালেবানের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঁচু করেছে এবং পাকিস্তানসহ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো আমেরিকা কর্তৃক আগ্রাসনের জন্য সকল পথ খুলে দিয়েছে এবং যুদ্ধে আমেরিকার সঙ্গ দিয়েছে। এছাড়াও সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদের সময় বিভিন্ন ভূখণ্ডের উলামায়ে কেরাম জিহাদের পক্ষে ফাতাওয়া দিয়েছেন, মুসলিম উম্মাহকে শরিক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এ পর্বে স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম থেকে পাকিস্তানের সীমিত কয়েকজন সাহসী মুফতি ব্যতীত প্রায় সকলেই চুপ থাকাকেই নিরাপদ মনে করেছেন। বরং বিপরীতে বিরোধিতা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে।

কিন্তু এতসব প্রতিকূল পরিস্থিতিও উম্মাহর সিংহ-শার্দূল বীর মুজাহিদগণকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনো ইমাম নেই, আমেরিকার কর্তৃত্বের বাইরে পৃথক কোনো ভূখণ্ড নেই, বাহ্যত 'ইস্তিতাআত' থাকার দাবি করাও তো হাস্যকর, বিজয় সুনিশ্চিত নয়, বরং পরাজয় সুনিশ্চিত দাবি করা যথাযথ এবং নিশ্চিত প্রচুর পরিমাণে নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি, সাধারণ জনগণের নিপীড়িত ও বাস্তব হওয়ার বাস্তবতা; কোনো বাহানা আল্লাহর রাস্তার বীর মুজাহিদগণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি এবং এমন জটিল মুহূর্তেও কোনো তন্ত্র-মন্ত্র বা কুফরি শক্তি থেকে ধার করা কোনো পদ্ধতির পথে না হেঁটে দারুল ইসলাম ও ইমারতে ইসলামিয়া পুনরুদ্ধারে আহদে নববি থেকে চলে আসা 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতি তথা দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের পথেই অগ্রসর হয়েছেন। একদিকে যথাসম্ভব ক্রুসেডারদের আক্রমণকে প্রতিহত করা হচ্ছে, অপরদিকে এই বিশ্বপরাশক্তিকে দীর্ঘ সময় জিহাদের ময়দানে ধরে রেখে তাদের শক্তি ক্ষয় করা এবং নাকানিচুবানি খাইয়ে লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের গ্লানি আশ্বাদন করাতে পরিকল্পনাকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম করে এক দীর্ঘমেয়াদি জিহাদের জন্য মুজাহিদগণ প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মুজাহিদগণের একাংশ শত্রুর চোখের আড়ালে থেকে আফগানিস্তানেই অবস্থান করেন, অনেকে আবার ওয়াজিরিস্তানসহ সীমান্ত অঞ্চলে হিজরত করে পাকিস্তান তালেবান ও অন্যান্য জিহাদি কাফেলার নুসরত কামনা করেন। এভাবেই গুরু হয় দীর্ঘমেয়াদি জিহাদের ই'দাদ। এবার আর কোনো তাড়াহুড়ো নয়; বরং পেছনের অন্যান্য জিহাদের জয়-পরাজয় ও বিজয় পরবর্তী অবস্থানের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তা থেকে শিক্ষা নিয়ে খুব ধীরে সুস্থে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তালেবান ও আরব মুজাহিদগণ যৌথভাবে অত্যন্ত গোপনীয়তার সহিত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর পরিকল্পনা স্থির করে নিজেদের আরো সুশৃঙ্খল ও সুসংহত করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। আরব বীর মুজাহিদগণ

আফগানিস্তান থেকে আমেরিকাকে হটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তাদের নেটওয়ার্ক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়া শুরু করে, আর তালেবান তাদের বিশ্বস্ত কাউকে নতুন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে বসিয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা করে।^[৭১] একদিকে প্রত্যেক মুজাহিদকে আধুনিক যুদ্ধ কৌশলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া এবং আল্লাহর হুকুমে বিজয়ের পর শত্রু হাতে ইসলামি হুকুমত পরিচালনা করার মতো দক্ষ করে তোলার প্রশিক্ষণ চলতে থাকে, অপরদিকে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে অটুট ইমানের পুঁজি নিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সহিত জিহাদ অব্যাহত থাকে। বীর মুজাহিদগণ বিশেষকরে গেরিলা ও ইস্তিশহাদি হামলায় ক্রুসেডারদের শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। আমেরিকার আগ্রাসনের দেড় বছরের মাথায় মুজাহিদগণ ১ হাজার ২০০ ক্রুসেডারকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। ক্রুসেডাররা এমন চাপে পড়ে যে, ১১ হাজার আমেরিকান সেনা দেশে ফিরে যাওয়ার দাবি তোলে। মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৫ জন মার্কিন সেনা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় এবং ৩৫০ জন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিতে থাকে। ১৪২৫ হিজরিতেই তালেবান এতটা শক্তি অর্জন করে, তাঁরা যাবেল, হেলমান্দ, উরুজগান, পাকতিকা, পাকতিয়া, খোস্ত ও কুনার প্রদেশে তাঁদের শরিআ আদালতের কার্যক্রম শুরু করে দেয়। ১৪২৬-১৪২৭ হিজরিতে ক্রুসেডাররা আফগান ও ইরাকে গেরিলা ও ইস্তিশহাদি হামলায় প্রচণ্ড রকম মার খায়, আর অপরদিকে আরব বীর মুজাহিদ শাইখের পরিকল্পনায় লন্ডনসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হামলা অব্যাহত থাকে। ইরাকে মুজাহিদ কমান্ডার আবু মুসআব যারকাবিকে শহিদ করা হলে তালেবান ঘোষণা দেয়, ‘মহান মুজাহিদ যারকাবির প্রতিশোধ নিতে আমরা খুব শীঘ্রই ১৫০ বোমাবহনকারী ইস্তিশহাদি স্কোয়াড ইরাকে পাঠাচ্ছি।’ যারকাবির শাহাদাতের পর আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের উপর হামলার গতি আরো বৃদ্ধি পায়। আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর আমেরিকাবিরোধী জিহাদের কমান্ড মোল্লা দাদুল্লাহর হাতে তুলে দেন। মোল্লা দাদুল্লাহর তুফান গতির হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান ও আফগান সেনারা ভ্যাচেকা খেয়ে যায়।^[৭২] তালেবানের আক্রমণ আরো তীব্রতর হয় এবং এক পর্যায়ে ন্যাটোবাহিনী দক্ষিণ আফগানিস্তান থেকে পিছু হটেতে শুরু করে। এ সময়ে ন্যাটোবাহিনী আরব মুজাহিদ কাফেলাকে আফগানে আশ্রয় না দেওয়াসহ আরো কিছু শর্তে সেনা প্রত্যাহারের চুক্তি করতে চাইলে তালেবান তা শ্রবণযোগ্যও মনে করেনি।^[৭৩] ১৪২৮ হিজরিতে তালেবান

[৭১] তারিখে আফগানিস্তান, ২/৩৫৭।

[৭২] তারিখে আফগানিস্তান, ২/৩৮১।

[৭৩] তারিখে আফগানিস্তান, ২/৩৮৪।

মুজাহিদগণ ইস্তিহাদি হামলার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অপহরণের নীতি গ্রহণ করে এবং এতে তাঁরা বেশ সাফল্যও অর্জন করে। যাহোক, এইভাবে অগ্রসর হতে থাকে তালেবানের জিহাদি তৎপরতা। ১৪৩১ হিজরির শুরুতে স্বয়ং ন্যাটোর আইএসএফের কমান্ডার এক বিবৃতিতে স্পষ্ট করে যে, 'তালেবানরা আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশ থেকে ৩৩টির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তারা দিনদিন শক্তিশালী হচ্ছে, আর আমরা দিনদিন হচ্ছি দুর্বল।' এর আগে মুরতাদ পারভেজ মুশাররফও নিউইয়র্ককে এই বার্তা দেয় যে, 'তালেবানরা আফগানিস্তানের ৯০ শতাংশ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেছে।' যখন আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদগণ দুর্বীর গতিতে এগিয়ে চলছেন এবং আরব বীর মুজাহিদ শাইখের বিশ্বময় জিহাদের পরিকল্পনায় আফ্রিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জিহাদের ধারাবাহিকতা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, তখনই ১৪৩২ হিজরির সবচেয়ে মর্মাস্তিক সংবাদ মুসলিম উম্মাহর হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আফগানিস্তানে আমেরিকার আগ্রাসনের পর আরব বীর মুজাহিদ শাইখ আত্মগোপনে থেকে বিবৃতি প্রদানসহ বিশ্বময় জিহাদের নেতৃত্ব দেওয়া সত্ত্বেও বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা জমিনের প্রতিটি পরতে পরতে তালাশ করে শাইখের কোনো সন্ধান উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হচ্ছিলো না। কিন্তু এ পর্যায়ে এসে তারা সফল হয় এবং পাকিস্তানের এ্যাবোটাবাদে শাইখের অবস্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৩২ হিজরির ২৭ জুমাদাল উলা রবিবার দিবাগত রাত ১টায় তথা ২৮ জুমাদাল উলা সোমবারে তারা অভিযান পরিচালনা করে। শাইখসহ শাইখের সঙ্গে থাকা দেহরক্ষীরা যথাসম্ভব মোকাবেলা করার চেষ্টা করেন। জীবনের শেষ মুহূর্তেও বীরত্বের সহিত লড়তে লড়তে ইতিহাসের গতিপথ পালটে দেওয়া বিশ্বময় জিহাদের রূপকার, বিশ্ব কুফরি শক্তির আতঙ্ক, পঞ্চদশ শতকের মুজাদ্দিদ ও শ্রেষ্ঠতম যাহিদ-দরবেশ এবং বিশ্ব জাগানিয়া এই বীর মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন। মুসলিম উম্মাহ এক অমূল্য রতন হারালেও এবং শাইখের শাহাদতে মুজাহিদগণ বড়ো ধরনের আঘাত পেলেও শাইখ এই দীর্ঘ জিহাদি জীবনে যে সকল বীর মুজাহিদ তৈরি করে দিয়েছেন, তাদের নেতৃত্বে বিশ্বময় জিহাদ আপন গতিতেই সামনে অগ্রসর হয়েছে। শাইখের পর তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি মিশরের প্রসিদ্ধ বীর মুজাহিদ শাইখ বিশ্বময় জিহাদের ধারাবাহিকতা সুচারুরূপেই আগ্রাম দিয়েছেন।

যাহোক, তালেবানের অস্বাভাবিক অগ্রগতিতে আমেরিকা নমনীয় হতে বাধ্য হয়। ১৪৩২ হিজরিতেই ওবামা ৩৩ হাজার সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় এবং শান্তি আলোচনার জন্য প্রস্তাব দিতে থাকে। ১৪৩৩ হিজরিতে

কাতারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তালেবানের রাজনৈতিক দফতর উদ্বোধন করা হয় এবং এফবিআই আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরকে তাদের হিটলিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা দেয়। আমেরিকা শান্তি আলোচনার টোল পেটাতে থাকলেও তখনও তালেবানের সঙ্গে তেমন কোনো আলাপ হয়নি। আর এরই মাঝে ১৪৩৪ হিজরিতে আরো এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে; যদিও মুসলিম উম্মাহ আরো দুই বছর পর তা জানতে পারে। ১৪৩৪ হিজরির ১৪ জুমাদাল আখেরা বুধবারে পঞ্চদশ শতকের অন্যতম কিংবদন্তি বীর মুজাহিদ, ইসলামি শরিআ রক্ষায় পাহাড়সম অবিচল ব্যক্তিত্ব, খিলাফত পতনের পর শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারে যাঁর জিহাদি তৎপরতায় আবারও অস্তিত্বে এসেছে ইসলামি ইমারত এবং আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাতাব রাঃ এর শেষ যমানার প্রতিচ্ছবি আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ নিশ্চুপে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে এই পৃথিবীকে বিদায় জানান। আমিরুল মুমিনিনের মৃত্যুর সংবাদ তাঁর ছেলে মাওলানা ইয়াকুব ও আমিরুল মুমিনিনের আপন ভাই মাওলানা আবদুল মান্নান দারুল ইফতার প্রধান মাওলানা আবদুল হাকিম ও তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মাওলানা হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহকে অবগত করলে তাঁরা উভয়ে বলেন, এখন আমাদের প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে; একজন আমির ঠিক করতে হবে। তাই তাঁরা শাইখ আবদুস সালামসহ আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নায়েব মোল্লা মুহাম্মাদ আখতার মানসুরকে ডেকে পাঠান এবং আমিরুল মুমিনিনের মৃত্যুর সংবাদ শোনান। মোল্লা আখতার মানসুর বলেন, নতুন আমির ঠিক করতে হলে মজলিসে গুরার সবাইকে ডাকতে হবে। তখন মোল্লা আবদুল মান্নান বলেন, সবাইকে ডাকতে গেলে বিষয়টি গোপন থাকবে না; অথচ আমিরুল মুমিনিনের মৃত্যুর সংবাদ এখন গোপন রাখা জরুরি। কারণ, আমেরিকা সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তারা গড়িমসি করতে পারে। পরবর্তী সময়ে মুনাসেব সময়ে মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করা হবে এবং ব্যাপকভাবে নতুন আমিরের বাইআত নেওয়া হবে। সকলে এতে সম্মতি প্রকাশ করে আরো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কয়েক দিন পর আবার মিলিত হন। তখন চার আলিম; মাওলানা আবদুল হাকিম, শাইখ আবদুস সালাম, মাওলানা হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ ও মাওলানা নুর মুহাম্মাদ সাকিব পৃথক হয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর আমিরুল মুমিনিন হিসেবে মোল্লা মুহাম্মাদ আখতার মানসুরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। অতঃপর তাঁরা উপস্থিত সকলের সামনে এসে মোল্লা আখতার মানসুরকে আমিরুল মুমিনিন হিসেবে ঘোষণা করেন এবং প্রথমে শাইখ আবদুস সালাম বাইআত করেন, অতঃপর বাকি তিন

আলিম ও অন্যান্যরা বাইআত করেন।^[৭৪] আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদের মৃত্যুর সংবাদ দীর্ঘকাল গোপন থাকলেও আস্তে আস্তে যখন প্রকাশ হতে থাকে, তখন উলামায়ে কেরামের পরামর্শে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৩৬ হিজরির শাওয়াল মাসে নতুন করে মজলিসে শুরার সকল সদস্য আমিরুল মুমিনিন হিসেবে মোল্লা মুহাম্মাদ আখতার মানসুরের হাতে বাইআত করেন এবং পরেরদিন আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদের মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হয়। শাওয়ালের ২৭ তারিখে বিশ্বময় জিহাদের আমির মিসরি শাইখও আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ আখতার মানসুরের হাতে বাইআতের ঘোষণা দেন। আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ আখতার মানসুর তাঁর পূর্বসূরির ন্যায় অত্যন্ত অবিচলতা ও বিচক্ষণতার সহিত সকল দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। সে সময় ইরাকে বর্তমান সময়ের খারেজিগোষ্ঠী দায়েশের উদ্ভব ঘটে এবং আফগানিস্তানেও তারা বিশৃঙ্খলা শুরু করে। আমিরুল মুমিনিন মোল্লা আখতার মানসুর অত্যন্ত সুন্দর ভাষা ও পরিপূর্ণ সম্মান রক্ষা করে বাগদাদির নিকট বার্তা প্রেরণ করেন। তাতে তিনি এই জটিল মুহূর্তে বিভক্ত না হওয়া এবং ইরাক ও সিরিয়ায় আরব বীর মুজাহিদ শাইখের তারতিবে চলা জিহাদি তৎপরতা নষ্ট না করার অনুরোধ জানান। কিন্তু তার মুখপাত্র আদনানি তা প্রত্যাখ্যান করে এবং আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদের শানে অত্যন্ত জঘন্য ভাষা ব্যবহার করে; তখনও আমিরুল মুমিনিনের মৃত্যু সংবাদ প্রচার হয়নি।^[৭৫] পরবর্তী সময়ে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা আখতার মানসুর তাদের তৎপরতাকে কঠিন হস্তে দমন করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ১৪৩৭ হিজরির ১৪ শাবান আমেরিকার গুপ্ত হামলায় তিনি শাহাদাতবরণ করেন এবং মজলিসে শুরা আমিরুল মুমিনিন হিসেবে শাইখুল হাদিস ওয়াত তাফসির মাওলানা হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদার হাতে বাইআত করে। আমিরুল মুমিনিন হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদার নেতৃত্বে দিনদিন যখন তালেবানের শক্তি বাড়তে থাকে এবং ক্রুসেডারদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকে, তখন বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা বিড়ালের মতো পালানোর পথ খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে সরাসরি পালিয়ে যাওয়ার লজ্জা ঢাকতে তালেবানের সঙ্গে আলোচনায় বসে চুক্তি করে পালানোর পথ বের করে। চুক্তির ধারা চূড়ান্ত করা নিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। তালেবান শরিআর উপর অবিচলতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দিয়েও চুক্তি করতে প্রস্তুত ছিলো না। শেষ পর্যন্ত বিশ্বমোড়ল তার মোড়লগিরির জলাঞ্জলি দিয়ে তালেবানের কথায় আসতে বাধ্য

[৭৪] আলমোল্লা মুহাম্মাদ উমর পৃ: ২৯৪-২৯৫।

[৭৫] আলমোল্লা মুহাম্মাদ উমর পৃ: ৩১৩-৩১৪।

হয়। অবশেষে ১৪৪১ হিজরির ৫ রজব কাতারে আমেরিকার প্রতিনিধি জালমে খলিলজাদ ও তালেবান প্রতিনিধি মোল্লা আবদুল গনি বেরাদারের মাধ্যমে চুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তির মূল বিষয় ছিলো ‘আগামী ১৪ মাসের মধ্যে আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করবে, আর ইমারতে ইসলামিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কোনো শত্রুকে আশ্রয় দেবে না এবং তাদের উপর আক্রমণ করতে আফগানিস্তানের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না।’ মূলত ততোদিনে বিশ্বময় জিহাদ পরিচালনার জন্য বহু ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে, তাই ইমারতে ইসলামিয়া তা মেনে নিতে বিশেষ কোনো সমস্যা ছিলো না। আমেরিকা ওই চুক্তিতে বিশ্বময় জিহাদি কাফেলার জন্য সন্ত্রাসী শব্দ ব্যবহার করতে চাইলে ইমারতে ইসলামিয়া তা প্রত্যাখ্যান করে এবং আমেরিকা তা মেনে নিতে বাধ্য হয়।^[৭৬] এই চুক্তির মাধ্যমেই তালেবানের প্রকৃত বিজয় হয়ে গেছে এবং তৎকালীন আফগানিস্তানের পুতুল সরকার আশরাফ গনির পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে। চুক্তির পর থেকে তালিবানের জিহাদ পরিচালিত হয়েছে নামধারী মুসলিম শাসক ও তার নামধারী মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে; শুধু তাই নয়, বরং তখন রাষ্ট্রের নাম ইসলামি রিপাবলিক অব আফগানিস্তান। তালেবানের জিহাদের সূচনাও হয়েছিল নামধারী মুসলিম শাসক নয় শুধু; বরং এক সময়ের নেতৃস্থানীয় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এবং চূড়ান্ত বিজয়ও হতে চলছে নামধারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে। শরিআ আইন পুনরুদ্ধারই যেহেতু মূল বিষয়, সুতরাং ক্ষমতায় বসা ব্যক্তি ও তার সৈন্যদের নাম কি তা দেখার বিষয় নয়, বরং শরিআ আইনে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা বিবেচ্য। দুর্বার গতিতে চলতে থাকে তালেবানের বিজয় ঘোড়া। আর তারই ধারাবাহিকতায় ১৪৪৩ হিজরির ৭ মুহাররম রবিবার এক আলোকিত প্রভাত নিয়ে সূর্য উদ্ভিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে রচিত হয় এক ঐতিহাসিক মহান বিজয়ের অধ্যায়। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে জিহাদের ময়দানে পাহাড়ের ন্যায় অবিচল থেকে বিশ্বপরাশক্তি-বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা ও তাদের কাঠপুতুল বিশ্ব গাদারদেরকে পরাজিত করে কাবুলে প্রবেশ করে আল্লাহর দ্বীনের প্রহরী ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ। খিলাফত পতনের পর মুসলিম উম্মাহর জীবনে এরচেয়ে আনন্দের দিন আর আসেনি। পুলকিত হয়ে উঠে মুমিনদের অন্তর। এই খুশি আল্লাহর জন্য, এই আনন্দ দ্বীন বিজয়ী হওয়ার আনন্দ। গাইরত সম্পন্ন মুমিনের জন্য এই আনন্দের কোনো তুলনা হতে পারে না। খিলাফত পতনের একশ বছরের মাথায় আবারও শুরু হলো ইমারতে ইসলামিয়ার পথচলা। শরিআ আইন বাস্তবায়ন ও দারুল ইসলাম পুনরুদ্ধারের এক বরকতময়

[৭৬] আলজাযিরার সাংবাদিক আহমাদ ফালুদ্দিন কর্তৃক রচিত «حجر الأرض» (হাজারুল আরয), পৃ: ১৬৪।

সূচনা হলো। এতদিন তালেবানের বিরোধিতা করা গোষ্ঠীও আজ কাঁচুমাচু করে খুশি প্রকাশ করছে। আরেক দল আছে যারা জিহাদকে নিষ্প্রাণ করতে হাজারো শর্তের প্রাচীর নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত থাকে, যাদের শর্তগুলোর আলোকে তালেবানের জিহাদও সহিহ হয় না এবং যাদেরকে কখনো তালেবানের পক্ষে কথা বলতে বা তালেবানের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব দিতে দেখা যায়নি, তারা তালেবানের বিজয়ের পর একধাপ এগিয়ে এককভাবে তালেবানের মালিকানা হাতে নিয়ে নেয়। যারা এতদিন তালেবানের পক্ষে কথা বলেছে বা তাদের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব দিয়ে আসছে; তাদের তালেবান বিরোধী আখ্যা দিয়ে দায়েশের দিকে নিসবত করতে থাকে এবং আরব বীর মুজাহিদ শাইখের বিশ্বময় জিহাদ সহিহ নয় আর তালেবানের জিহাদ সহিহ বলে একই ময়দানের কাফেলার মাঝে ভিন্নতা দেখানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে থাকে। এই লোকগুলো যেন জানেই না যে, এই বিজয়ের পেছনে আরব মুজাহিদগণের শুধু অবদান নয়; বরং অসাধারণ, অতুলনীয় ও অকল্পনীয় অবদান রয়েছে। তালেবান ও বিশ্বময় জিহাদের কাফেলা কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ, আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ আখতার মানসুর ও তালেবানের অন্যান্য নেতাদের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট। যাহোক, তালেবান পুরো আফগানজুড়ে ইমারতে ইসলামিয়ার ঘোষণা দিয়ে একে একে বিদ্রোহীদের দমন করতে শুরু করে। বিশেষকরে খারেজিগোষ্ঠী দায়েশকে কঠিন হস্তে দমন করে সামগ্রিকভাবে পুরো আফগানিস্তানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। বিশ্ব কুফরি শক্তি ও তাদের আড্ডাস্থল জাতিসংঘের হাজারো নিষেধাজ্ঞা ও অপপ্রচার উপেক্ষা করেই দ্বীনি ও পার্থিব; উভয় ক্ষেত্রে দিনদিন উন্নতির শিখরে উন্নীত হয়ে চলছে। আল্লাহ তাআলা উম্মাহর উপর ইমারতে ইসলামিয়ার বরকতময় ছায়ায় কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করুন এবং সকল অপশক্তির কুদৃষ্টি থেকে ইমারতে ইসলামিয়ায় হিফায়ত করুন, আমিন।

□ চেচনিয়া-ককেশাস

হিজরি দ্বাদশ শতকের শেষ ও ত্রয়োদশ শতকের শুরুর দিকে যখন রাশিয়ার আধিপত্য দিনদিন ব্যাপক হতে থাকে আর উসমানি খিলাফত দুর্বল হতে থাকে এবং রাশিয়ার জার সরকার চেচনিয়া-ককেশাসের বিভিন্ন অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে, তখন থেকেই সে সকল অঞ্চলের মুজাহিদগণ সংঘবদ্ধ হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করেন। যখন খিলাফতের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশা একেবারেই ক্ষীণ, তখনও এই শক্তিদ্র রাশিয়ার জার সরকারের বিরুদ্ধে

জিহাদে নামতে কোনো অযুহাত তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। মূলত ১১৩৪/৩৫ হিজরির দিকে সর্বপ্রথম চেচনিয়ার মুজাহিদদের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘর্ষ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ককেশাসে রাশিয়ার দখলদারিত্ব প্রতিহত করতে ইমাম মানসুর তাঁর অনুসারী ও মুরিদদের একত্রিত করে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। জয়-পরাজয়ের মাঝেই চলতে থাকে ইমাম মানসুরের জিহাদি তৎপরতা। এক পর্যায়ে তিনি রাশিয়ার হাতে বন্দি হয়ে যান এবং ১২০৮/৯ হিজরির দিকে তিনি বন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১২৪৪/৪৫ হিজরির দিকে রাশিয়ার মোকাবেলায় আবারও মুজাহিদগণ ইমাম মুহাম্মাদ গাযির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে জিহাদের ধারা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু এবার জার সরকার সর্বোচ্চ হিংস্রতার পরিচয় দেয়। মানুষদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে থাকে এবং ইমাম গাযির কাফেলার বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের অভিযান পরিচালনা করে। গিমারির যুদ্ধে হাজারো মুরিদসহ ইমাম গাযি শাহাদাতবরণ করেন এবং শুধু দুজন মুজাহিদ মারাত্মক আহত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে আসতে সক্ষম হন। তাদেরই একজন ছিলেন পরবর্তী চেচনিয়া-ককেশাস জিহাদের মহানায়ক, অকুতোভয় বীর মুজাহিদ ইমাম শামিল। ইমাম গাযির সঙ্গে ইমাম শামিলও শহিদ হয়ে যাওয়ার ধারণা থেকে মুজাহিদগণ ইমাম হামযা বেককে জিহাদের আমির হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১২৪৯/৫০ হিজরির দিকে ইমাম হামযা বেককে গুপ্ত হামলা চালিয়ে শহিদ করে দেওয়া হলে সকলে ইমাম শামিলকে জিহাদের আমির হিসেবে নিযুক্ত করেন।

ককেশাসের সিংহ ইমাম শামিল দাগিস্তানির হাতে নেতৃত্ব আসার পর হিংস্র জার সেনাদের সুখনিদ্রা হারাম হয়ে যায়। তিনি একদিকে যেমন অধীনস্ত অঞ্চলে শরিআ আইন বাস্তবায়ন করতে থাকেন, অপরদিকে জিহাদের কাফেলাকে আরো সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল করে রাশিয়ার শক্তিদ্র বাহিনীর মোকাবেলা করার মতো উপযুক্ত করে তোলেন। ইমাম শামিল গেরিলা যুদ্ধকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন। ইমাম শামিলের দূরদর্শী সমরকৌশল জারবাহিনীকে অস্থির করে তোলে। এক পর্যায়ে ইমাম শামিল তাঁর জিহাদি কাফেলা নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যান। তখন জারবাহিনী তাঁদেরকে ধাওয়া করতে করতে জঙ্গলে প্রবেশ করে। আর তখনই চতুর্দিক থেকে মুজাহিদগণ তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। ইমাম শামিল চার বছরের মতো বনজঙ্গলে জিহাদ পরিচালনা করেন, আর এই চার বছরে প্রায় ১০ হাজার রুশ সেনাকে হত্যা করেন। রাশিয়া ইমাম শামিলের মাথার মূল্য ৪৫ হাজার রুবল ঘোষণা করলে ইমাম শামিল রুশ জেনারেলের কাছে বার্তা প্রদান করে বলেন, আমার তো সৌভাগ্য যে আমার মাথার এত

বিশাল মূল্য। অথচ তুমি সৌভাগ্যবান হতে পারলে না; কারণ, তোমার মাথা বা তোমার রাষ্ট্রপ্রধানের মাথা আমার কাছে এক কোপেকেরও^[৭৭] মূল্য রাখে না। ১২৭৩ হিজরিতে যখন উসমানি খিলাফত আরো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং খিলাফতের দিক থেকে রাশিয়ার উপর আক্রমণ না হওয়ার ব্যাপারে তারা আশ্বস্ত হয়, তখন রাশিয়া ককেশাসের দিকে তার পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করে। ইমাম শামিলের মোকাবেলায় জার সরকার এক যুবক জেনারেল আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ২ লাখ সৈন্য প্রেরণ করে। আলেকজান্ডারের মতো দক্ষ যোদ্ধা খুব ভালোভাবে ইমাম শামিলের সমরকৌশল অনুধাবন করার চেষ্টা করে। সে বুঝতে পারে, ইমাম শামিলের বিজয়ী হওয়ার মূল কারণ; তাঁর যুদ্ধ খোলা ময়দানে ছিলো না। তিনি বনজঙ্গল ও পাহাড়ের আড়ালে যুদ্ধ করতেন। তাই জেনারেল আলেকজান্ডারের নির্দেশে চেচনিয়া ও দাগিস্তানের পাহাড়-জঙ্গলের সারি সারি গাছপালা কেটে বনজঙ্গল উজাড় করে ফেলা হয় এবং এক পর্যায়ে ১২৭৬ হিজরিতে ৮ সফর জারবাহিনী ইমাম শামিলকে বন্দি করতে সক্ষম হয়। ইমাম শামিলকে মস্কো নিয়ে যাওয়ার পর সেখানেই ১০ বছর রাখা হয়। এক পর্যায়ে তিনি হজ্জ আদায়ের ইচ্ছে পোষণ করলে জার সরকার বাধা না দিয়ে তাঁকে মদিনায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেখানেই ১২৮৭ হিজরির ফিলকাদার ২৫ তারিখে ককেশাসের সিংহ এই মহান বীর মুজাহিদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইমাম শামিলের পর জিহাদি তৎপরতায় ভাটা পড়লেও একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সেই ধারাবাহিকতায় আরব বীর মুজাহিদ শাইখের বিশ্বময় জিহাদের অংশ হিসেবে চেচনিয়া-ককেশাসের জিহাদে বীর মুজাহিদ শহিদ শামিল বাসায়েভ ও শহিদ খাত্তাবের বীরত্বগাঁথা অবদান চেচেন জিহাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

□ লিবিয়া

উসমানি খিলাফতের পতনকালে ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতিতে ইসলামি কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে যে সকল মুজাহিদ অস্বাভাবিক অবদান রেখেছেন তাদের অন্যতম ঐতিহাসিক একজন ব্যক্তিত্ব হলেন আল্লাহর রাস্তার বীর মুজাহিদ, মরুসিংহ শাইখ উমর আলমুখতার। ১৩৩০ হিজরিতে ইতালি লিবিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করা শুরু করলে সানুসিদের নেতৃত্বে ইতালির বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা হয়। শাইখ উমর আলমুখতার সানুসিদের অধীনে বীরত্বের সহিত জিহাদ পরিচালনা করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে ১৩৩৯ হিজরিতে মুহাম্মাদ ইদরিস সানুসি ইতালির সঙ্গে চুক্তিতে

[৭৭] একশ কোপেকে এক রুবল

আবদুল হুসেইন লিবিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের উপর ইতালির কর্তৃত্ব মেনে নিলে শাইখ উমর আলমুখতারসহ অন্যান্য মুজাহিদগণ সেটির বিরোধিতা করেন এবং সকল মুজাহিদ শাইখ উমর আলমুখতারের নেতৃত্বে ইতালির বিরুদ্ধে জিহাদের ধারাবাহিকতা জারি রাখেন। ১৩৪১ হিজরিতে মুসোলিনি যখন লিবিয়াকে ইতালির দাবি করে পূর্বের সমস্ত চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে, তখন শাইখ উমর আলমুখতারের জিহাদি তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পায়। কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনো ইমাম নেই, ইতালির কর্তৃত্বের বাইরে পৃথক কোনো ভূখণ্ড নেই, মুসোলিনির মতো হিংস্র ক্ষমতাবাদী ব্যক্তির শক্তির বিপরীত পর্যাপ্ত শক্তির অভাব এবং বিজয় সুনিশ্চিত না হওয়া; কোনো অযুহাত শাইখ উমর আলমুখতার ও তাঁর জিহাদি কাফেলাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বৃহৎ শক্তিকে পরাভূত করার গেরিলা পদ্ধতিই ছিলো শাইখ উমর আলমুখতারের প্রধান হাতিয়ার। লিবিয়ার বিস্তীর্ণ মরুভূমির প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে শাইখ উমর আলমুখতারের যথেষ্ট ধারণা ছিলো এবং গেরিলা হামলায় তাঁর পারদর্শিতা ছিলো অস্বাভাবিক। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই তিনি ইতালিয়ান সৈন্যদের জীবন বিধিয়ে তুললেন। গেরিলা হামলা করে শাইখ উমর আলমুখতারের গেরিলাযুদ্ধারা এমনভাবে হাওয়ায় মিশে যেত, ইতালিয়ান সেনারা তাদের কোনো চিহ্নও খুঁজে পেত না। ১৩৩০ হিজরি থেকে দীর্ঘ বিশ বছর ইতালির জন্য এক আতঙ্কের নাম ছিলো শাইখ উমর আলমুখতার। লিবিয়ার মরুভূমিতে ইতালিয়ান সেনাদের কবর রচনা হলেও এই জিহাদি কাফেলাকে তারা কোনোভাবেই কুপোকাত করতে পারছিল না। দীর্ঘ বিশ বছর লিবিয়ায় ইতালিয়ানদের স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা ছিলো আকাশ-কুসুম ভাবনা। অবশেষে মুসোলিনি আরো শক্তিশালী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাহিনী লিবিয়ায় প্রেরণ করে। মুসোলিনির বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও অস্বাভাবিক কষ্টসাধ্যের পর ১৩৫০ হিজরিতে শাইখ উমর আলমুখতারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় এবং ১৩৫০ হিজরির জুমাদাল উলার ৩ তারিখে এই মহান বীর মুজাহিদ মরুসিংহকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহিদ করে দেওয়া হয়। শাইখ উমর আলমুখতারের জিহাদি তৎপরতার ধারাবাহিকতায় যদিও এক সময় লিবিয়া ইতালি থেকে স্বাধীন হয়, তবে আফসোসের বিষয় হচ্ছে, ইংরেজদের সহযোগিতা গ্রহণ করায় অন্যান্য অনেক ভূখণ্ডের ন্যায় লিবিয়াতেও ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদীদের হাতে গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

□ ফিলিস্তিন

উসমানি খিলাফতের শেষের দিকে ইউরোপীয় ক্রুসেডার কর্তৃক মুসলিম ভূখণ্ডগুলো একে একে দখল করা এবং ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইহুদিদের অবৈধ

বসতি স্থাপনের জন্য তাদের আটঘাট বেঁধে নেমে পড়ার ইতিহাস নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। ইসলাম ও মুসলিমদের এমন চরম দুর্দশা ও কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর রাস্তার যে সকল বীর মুজাহিদ দারুল ইসলাম ও ইসলামের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে আহদে নববি থেকে চলে আসা 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতি তথা দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের পথে অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের অন্যতম একজন ব্যক্তিত্ব হলেন ফিলিস্তিন জিহাদের মহানায়ক, আমিরুল মুজাহিদিন শাইখ ইয়যুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল কাদের আলকাসসাম; ইতোপূর্বে ইতালির বিরুদ্ধে লিবিয়ার জিহাদে যিনি বড়ো ধরনের অবদান রেখেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তথা ১৩৩৮ হিজরিতে যখন ফরাসিরা সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল দখল করে নেয় তখন শাইখ ইয়যুদ্দিন আলকাসসাম তাঁর ছাত্র ও মুরিদদের এক জামাআত নিয়ে ফরাসিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। সেখানে ফরাসিদের বিরুদ্ধে টিকে থাকা সম্ভব না হওয়ায় তিনি দিম্যশ্কে চলে আসেন। দিম্যশ্কে যখন ফরাসিরা দখল করে নেয় তখন ১৩৪০ হিজরিতে তিনি ফিলিস্তিনের হাইফা নগরীতে হিজরত করেন। সেখানে এসে তিনি "العصبة القسامية" (আলউসবাতুল কাসসামিয়া) নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনো ইমাম নেই, ইংরেজ ও জায়নবাদীদের কর্তৃত্বের বাইরে কোনো ভূখণ্ড নেই, তৎকালীন পরাশক্তি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সীমিত কিছু ছাত্র ও মুরিদ নিয়ে শুরু হয় শাইখ ইয়যুদ্দিন আলকাসসাম কর্তৃক জিহাদি কাফেলা প্রস্তুত করা এবং জায়নবাদী ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতা। এক অসম যুদ্ধ দিয়েই ফিলিস্তিন জিহাদের সূচনা হয়েছিলো। বিশাল শক্তিকে অস্তির করে তোলার গেরিলা পদ্ধতিকেই শাইখ ইয়যুদ্দিন আলকাসসাম গ্রহণ করেছিলেন। শাইখ একদিকে মানুষদের জায়নবাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন, আর অপরদিকে গেরিলা হামলায় জায়নবাদীদের কবর রচনা হতে থাকে। ১৩৫৪ হিজরি পর্যন্ত শাইখ আলকাসসাম ইংরেজদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে তাদের পরাস্ত করতে থাকেন। কিন্তু শাইখ আলকাসসাম যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জিহাদের ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দাঈদেরকে পাঠিয়ে দেন জনসাধারণকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে, তখন বিষয়টি ইংরেজদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। ইংরেজ সৈন্যরা সীমিত কিছু অনুসারীসহ শাইখ আলকাসসামের অবস্থান নির্ণয় করে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয়। ইংরেজ সৈন্যরা তাদের আত্মসমর্পন করতে বললে শাইখ আলকাসসাম তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এক অসম যুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়তে লড়তে ফিলিস্তিন জিহাদের এই মহানায়ক শাহাদাতবরণ করেন।

শহিদ ইয়যুদ্দিন আলকাসসামের দেখানো পথেই যুগ যুগ ধরে ইহুদি-জায়নবাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের মুজাহিদগণ জিহাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। কর্তৃত্বসম্পন্ন ইমাম থাকা বা না থাকা, শক্তির সমতা আছে কি নেই, বিজয় নিশ্চিত কি নিশ্চিত নয়, কত মানুষের প্রাণহানি ও কত অঞ্চল বিলীন হবে; ইহুদিদের ভয়ংকর থাবা প্রতিহত করতে এ ধরনের কোনো কিছুর তোয়াক্কা করা হয়নি। তারই ধারাবাহিকতায় গত বছর তথা ১৪৪৫ হিজরির ২২ রবিউল আউয়াল শনিবারে সেই শহিদ ইয়যুদ্দিন আলকাসসামের নামে প্রতিষ্ঠিত হামাসের সামরিক শাখা ‘কাতায়িবুল কাসসাম’র নেতৃত্বে পরিচালিত হয় ঐতিহাসিক ‘তুফানুল আকসা’; যে ঝড় বর্তমানে অন্যতম সামরিক শক্তিদ্বর রাষ্ট্র জায়নবাদী ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অহংকার উড়িয়ে দিয়েছে এবং বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছে। শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধসহ লাখো মানুষের প্রাণ যাবে এবং বহু শহর-নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে; তবুও আকসা পুনরুদ্ধার ও ইহুদি আগ্রাসন প্রতিহত করতে জিহাদ পরিচালনা করা থেকে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই এবং ইহুদি হিংস্রতায় ব্যাপক প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রবল আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আকসা পুনরুদ্ধার ও ইহুদি আগ্রাসন প্রতিহত করতে এই অসম যুদ্ধ থেকে উম্মাহর গাইরত সম্পন্ন মুজাহিদগণ পিছিয়ে থাকেনি। জায়নবাদী হিংস্রশক্তি গণহত্যা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালালেও ফিলিস্তিন জিহাদের অগ্রগতি থামাতে পারেনি। এক বছরের অধিক সময় পার হয়ে গেলেও নিজেদের প্রতিরক্ষা শক্তির অহংকারে বৃন্দ হয়ে থাকা হিংস্র ইহুদিরা ক্রুসেডার আমেরিকার সহযোগিতা নেওয়া সত্ত্বেও মুজাহিদদের দমাতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহর নুসরতে গেরিলা হামলার মাধ্যমে ইহুদি সৈন্যদের উপযুক্ত পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবশেষে তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। আল্লাহর সিংহ-শাদুলরা আঘাত পেলেও মনোবল হারায় না, বরং ‘ই’লায়ে কালিমাতুল্লাহ’র লক্ষ্যে অদম্য শক্তি-সাহস নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়।

□ আরো কিছু ভূখণ্ডের সংক্ষিপ্ত চিত্র

খিলাফত ও শরিআ শাসনের দুর্বল ও পতন এবং ব্যাপকভাবে দারুল ইসলাম হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর সেগুলোর পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন ভূখণ্ডে ‘মুতাওয়ায়াস’ পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়ার কিছু চিত্র আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। এছাড়াও জাযায়েরে ফরাসি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ১২৪৫ হিজরিতে আমির আবদুল কাদের জাযায়েরির নেতৃত্বে জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু হয়। সুফিয়ায়ে কেরামসহ সকলে জিহাদের জন্য তাঁর হাতে বাইআত করে। গেরিলা হামলার মাধ্যমে

ফরাসি শক্তিকে একে একে পরাভূত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ১২৫২ হিজরিতে ফরাসিরা পূর্ব জাযায়েরে আমির আবদুল কাদেরের শাসন মেনে নিতে বাধ্য হয়। সে সময়ে তিনি তাঁর জিহাদি কাফেলাকে আরো শক্তিশালী করে দারুল ইসলামের সীমানা আরো বিস্তৃত করতে থাকেন। কিন্তু ১২৬৪ হিজরিতে ফরাসিরা তার বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের অভিযান পরিচালনা করে তাঁকে গ্রেফতার করে দিমাশ্কে পাঠিয়ে দেয় এবং সেখানেই তিনি ১৩০০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী সময়ে ইবনে বাদিসের আন্দোলন এবং সেটির ধারাবাহিকতায় ১৩৮৩ হিজরিতে জাযায়ের ফরাসিদের দখল থেকে স্বাধীন হলেও পরবর্তীদের জাতীয়তাবাদী মানসিকতার কারণে ইসলামের কর্তৃত্বের পরিবর্তে পশ্চিমাদের আদর্শই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তেমনভাবে মাগরিবে ফরাসি ও স্প্যানিশ শক্তির বিরুদ্ধে ১৩৪০ হিজরিতে আবদুল কারিম খাতাবি অত্যন্ত বীরত্বের সহিত জিহাদ পরিচালনা করতে থাকেন। 'আনওয়াল'র যুদ্ধে ফ্রান্স, স্পেনসহ সহযোগী পাঁচটি রাষ্ট্রের সৈন্যদের পরাজিত করেন। তাদের সেনাপ্রধানসহ হাজার হাজার সৈন্যকে হত্যা করা হয় এবং ১০ হাজারের মতো সৈন্যকে বন্দি করা হয়। অতঃপর আমির আবদুল কারিম খাতাবি শরিআ আইনে তাঁর অধীনস্থ অঞ্চল পরিচালনা করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে ফ্রান্স ও স্পেনের যৌথ হামলায় আমির আবদুল কারিম খাতাবি পরাজয় বরণ করেন এবং তাঁকে ফ্রান্সে পাঠানোর পথে তাঁর সহযোগীরা তাঁকে উদ্ধার করে মিশর নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আর সেখানেই তিনি ১৩৮৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জিহাদি তৎপরতার ধারাবাহিকতায় ১৩৭৫ হিজরিতে মাগরিব স্বাধীন হলেও তাতে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয়ে জাতীয়তাবাদী স্বৈরশাসকদের হাতে ক্ষমতা চলে যায়।

একইভাবে পূর্ব তুর্কিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী চীনের বিরুদ্ধে বহুবার জিহাদি তৎপরতা শুরু হয়। সবচেয়ে ফলদায়ক হয় ১২৮০ হিজরির প্রতিরোধ যুদ্ধ। চীনের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে পাঁচটি অঞ্চলের সমন্বয়ে আতালিক গাযি ইয়াকুব বেকের অধীন ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা হয়; যে আতালিককে তৎকালীন উসমানি খলিফা আমিরুল মুমিনিন উপাধি দিয়েছিলেন। তবে ১২৯৫ হিজরিতে চীন আবারও তা দখল করে নেয়। ১৩৫২ হিজরিতে সাবিত দামুলালার নেতৃত্বে চীনের দখল থেকে পূর্ব তুর্কিস্তান মুক্ত হলেও এক বছরের মাথায় ১৩৫৩ হিজরিতে রাশিয়ার সহযোগিতায় চীন আবারও তা দখল করে নেয়। পরবর্তী সময়ে ১৩৬৮ হিজরিতে কমিউনিস্ট চীনের হিংস্র নেতা মাও সে তুং পূর্ব তুর্কিস্তান চীনের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১৩৬৮ হিজরির ফিলহজ মাসে কমিউনিস্ট

চীনের সামরিক শক্তি পূর্ব তুর্কিস্তানে প্রবেশ করে। আর তারপর থেকে শুরু হয় পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের উপর অত্যাচারের দীর্ঘ ইতিহাস।

তেমনিভাবে মুসলিমদের রক্তপিপাসু সিরিয়ার শিয়া নুসাইরি (আহলে সুন্নাহ ওয়ালজামাআতের ঐকমত্যে যে সম্প্রদায় কাফের) শাসক, জায়েনবাদী ইসরাইলের কাছে ‘জাওলান’ (গোলান মালভূমি) বিক্রেতা হাফেয আসাদের বিরুদ্ধে ১৩৯৩ হিজরিতে শাইখ মারওয়ান হাদিদের নেতৃত্বে জিহাদের তৎপরতা শুরু হয়, যা ১৪০৩ হিজরি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। হিংস্র হাফেয আসাদ মাত্র ১৪ দিনে নারী-শিশুসহ ৫০ হাজারের অধিক মুসলিমকে হত্যা করে এবং ব্যাপক পরিমাণে বন্দি করার পর ২৫ হাজারের অধিককে গুম করে জিহাদি তৎপরতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। হিংস্র কুকুর হাফেয আসাদের পর কুকুরের ছেলে কুকুর বাশশার আসাদও একই পথে অগ্রসর হয়। আহলে সুন্নাহ ওয়ালজামাআতের লক্ষ লক্ষ অনুসারীকে গুম-খুন করে এবং ‘সইদনায়ী’ কারাগারে বন্দি করে তাদের জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলে। তবে শেষ পর্যন্ত ‘হাইআতু তাহরিরিশ শাম’র নেতৃত্বে বাশশার আসাদেরও পতন হয়।^[৭৮] ‘হাইআতু তাহরিরিশ শাম’র শক্তিশালী স্কোয়াড ছিলো উইঘুর মুজাহিদদের। যারা মূলত আরব বীর মুজাহিদ শাইখের দীর্ঘ মেহনতের ফসল এবং বিশ্বময় জিহাদি কাফেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

তেমনিভাবে ওয়াজিরিস্তানে (আফগানিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত) ফরাসি ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিশেষকরে মাহসুদ বংশের হাতে জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু হয়। ইংরেজরা হিন্দুস্তানে উপনিবেশ স্থাপন করলেও ওয়াজিরিস্তানের মুজাহিদগণ বীরত্বের সহিত লড়ে গেছেন। তারা ইংরেজদের শাসন এবং ইংরেজদের বণ্টন; কোনোটিই মেনে নেননি। পাকিস্তানি গান্ধারদের অধীনে তারা কখনো আসেননি,^[৭৯] বরং সর্বযুগেই তারা স্বাধীনভাবে শরিআ আইন বাস্তবায়নের পথে হেঁটেছেন। জিহাদের ময়দানে তাদের অবদান চিরস্মরণীয়। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে পুরোদমে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তালেবানের বিরুদ্ধে বিশ্বসন্ত্রাসীরা ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু করলে বহু মুজাহিদ এখানেই হিজরত করেছেন, আর তারাও পূর্ণমাত্রায় নুসরত করেছেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তালেবান ও আরব মুজাহিদদের জিহাদে ওয়াজিরিস্তানের মুজাহিদগণ; বিশেষকরে দক্ষিণ

[৭৮] মুসলিমদের রক্তপিপাসু হাফেয আসাদ ও তার ছেলে বাশশার আসাদ এবং তাদের পা-চাটা গোলামদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লানত বর্ষিত হোক।

[৭৯] যদিও মাওলানা শাকিবর আহমাদ উসমানি ও মুফতি মুহাম্মাদ শফি; ব্যক্তিত্বের অনুরোধে শরিআ শাসনে পরিচালিত হওয়ার শর্তে তারা পাকিস্তানের অধীনে আসতে সম্মত হন; কিন্তু শর্ত বাস্তবায়ন না হওয়ায় তারা স্বাধীনভাবেই শরিআ শাসনের পথে অগ্রসর হয়েছেন।

ওয়াজিরিস্তানের মাহসুদ বংশের অংশগ্রহণ ও অবদান অতুলনীয়। আফগান জিহাদে ওয়াজিরিস্তানের মুজাহিদ ও মাহসুদ বংশের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বরকতময় ইস্তিহাদি হামলা সংঘটিত হয়েছে। পাকিস্তানের গাদ্দার নাপাক বাহিনী শুরু থেকেই ওয়াজিরিস্তানে শরিআ আইন বাস্তবায়নের পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে চলছে এবং বহুবার চুক্তি ভঙ্গ করে ওয়াজিরিস্তানের মুজাহিদদের উপর হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু মুজাহিদগণ নাপাক বাহিনীকে উপযুক্ত জবাব দিয়ে তাঁদের আদর্শের উপর অবিচল থেকেছেন। জিহাদের ধারাবাহিকতাকে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত এবং পাকিস্তানকে গাদ্দারদের হাত থেকে উদ্ধার করে শরিআ আইন পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জিহাদি কাফেলাকে এক করে ১৪২৮ হিজরির শেষের দিকে বীর মুজাহিদ বাইতুল্লাহ মাহসুদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'তাহরিকে তালেবান পাকিস্তান'। এরপর থেকে তাদের সফলতার ধারা আরো বেগবান হয়। বাইতুল্লাহ মাহসুদের ন্যায় নির্ভীক বীর মুজাহিদ শরিআর বিকল্প কোনো নীতির কাছে মাথা নত করেননি। ১৪৩০ হিজরির শাবান মাসের ১৫ তারিখে ক্রুসেডার আমেরিকার ড্রোন হামলায় ওয়াজিরিস্তানের এই বীর মুজাহিদ সস্ত্রীক শাহাদাতবরণ করেন। বাইতুল্লাহ মাহসুদের শাহাদতে ওয়াজিরিস্তান একজন বীর মুজাহিদকে হারালেও মুজাহিদগণ মনোবল হারাননি। বরং তারা দিনদিন আরো সংঘবদ্ধ হয়েছেন। বিক্ষিপ্ত আরো অনেক জিহাদি কাফেলা তাহরিকে তালেবানে যোগ দেওয়ায় আরো বীরত্বের সহিত তারা অগ্রসর হয়ে চলছেন। দৈনন্দিন পাকিস্তানে গাদ্দার নাপাক বাহিনীর কবর রচিত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন গাদ্দার নাপাক বাহিনীর কবর রচিত হয়ে আফগানিস্তানের ন্যায় পাকিস্তানেও তাহরিকে তালেবানের নেতৃত্বে ইসলামি শরিআর পতাকা পতপত করে উড়বে।

এছাড়াও আরাকান, কাশ্মীরসহ পৃথিবীর বহু ভূখণ্ডে দারুল ইসলাম ও ইসলামের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতিতে উম্মাহর গাইরত সম্পন্ন কাফেলা আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণ অগ্রসর হয়েছেন এবং হয়ে চলছেন। আহদে নববি থেকে খিলাফত পতনের পরও এই 'তাওয়ারাস'র অন্যথা হয়নি। হেরে গেলে আবারও সেই পথেই অগ্রসর হয়েছে, তবুও বিকল্প কিছু চিন্তা করেনি। যেখানেই কুফরি শক্তি থেকে ধার করা বিকল্প কোনো পথ গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানেই শরিআ আইন পুনরুদ্ধারের পরিবর্তে পশ্চিমাদের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

□ ইসলামের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে বিশ্বময় তৎপরতা^[৮০]

উসমানি খিলাফতের পতনের পর যখন পুরো বিশ্ব থেকে ইসলামের কর্তৃত্ব ক্ষীণ হতে শুরু করে এবং একে একে দারুল ইসলামগুলো দারুল হারবে পরিণত হতে থাকে, তখন কর্তৃত্বসম্পন্ন ইমাম না থাকা, পৃথক ভূখণ্ড না থাকা, পর্যাপ্ত শক্তি না থাকা, বিজয় সুনিশ্চিত না হওয়া এবং জিহাদের কারণে ব্যাপকভাবে সাধারণ জনগণের প্রাণহানি ও বসতি ধ্বংসসূত্রে পরিণত হওয়া; এ ধরনের কোনো বাহানার তোয়াক্কা না করে উম্মাহর গাইরত সম্পন্ন কাফেলা আল্লাহর রাস্তার বীর মুজাহিদগণ ইসলামের কর্তৃত্ব ও দারুল ইসলাম পুনরুদ্ধারে 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতি তথা দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের পথে অগ্রসর হয়েছেন; যেমনটি আমরা বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিবরণে দেখেছি। তবে প্রয়োজন ছিলো আধুনিক বিশ্ব কুফরি শক্তির অকল্পনীয় শক্তির মোকাবেলায় এমন নিখুঁত পরিকল্পনা স্থির করা, যার মাধ্যমে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে স্বল্প শক্তি ব্যবহার করে তাদের বড়ো ধরনের ক্ষতিসাধন করে সামনে অগ্রসর হওয়া যায়। আরো প্রয়োজন ছিলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা জিহাদি কাফেলাগুলোকে সুবিন্যস্ত করে বিশ্বময় একই তারতিবের একটি জিহাদি কাফেলা গড়ে তোলা। যদিও ভূখণ্ডের ভিন্নতায় তারতিবের কিছুটা পার্থক্য এবং তাদের মাঝে মাসলাক-মাশরাব ও মাযহাবের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, তবে 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতি গ্রহণ এবং দারুল ইসলাম ও শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মৌলিক কোনো পার্থক্য থাকবে না। এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণে আল্লাহ তাআলা তার বিশেষ রহমতে প্রস্তুত করে দিয়েছেন আরবের এক ধনাঢ্য ব্যক্তিত্বকে, যিনি হিজরি পঞ্চদশ শতকের মুজাদ্দিদ এবং শ্রেষ্ঠতম যাহিদ ও মুজাহিদ হিসেবে উম্মাহর গাইরত সম্পন্ন অংশ ও 'আততায়েফাতুল মানসুরা'র কাছে স্বীকৃত। যিনি ১৩৮৬ হিজরিতে ছোটোকালেই লাগাতার তিন দিন স্বপ্নে দেখেছিলেন, 'তিনি এক প্রশস্ত ময়দানে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ সাদা অশ্বারোহী একটি বাহিনী থেকে জ্বলজ্বলে চোখের অধিকারী এক অশ্বারোহী তাঁর সামনে এসে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করার পর তাঁর দিকে একটি পতাকা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, পতাকাটি মসজিদে আকসার দরজায় খলিফাতুল্লাহ মাহদিকে দেবে। অতঃপর তিনি পতাকাটি হাতে নেন এবং দেখেন, ওই বাহিনী তাঁর পেছনে পেছনে চলতে শুরু করেছে।' যিনি বড়ো হওয়ার পর স্বপ্নের 'বাশারত' অনুযায়ী খলিফাতুল্লাহ মাহদির জন্য কাফেলা

[৮০] এই শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা তথ্যগুলো সাধারণত নেওয়া হয়েছে তারিখে আফগানিস্তান, শাযারাত, আলমোল্লা মুহাম্মাদ উমর ও উমর আযযাম খোরাসানি কর্তৃক রচিত 'সাহরা সে সমন্দর তক' ইত্যাদি কিতাবাদি থেকে।

প্রজ্ঞত করতে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং জায়েনবাদী হিংস্র ইহুদিদের দখল থেকে আকসাকে পুনরুদ্ধার করা জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন। যিনি তাঁর অটেল সম্পদ আল্লাহর রাস্তার জন্য ওয়াকফ করে মাযলুম মুসলিমদের জন্য এবং যেখানেই জিহাদের আওয়াজ উঁচু হয়েছে সেখানেই সহযোগিতা পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। যিনি সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ১৩৯৯ হিজরিতে রাজকীয় পরিবেশ পেছেন ফেলে সুদূর আফগানিস্তানের পাহাড়ি পরিবেশে হিজরত করেছেন। শত্রুর মোকাবেলায় অস্ত্র হাতে বীরত্বের সহিত লড়াই করেছেন; বিশেষকরে ১৪০৭ হিজরিতে জাজি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ বীরত্ব আফগানের বীর মুজাহিদগণ কখনো ভুলতে পারবে না, আবার জিহাদকে সুসংহত করতে এবং মুজাহিদদের জন্য নিজের অটেল সম্পদ ব্যয় করেছেন। যিনি আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়েও মুজাহিদদের জন্য খাদ্যগুদাম ও হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন এবং নিজে বুলডোজার চালিয়ে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করেছিলেন। সুপার পাওয়ার ক্রুসেডার আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করা এই আরব বীর মুজাহিদ শাইখের উপমা তিনি নিজেই।

জিহাদের ঝাঙা বিশ্বময় উঁচু করে কুফরি শক্তিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা ছিলো শাইখের অন্যতম পরিকল্পনা। বলা যায়, জিহাদকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা নিয়ে হিজরি চতুর্দশ শতকের মুজাহিদ শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তা বাস্তবায়ন করতে না পারার অব্যক্ত ব্যথা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, যে বিশ্বময় জিহাদের স্বপ্ন দেখতেন আরব মুজাহিদ শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম, সেটিই বাস্তবায়ন হয়েছে হিজরি পঞ্চদশ শতকের মুজাহিদ আরব বীর মুজাহিদ শাইখের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপে। হাতছাড়া হওয়া দারুল ইসলাম ও শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারে আরব বীর মুজাহিদ শাইখ আহমেদ নববি থেকে চলে আসা ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতি তথা দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের পথেই অগ্রসর হয়েছেন; শরিআ শাসন দুর্বল ও পতনের পর যে পথে চলেছেন সাইয়েদ আহমাদ শহিদ ও মাওলানা শাহ ইসমাইল শহিদসহ অন্যান্য আকাবিরে হিন্দ এবং যে পথে চলেছেন ইমাম শামিল, শাইখ উমর মুখতার, শাইখ ইয়যুদ্দিন আলকাসসাম ও আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদসহ অন্যান্য প্রখ্যাত ও স্বীকৃত বীর মুজাহিদগণ। আকসাকে ইহুদিদের দখল থেকে পুনরুদ্ধার করতে বিশ্ববাসীকে জিহাদের আহ্বান জানিয়েছেন। সাপের মাথা বিশ্বসন্ত্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকাকে প্রধান শত্রু আখ্যা দিয়ে তাদের প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন। ১৩৯৯ হিজরিতে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আফগানিস্তানে হিজরত করেন এবং সেখানে রুশদের

বিরুদ্ধে সরাসরি জিহাদ ও আর্থিক নুসরত প্রদানের পাশাপাশি বিশ্বময় জিহাদের জন্য কাফেলা প্রস্তুত করতে শুরু করেন। ১৪০৯ হিজরিতে সোভিয়েত রাশিয়া পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যাওয়ার পর আফগানের অবস্থা জটিল হয়ে উঠলে তিনি সকলের মাঝে সমঝোতা এবং শরিআ শাসন প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূলে না হওয়ায় তিনি আবার সৌদি আরবে ফিরে যান এবং মিশর, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, ইয়েমেন ও ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে জিহাদি সংগঠনগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা করতে থাকেন। ১৪১০/১১ হিজরির দিকে যখন ইরাক-কুয়েত যুদ্ধকে পুঁজি করে হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে আমেরিকা সেনা পাঠায়, তখন শাইখ জাযিরাতুল আরবে মার্কিন বাহিনীর অবস্থানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং গণজমায়েতে সচেতনমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলিমদের সোচ্চার করে তোলেন। জাযিরাতুল আরবে মার্কিন বাহিনীর অবস্থানের বিরুদ্ধে পাঁচ শতাধিক আলেমের স্বাক্ষরসম্বলিত ফাতাওয়া প্রচারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এসব কর্মকাণ্ডের কারণে সৌদি আরব সরকারিভাবে তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হন। সেখান থেকে পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তানে আসেন। কিন্তু সেখানে তখনও অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে বিরাজমান থাকায় তিনি সুদানে হিজরত করেন। এর পূর্বেও শাইখ সুদানে এসেছিলেন এবং আর্থিকভাবে সুদানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুদানের বাদশাহ বশিরকে শরিআ আইন বাস্তবায়নের আহ্বান জানালে বাদশাহ বশির শাইখের সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সুদানে অবস্থানের পাঁচ বছরে শাইখ তাঁর বিশ্বময় জিহাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আফগানিস্তানের ন্যায় আরেকটি মারকায পেয়ে যান। এ সময়ে শাইখ যেমনিভাবে জিহাদের দাওয়াহ ব্যাপক করতে থাকেন এবং উম্মাহকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন, তেমনিভাবে বিশ্বময় জিহাদের জন্য কাফেলা প্রস্তুত করতে থাকেন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী জায়নবাদী ইহুদি ও তাদের পাহারাদার বিশ্বসন্ত্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে হামলা পরিচালনা করতে থাকেন; যে আমেরিকা আফ্রিকার বহু মুসলিম অধ্যুষিত অংশে সেনা পাঠিয়ে কার্যত দখল করে রেখেছে। শাইখের সেই পাঁচ বছরের মেহনতে বলা যায়, আফ্রিকায় জিহাদ-কিতালের বহু ময়দান তৈরি হয়ে যায় এবং পূর্ব থেকে চলে আসা তৎপরতা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে; যেগুলো দিনদিন অগ্রসর হয়ে চলছে। তবে মার্কিনি ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত সুদানের বাদশাহ বশির শরিআ শাসন প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে ক্রুসেডারদের তোষামোদ করতে লাগল এবং আমেরিকার নির্দেশমতো শাইখকে সুদান ত্যাগ করতে বললো।

সে পরিশ্রান্তে সুদানে পাঁচ বছর অবস্থানের পর শাইখ ১৪১৭ হিজরির প্রথম রাত তথা পয়লা মূহাররমে আফগানিস্তানে আবারও হিজরতের উদ্দেশ্যে বিমানে চড়ে বসেন; হিজরি সালের প্রথম তারিখে হিজরতের বিষয়টি শাইখ 'নেকফালি' হিসেবে নিয়েছিলেন। আফগানিস্তানের জালালাবাদে শাইখের বিমান অবতরণ করে। শাইখ ইউনুস খালিস আরব বীর মুজাহিদ শাইখকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ততোদিনে কাবুলে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদের নেতৃত্বে তালেবানের শরিআ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং জালালাবাদসহ অন্যান্য অংশে তাঁরা তাঁদের শাসন পাকাপোক্ত করে চলছে। জালালাবাদে শাইখের সঙ্গে তালেবান নেতৃবৃন্দ ও পরবর্তী সময়ে আমিরুল মুমিনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং শাইখের শাহাদাত পর্যন্ত জিহাদি তৎপরতার মৌলিক বিষয়াদি আফগানিস্তানের আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে।

শাইখ তাঁর বিশ্বময় জিহাদি তৎপরতা বাস্তবায়নের পুরোনো মারকায় আফগানিস্তানে আবারও হিজরত করে আসার পর বিশ্বময় জিহাদি কর্মকাণ্ডকে আরো বেগবান করতে থাকেন। শাইখ যেহেতু ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, বাইতুল মাকদিসে ইহুদিদের দখলদারিত্ব এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে মার্কিনদের হস্তক্ষেপ মুসলিমবিশ্বের মূল সমস্যা, আর মার্কিন শক্তি খর্ব করা ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে জিহাদ ব্যতীত মার্কিন শক্তি খর্ব করা সম্ভব নয়, তাই তিনি সাপের মাথা বিশ্বসন্ত্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় জিহাদের ঘোষণা দেন। এ পর্বে আফগানিস্তানে হিজরতের কয়েক মাসের মাথায়; অর্থাৎ ১৪১৭ হিজরির রবিউল আখেরের ১২ তারিখে শাইখের পক্ষ থেকে জিহাদের ঘোষণা শিরোনামে তাঁর প্রথম বার্তা প্রকাশ করেন। ওই বক্তব্যে শাইখ মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, তারা যেন অতিসত্বর মুসলিমদের পবিত্র ভূমি ছেড়ে চলে যায়, অন্যথায় রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা মুজাহিদরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হবে। একদিকে আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের পটভূমি তৈরি হতে থাকে, আর অপরদিকে ব্যাপক হতে থাকে বিশ্বময় মার্কিনদের বিরুদ্ধে জিহাদ। পরাশক্তিকে কুপোকাত করার অন্যতম কৌশল গেরিলাযুদ্ধ; শতকের পর শতক ধরে যেটির ধারাবাহিকতা চলছে এবং যে হামলার কাছে বিশ্ব কুফরি শক্তি অসহায় তথা বরকতময় ইস্তিহাদি হামলা; আফগান জিহাদে যে হামলা সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক হয়েছে; মৌলিকভাবে এই দুই অস্ত্র ব্যবহার করে আরব মুজাহিদ শাইখ বিশ্বময় জিহাদের ঝাঙাকে উঁচু করেন এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বিশ্বসন্ত্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকার

মোড়লগিরির টুটি চেপে ধরার পথে অগ্রসর হন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন যুদ্ধ; যেটির কথা আফগানিস্তানের আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে। সে হামলার পর বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা তোরাবোরা পাহাড়ে শাইখের সদলবলে উপস্থিতি জানতে পেরে সর্বাধুনিক সমরপ্রযুক্তি ও পূর্ণ শক্তি নিয়ে ছোটো পাহাড়টি ঘিরে ফেলে। ১৪২২ হিজরির ১৯ রমজান থেকে ২২ রমজান পর্যন্ত আমেরিকা ৫০ এর অধিক বিমান ও ২০টি হেলিকপ্টার ব্যবহার করে প্রায় ৭ লাখ পাউন্ড গোলাবারুদ খরচ করে এবং ১৫ হাজার পাউন্ড ওজনের ডেইজি কাটারের মতো বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লাহর নুসরতে শাইখ তাঁর অধিকাংশ সহযোদ্ধা নিয়ে সেখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই শক্তিশালী হামলায় ১৪ বা ৪০ জন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন। এরপর আমেরিকা দীর্ঘ ১০ বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শাইখকে তালাশ করে বের করতে না পারলেও বিশ্বসন্ত্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকার বিরুদ্ধে শাইখের পরিকল্পনায় বিশ্বময় জিহাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শাইখ যেভাবে দারুল ইসলাম ও শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারে ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছেন, তেমনিভাবে বিশ্বময় জিহাদি কাফেলাকে সে পথেই পরিচালনা করেছেন। শাইখের শাহাদাতের পর বিশ্বময় জিহাদি কাফেলার নেতৃবৃন্দ সে পথেই অগ্রসর হয়েছেন। প্রত্যেক ভূখণ্ডের বাস্তবতা অনুযায়ী পরিকল্পনাকে আরো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করেছেন। একবার ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ উদ্ঘাটন করে নতুনভাবে পরিকল্পনা স্থির করে সামনে এগিয়ে চলছেন। যেখানে দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত ও ইদাদের মাধ্যমে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেখানে চূড়ান্ত মারহালা তথা কিতালের পর্বে কাফেলা অবতরণ করছে, আর যেখানে এখনও কিতালের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি সেখানে দাওয়াহ ও ইদাদের মাধ্যমে পরিস্থিতি তৈরির মেহনত চলছে। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও চূড়ান্ত পর্বে অবতরণ করা হয়নি, বরং জিহাদের দাওয়াতের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততার পরই ব্যাপকভাবে কিতালের পর্বে অবতরণ করা হয়। তবে যেহেতু বিশ্বময় প্রতিরোধ জিহাদ চলমান, সুতরাং ব্যাপকভাবে কিতালের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পূর্বেও তাগুতি শক্তিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখতে প্রয়োজন অনুসারে পরিস্থিতির বিবেচনায় সামর্থ্য অনুযায়ী বিক্ষিপ্ত কিছু হামলা হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক; যা মূলত পরিস্থিতি তৈরির একটি অংশ।

□ 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতিতে শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে

দারুল ইসলাম ও শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারে দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদের পথেই সালাফ অগ্রসর হয়েছেন। পাহাড়সম জটিল পরিস্থিতির সামনেও আকাবিরে আসলাফ শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারে বিকল্প বা বিশ্ব কুফরি শক্তি থেকে ধার করা কিছু চিন্তা করেননি। 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম না থাকা, পৃথক ভূখণ্ড না থাকা, পর্যাপ্ত শক্তি না থাকা, বিজয় সুনিশ্চিত না হওয়া এবং প্রচুর পরিমাণে জনসাধারণের প্রাণহানি ও বসতি ধ্বংসস্বূপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকা; কোনো বাহানাই সালাফের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। সেই 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতিতেই উম্মাহর গাইরত সম্পন্ন অংশ, আল্লাহর রাস্তার বিশ্বময় জিহাদি কাফেলা অগ্রসর হয়ে চলছেন। শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারের এই পদ্ধতির কড়ি যুগ পরম্পরায় আহদে নববির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই পদ্ধতিতে কোনো গোঁজামিল নেই, এই পদ্ধতিতে কোনো 'তাহরিফ' অপব্যাক্যার প্রয়োজন নেই, এই পদ্ধতিতে বিশ্ব কুফরি শক্তির নীতিকে ইসলাম থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করতে অনর্থক চেষ্টার প্রয়োজন নেই, এই পদ্ধতিতে কুফরারদের শেখানো বুলি আওড়ানোর প্রয়োজন নেই, এই পদ্ধতিতে তাগুতদের তোষামোদ করার প্রয়োজন নেই, এই পদ্ধতিতে পশ্চিমাদের সিস্টেমের গোলাম হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই পদ্ধতি বীরত্বের, এই পদ্ধতি মর্যাদার, এই পদ্ধতি বিশ্বসন্ত্রাসী কুফরারদের সুখনিদ্রা হারাম করে দেওয়ার, এই পদ্ধতি পরাশক্তিকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করার, এই পদ্ধতি সিংহের ন্যায় আসা ক্রুসেডারদের বিড়ালের মতো পালাতে বাধ্য করার, এই পদ্ধতি বিজয়ী হয়ে থাকার, এই পদ্ধতি চিরহিতকর, এই পদ্ধতি চিরভাস্বর। এই পদ্ধতিতেই খিলাফত পতনের পর আবারও আফগানিস্তানে শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলসহ আরো বহু অঞ্চলে শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে কাফেলা অস্বাভাবিক সফলতার সহিত অগ্রসর হয়ে চলছে, আলহামদু লিল্লাহ।

দুই. মডারেট ইসলামি রাজনীতি

বিশ্বকর্ত্ত্বে যখন থেকে ইসলামের দাপট হ্রাস পেতে থাকে এবং মানবসভ্যতা শরিআ শাসনের বরকতময় ছায়া থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে, তখন থেকেই পৃথিবী আবারও তার নিকৃষ্টতম পর্বে ফিরে যেতে উদ্যত হয় এবং নব্য জাহেলিয়াতের কালো ছায়া মানবজাতিকে গ্রাস করতে শুরু করে। বিশেষকরে বিশ্ব কুফরি শক্তির হাতে খিলাফাহ পতন ও দারুল ইসলামের সকল ভূখণ্ড দারুল হারবে পরিণত হওয়ার পর পৃথিবী আবারও কুফর-শিরক, অন্যায়-অবিচার ও অশ্লীলতা-বেহায়াপনার ভারে ন্যুজ হয়ে পড়ে। যে ধর্মহীনতা থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন, সে ধর্মহীনতার নতুন মোড়ক ধর্মনিরপেক্ষতার বিষাক্ত ছোবলে মুসলিম পরিচয়ের বৃহৎ অংশ ইমান থেকে বিচ্যুত হতে লাগলো। মানুষকে মানুষের যে দাসত্ব থেকে বের করে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পুরো জীবনকে কুরবান করেছেন, গণতন্ত্র, মানবরচিত আইন ও পুঁজিবাদী হিংস্রতার বেড়া জালে মানুষ আবারও সেই মানুষের দাসেই পরিণত হয়ে চলল। যে আসাবিইয়া-সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে পুরো মুসলিম উম্মাহকে এক দেহের ন্যায় ঘোষণা করেছেন, জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের নামে সেই জাহেলি সাম্প্রদায়িকতা মুসলিম উম্মাহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু কাফেরদের স্বজাতিতে পরিণত করতে লাগলো। এভাবেই একে একে বিশ্ব কুফরি শক্তির আমদানি করা নব্য জাহেলিয়াত মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলোকে কলুষিত করতে শুরু করে।

□ প্রাচ্যবিদদের নখরাঘাত ও মডারেট ইসলামি রাজনীতির সূচনা

বিশ্ব কুফরি শক্তি নব্য জাহেলিয়াতের বিষাক্ত ছোবলে মুসলিম উম্মাহকে আদর্শচ্যুত করতে যে কৌশল অবলম্বন করেছে সেটির দিকে আমরা ইতোপূর্বে ইঙ্গিত করেছি। এই পর্বে কুফরি শক্তি দ্বীনের নামে নিজেদের প্রকাশ করেনি, বরং এবার তারা এসেছে রাজনীতির নামে মুসলিমদের হিতাকাজক্ষীর মুখোশ পরে। তাদের মুখে ছিলো মানবাধিকার-মানবতা, স্বাধীনতা, সমতা ও বিশ্বশান্তির মতো

চটকদার কিছু শব্দ। তারা এবার তাদের সামনে তাদের ধর্মগুরুদের রাখেনি, বরং সামনে রেখেছে মুস্তাশরিকিন-প্রাচ্যবিদ ও তাদের মুসলিম নামধারী শিষ্যদের; যারা আহদে নববি থেকে চলে আসা ইসলামের 'মুতাওয়ারাস' বিষয়াদির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা এবং ইংরেজদের মতাদর্শকে ইসলামি রূপে পেশ করার ক্ষেত্রে খুবই পারদর্শী। মুস্তাশরিকিন-প্রাচ্যবিদ ও তাদের কুপ্রভাবে প্রভাবিত মুসলিম নামধারী মডারেট গবেষকদের নখরাঘাত থেকে যেমনিভাবে তাফসির, হাদিস, সিরাত ও তারিখ রক্ষা পায়নি, তেমনিভাবে 'সিয়াসাতে শারইয়্যাহ'তেও বিষাক্ত আঁচড় কাটতে তারা বিন্দুমাত্র ঝুঁকি করেনি। 'সিয়াসাতুন নাস'র বিষয়াদিকে পশ্চিমা জাহেলিয়াতের সঙ্গে গাঁজামিল দিয়ে মডারেট ইসলামি রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে তারা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। আর বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের আলস্যের সুযোগে প্রাচ্যবিদদের মডারেট চিন্তাধারার বীজ মুসলিম সমাজের অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে। এর চেয়েও দুঃখজনক বিষয় হলো, অনেক বড়ো ব্যক্তিত্ব প্রাচ্যবিদদের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করলেও 'সিয়াসাতুন নাস' সংক্রান্ত অনেক বিষয় বা কিছু বিষয়ে তাঁরা নিজেরাও প্রাচ্যবিদদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হিফায়ত করুন, আমিন।

হিজরি ত্রয়োদশ শতকের শেষ অর্ধাংশ থেকে যখন ব্যাপকভাবে বিশ্ব কুফরি শক্তির হাতে দারুল ইসলামের ভূখণ্ডগুলো ও উসমানি সালতানাতের পতন হতে থাকে এবং ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের দর্শন প্রতিষ্ঠা হতে থাকে, আর অপরদিকে উম্মাহর 'গাইরত'সম্পন্ন কাফেলা তখনও আহদে নববি থেকে চলে আসা 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতি তথা দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের পথে অগ্রসর হয়ে শরিআ শাসন ও দারুল ইসলাম পুনরুদ্ধারের ফরিয়া আঞ্জাম দিতে ব্যস্ত; যেমনটি হিন্দুস্তানে আকাবিরে হিন্দ, আফগানিস্তানে সেখানের জিহাদি কাফেলা, চেচনিয়ায় ইমাম শামিল এবং পরে পরে লিবিয়ায় শাইখ উমর মুখতার, ফিলিস্তিনে শাইখ ইযযুদ্দিন কাসসাম ও অন্যান্য অঞ্চলের জিহাদি কাফেলার অবস্থান আমরা দেখেছি, ঠিক সেই সময় থেকেই মুস্তাশরিকিন-প্রাচ্যবিদদের প্রভাবে প্রভাবিত মুসলিম নামধারী মডারেট গবেষকরা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ধারা-উপধারা এবং জাতীয়তাবাদসহ পশ্চিমাদের বিভিন্ন দর্শনে খুব সূক্ষ্মভাবে ইসলামের রূপ দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়। পরিবর্তিত পৃথিবীতে পরিবর্তিত ইসলামের রূপরেখা দাঁড় করাতে নিজেদের জীবন ব্যয় করতে থাকে। যে মডারেট চিন্তাধারা এক সময় মহামারী আকার ধারণ করে, আর উম্মাহর একাংশ দারুল ইসলাম ও শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারের 'মুতাওয়ারাস'

পদ্ধতি বাদ দিয়ে সেই মরীচিকার পেছনে যুগের পর যুগ ছুটে চলেছে।

‘সিয়াসাতুন নাস’র ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের শিষ্য মডারেট গবেষকদের অন্যান্য হস্তক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত লিখতে স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। আমরা এখানে শুধু প্রসিদ্ধ কয়েকজন প্রাচ্যবিদদের শিষ্য মডারেট গবেষকের কিছু অবস্থান নমুনা হিসেবে সংক্ষেপে তুলে ধরব; যাতে স্পষ্ট হয়ে যায়, শরিআ শাসন ও দারুল ইসলাম পুনরুদ্ধারের ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতির বিপরীতে কারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে পশ্চিমাদের আমদানি করা নব্য জাহেলিয়াতে ইসলামের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং মডারেট ইসলামি রাজনীতি উত্থানের পথ সুগম করেছে।

□ মডারেট গবেষক কর্তৃক গণতন্ত্রের আহ্বান

আমরা পূর্বেও ইঙ্গিত করেছি, যখন আমাদের আকাবিরে হিন্দ তথা হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি, কাসেম নানুতুবি, রশিদ আহমাদ গাজুহি, আহমাদুল্লাহ শাহসহ অন্যান্য আকাবিরে আসলাফ এবং পরে পরে শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি ও অন্যান্য আকাবিরে দেওবন্দসহ বিভিন্ন ভূখণ্ডের জিহাদি কাফেলা ‘মুতাওয়ারাস’ পদ্ধতি তথা দাওয়াহ, হিজরত-নুসরত, ইদাদ ও জিহাদ-কিতালের মাধ্যমে শরিআ শাসন ও দারুল ইসলাম পুনরুদ্ধারের পথে অগ্রসর হয়েছেন, ঠিক তখন থেকে যারা গণতন্ত্রসহ পশ্চিমা দর্শনের প্রতি মুসলিমদের ইতিবাচক মনোভাব তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাদের অন্যতম ছিলেন, সাইয়েদ জামালুদ্দিন আফগানি (১২৫৪-১৩১৫ হি.), মুহাম্মাদ আবদুলহু (১২৬৬-১৩২৩ হি.), মুহাম্মাদ রশিদ রেযা (১২৮২-১৩৫৪) ও আবুল আলা মওদুদী^[৮১] (১৩২১-

[৮১] মাওলানা আবুল আলা মওদুদী সংক্রান্ত কিছু কথা স্পষ্ট করে দেওয়া জরুরি:

এক. মাওলানা আবুল আলা মওদুদী প্রথমদিকে শরিআ শাসন পুনরুদ্ধার, তাগুতের বিরুদ্ধে অবস্থান ও জিহাদ ইত্যাদি বিষয়ে মোটামুটি ভালো ফিকির লালন করতেন; যার কারণে উলামায়ে দেওবন্দের কেউ কেউ তার সঙ্গে দিয়েছিলেন এবং কেউ কেউ প্রশংসা করেছিলেন; যদিও সর্বক্ষেত্রে তার দলিলপদ্ধতির সঙ্গে একমত হওয়া মুশকিল, কিন্তু তিনি কখনো এক আদর্শের উপর অটল থাকতে পারেননি। পাকিস্তান আলাদা হওয়ার পূর্বে পরিপূর্ণ অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন এবং পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান গঠনের বিপক্ষে ছিলেন। (দেখুন: উর্দু ভাষায় রচিত মুন্শি আবদুর রহমান খানের «تیسیر پاکستان اور علماء دینی» ‘তা’মিরে পাকিস্তান আওর উলামায়ে রব্বানি’, পৃ: ১১৯-১২৩)। কিন্তু পাকিস্তান গঠনের পর এতোটাই পাকিস্তানভক্ত দেশপ্রেমিক হয়ে গেছেন এবং পাকিস্তানের শাসক তার কাছে এত স্বীকৃত আমিরুল মুমিনিন হয়ে গেছে যে, মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানিসহ হক্কানি উলামায়ে কেরাম যখন পাকিস্তানের জনগণকে কাশ্মীরের জিহাদে শরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে শাসকের অনুমতির তোয়াক্কা করার প্রয়োজন মনে করেননি, তখন মাওলানা আবুল আলা মওদুদী এটির স্পষ্ট বিরোধিতা করে ঘোষণা দিয়েছেন, পাকিস্তানের মুসলিমদের জন্য কাশ্মীরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা জিহাদের হুকুমে পড়ে না। এ ব্যাপারে মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানির সঙ্গে তার কয়েক বার চিঠি আদান-প্রদান হয়েছে। মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানি দলিল-প্রমাণ দিয়ে উলামায়ে হক্কানির অবস্থানের সঠিকতা স্পষ্ট করেছেন এবং মাওলানা

১৩৯৯ হি.)। মুস্তাশরিকিন-প্রাচ্যবিদ নিয়ে যাদের পড়াশোনা আছে তারা এই নামগুলোর সঙ্গে সম্যক পরিচিত। 'ইস্তিশরাক'র ফিতনায় পতিত হয়ে ইসলামের মডারেট তথা বিকৃতরূপ উম্মাহর সামনে নিয়ে আসার পেছনে এই তথাকথিত গবেষকদের অপতৎপরতার বিষয়টি এখানে নতুন করে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।^[১২] তবে মুহাম্মাদ রশিদ রেযা পরবর্তী সময়ে তার অবস্থান থেকে ফিরে আসার কথা বলা হয়ে থাকে।

যাহোক, ড. আতিয়া আদলান ইসলামের নামে গণতন্ত্রের সমকালীন প্রবক্তাদের নাম উল্লেখ করার পর বলেন,

ودعا إليها من قبل وطالب بها: الداعية المصلح جمال الدين الأفغاني والإمام
الأستاذ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا... (الأحكام الشرعية للنوازل
السياسية لعطية عدلان، ص ١٦٦)

মওদুদিকে তার অবস্থান থেকে 'রুজু' করতে আহ্বান জানিয়েছেন। (বিস্তারিত দেখুন: খুতুবাতে ওয়ামাকতুবাতে উসমানি, পৃ: ২৪৫-২৬০)। পরবর্তী সময়ে নিজেকে পরিপূর্ণ মডারেট গবেষক হিসেবে প্রকাশ করার বিষয়টি প্রসিদ্ধ এবং তার অন্যান্য গোমরাহির আলোচনা সবার কাছে স্পষ্ট। আর তার প্রতিষ্ঠিত দল জামাআতে ইসলামি যে পরে পরে মডারেট দর্শন গ্রহণে তাকেও অতিক্রম করে চলছে, সেটির বাস্তবতা আমরা দৈনন্দিন দেখতে পাচ্ছি। দুই- আরববিশ্ব বা হিন্দুস্তানের বাইরের অনেক গবেষক লেখক যারা মডারেট ইসলামি রাজনীতির বিরোধিতা করেন এবং 'মুতাওয়্যারাস' পদ্ধতির কথাই তুলে ধরেন, তাদের কারো কারো লেখায় মাওলানা মওদুদির উদ্ধৃতি পাওয়া যায় বা তারা তাকে বড়ো ও হক্কানি গবেষক হিসেবে দেখেন। এর মৌলিক কারণ আমার কাছে যেমনটি মনে হয় সেটি হচ্ছে, মাওলানা মওদুদির কিতাবাদি বা পুস্তিকাসমূহ সাধারণত তার অনুসারীরা আরবি ভাষায় অনুবাদ করে বাইরে প্রচার করেছে। এক্ষেত্রে তার প্রথমদিকের ভালো কাজগুলোই বেশি প্রচার করা হয়েছে এবং আরবি করার ক্ষেত্রে মাওলানা মওদুদির আপত্তিকর ভাষ্যকে পরিবর্তন করা হয়েছে। অন্যথায় তার পুরো অবস্থান সামনে আসলে তাকে হক্কানি মনে করে তার কথার উদ্ধৃতি পেশ করার কথা নয়। তাদের অবস্থা বলা যায় হুবহু ড. সায়েদ বাকদাশের ন্যায়। তিনি বিদআতিদের হিন্দুস্তানি ইমাম আহমাদ রেযা খান বেরেলবির জন্য «العلامة الكبير», ইত্যাদির ন্যায় অস্বাভাবিক গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করে তার কথার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, «تكوين» 'তাকবিনুল মাযহাবিল হানাফি', পৃ: ৪২, ৬৩, ৭৫।

তিনি, অনেকে মাওলানা মওদুদী ও সাইয়েদ কুতুব শহিদকে এক পাল্লায় মেপে থাকে। এটা বাস্তব যে সাইয়েদ কুতুব শহিদ প্রথমে মাওলানা মওদুদির দর্শনে প্রভাবিত ছিলেন এবং মাওলানা মওদুদিকে তার ফিকরিগুরু মনে করতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি মাওলানা মওদুদির অনেক দর্শন থেকে ফিরে এসেছেন। আমরা এই দাবি করছি না, পরবর্তী সময়ে সাইয়েদ কুতুব শহিদের কোনো 'শায' অবস্থান ছিলো না। তবে এটি বাস্তব, সাইয়েদ কুতুব শহিদ তার পূর্বের অনেক অবস্থান থেকে ফিরে এসেছেন। মোটকথা, মাওলানা মওদুদী প্রথমে অনেকটা সহিহ ফিকিরের উপর ছিলেন, পরবর্তী সময়ে মডারেটদের কাতারে शामिल হয়েছেন। আর সাইয়েদ কুতুব শহিদ প্রথমে মডারেট চিন্তায় প্রভাবিত ছিলেন, পরবর্তী সময়ে সহিহ ফিকিরের দিকে ফিরে এসেছেন।

[৮২] এই কয়েকজন মডারেট হিসেবে প্রসিদ্ধ হওয়ায় তাদের অবস্থান তুলে ধরেছি। অন্যথায় তাদের পূর্বে ও পরে বহু মডারেট গবেষক একই পথে চলেছে। কিছু ক্ষেত্রে অন্যদের উদ্ধৃতিও উল্লেখ হবে, ইনশাআল্লাহ।

“ইতোপূর্বে গণতন্ত্রের প্রতি আহ্বান করেছেন এবং সেটির দাবি তুলেছেন সংস্কারক দায়ি জামালুদ্দিন আফগানি, ইমাম উস্তায মুহাম্মাদ আবদুল ও শাইখ মুহাম্মাদ রশিদ রেযা...”^[৮৩]

সাইয়েদ জামালুদ্দিন আফগানি ১৩০১ হিজরি থেকে "العروة الوثقى" 'আলউরওয়াতুল উসকা' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে মডারেট চিন্তাধারা প্রচার করতে শুরু করেন। উক্ত পত্রিকাসহ বিভিন্ন রিসালা ও প্রবন্ধে তিনি সূক্ষ্মভাবে গণতন্ত্রে ইসলামের রূপ দিতে থাকেন এবং গণতন্ত্রের প্রতি মুসলিমদের ইতিবাচক মনোভাব তৈরির প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। নমুনা হিসেবে আমরা দেখতে পারি, 'আররাসায়েল ওয়ালমাকালাত', ১/৫৫-৬৪ এবং 'আলউরওয়াতুল উসকা'র ভূমিকায় তার ব্যাপারে মন্তব্য, পৃ: ৪০। তেমনি তার শিষ্য মুহাম্মাদ আবদুল একই পথে চলেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পারি, 'আলআ'মালুল কামেলা' ১/৩০৭-৩১২, ১/৩৪১-৩৪২। একইভাবে মুহাম্মাদ আবদুলের শিষ্য মুহাম্মাদ রশিদ রেযা তার গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাফসিরে মানারের একাধিক জায়গায় তিনি গণতন্ত্রকে ইসলামি রূপে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি ইংরেজদের আইন-কানুনকে ইসলামি শরিআতের নিকটবর্তী আখ্যা দিতেও কুঠাবোধ করেননি। ইংরেজদের অধীনে মুসলিমদের জন্য রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার এক পর্যায়ে বলেন,

والمعروف أن قوانين هذه الدولة (القوانين الإنكليزية في الهند) أقرب إلى الشريعة الإسلامية من غيرها. (تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، ٤٠٩/٦، فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، ٢٣٥/١)

“আর জানা কথা যে, হিন্দুস্তানে ইংরেজদের আইন-কানুন অন্যদের আইনের তুলনায় ইসলামি শরিআতের অধিক নিকটবর্তী।”^[৮৪]

প্রাচ্যবিদদের শিষ্য মডারেট গবেষকদের পথেই হেঁটেছেন আবুল আলা মওদুদিও। মডারেট ইসলামি রাজনীতিকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে গণতন্ত্রের গায়ে ইসলামি পোশাক পরিয়ে নাম দিয়েছেন 'জুমহুরি খিলাফত' তথা গণতান্ত্রিক খিলাফত। পশ্চিমা গণতন্ত্র আর গণতান্ত্রিক খিলাফতের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করলেও মূলত পশ্চিমা একটি মতবাদে সূক্ষ্মভাবে ইসলামের রূপ দেওয়া

[৮৩] আলআহকামুশ শারইয়্যা, পৃ: ১৬৬

[৮৪] তাফসিরে মানার, ৬/৪০৯, ফাতাওয়া মুহাম্মাদ রশিদ রেযা, ১/২৩৫

হয়েছে। দেখুন, তার 'ইসলামি দৃষ্টির কি তাৎপৰ্য' পুস্তিকার 'জুমহুরি খিলাফত' শিরোনামের বক্তব্য, পৃ: ১৮-১৯।

প্রাচ্যবিদদের শিষ্য এই মডারেট গবেষকদের পূর্বে আমার জানামতে কেউ গণতন্ত্রের গায়ে ইসলামের পোশাক পরানোর চেষ্টা করেননি। বরং বিপরীতে আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের সংঘাত এবং গণতন্ত্রের ভয়ংকর দিক ও অসারতার কথা তুলে ধরে উম্মাহকে গণতন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। গণতন্ত্রের ব্যাপারে আকাবিরে দেওবন্দের বক্তব্যগুলো আমরা 'মুসলিমবিশ্ব ও সমকালীন মাসায়েল' (পৃ: ১৩৯-১৫০) গ্রন্থ থেকে দেখে নিতে পারি।

□ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে শুরা আখ্যা দেওয়া

প্রাচ্যবিদদের শিষ্য মডারেট গবেষকের দল গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিটি ধারা-উপধারায় ইসলামের রূপ দেওয়ার চেষ্টায় ক্রটি করেনি। তারই ধারাবাহিকতায় তারা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে শুরার একটি পদ্ধতি আখ্যা দিয়েছে। ড. ফাহাদ ইবনে সালেহ আলআজলান বলেন,

إن الشورى تجيز الأخذ بالانتخابات طريقة من طرائق الشورى، وإليه ذهب محمد رشيد رضا والمودودي وكثير من المعاصرين. (الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي لفهد بن صالح بن عبد العزيز العجلان، ص ৫২)

“শুরার একটি পদ্ধতি হিসেবে নির্বাচন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা বৈধ। এই পক্ষে মত দিয়েছেন মুহাম্মাদ রশিদ রেযা, মওদুদি ও সমকালীন অনেকে।”^[৮৫]

মুহাম্মাদ রশিদ রেযা অনেক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে শুরার একটি পদ্ধতি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আমরা তার একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। শুরার উদ্দেশ্য আলোচনার এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

فإذا أمكن ذلك بغير تشاور بين أهل الحل والعقد كأن جعلوا ذلك بالانتخاب المعروف الآن في الحكومة الجمهورية وما هو في معناها حصل المقصود. (تفسير المنار، ২/৪)

[৮৫] আলইনতিখাবাত ওয়াআহকামুহা, পৃ: ৫২

“যদি আহলুল হাদি ওয়ালআকদের পরামর্শ ব্যতীত তা সম্ভব হয়; যেমন বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত নির্বাচন প্রক্রিয়া বা এ জাতীয় কোনো মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, তাহলে (শুরার) উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়।”^[৮৬]

মুহাম্মাদ রশিদ রেযা কর্তৃক গণতন্ত্রকে শুরা হিসেবে উপস্থাপন করার নমুনা হিসেবে আমরা দেখতে পারি, ‘তাফসিরে মানার’ ৪/৪৬, ৪/২০০-২০৫, ফাতাওয়া মুহাম্মাদ রশিদ রেযা, ৩/৮০৬-৮১১। একই পথে চলেছেন আবুল আলা মওদুদিও। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে শুরা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। তার ‘ইসলামি দুম্বর কি তাদবিন’ (পৃ: ২১, ২৫-২৯, ৩০-৩৩) থেকে তার বক্তব্যগুলো আমরা দেখে নিতে পারি।

এই মডারেট গবেষকদের থেকেই গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে শুরা আখ্যা দেওয়ার সূচনা হয়। বিপরীতে হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলি থানবি এটিকে নির্বুদ্ধিতা আখ্যা দিয়েছেন এবং অন্যান্য আকাবিরে দেওবন্দও এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। বিস্তারিত দেখুন, ‘মুসলিমবিশ্ব ও সমকালীন মাসায়েল’ (পৃ: ১৫৩-১৬২)।

□ জিহাদকে শুধু আত্মরক্ষায় সীমাবদ্ধ করা

প্রাচ্যবিদদের শিষ্য মডারেট গবেষকের দল একদিকে পশ্চিমা দর্শনকে ইসলামের পোশাকে উপস্থাপন করার পেছনে জীবন ব্যয় করেছে, অপরদিকে পশ্চিমাসহ পুরো বিশ্বের উপর ইসলামকে কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করার মাধ্যম, ইমানের পর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল ও ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে নিষ্প্রাণ করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি করেনি। আহদে নববি থেকে চলে আসা জিহাদ-কিতালের ‘আমলে মুতাওয়ারাস’ ও ‘ফিকরে মুতাওয়ারাস’র বিপরীতে পশ্চিমাদের অনুকূলে চলা এই মডারেট গবেষকের দল জিহাদকে শুধু নিজেদের উপর আসা আক্রমণ প্রতিহত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। আফসোসের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে নিজেকে দেওবন্দিয়াতের দিকে নিসবত করা কেউ কেউ পশ্চিমা অপপ্রচারে ভীতিবিহ্বল হয়ে জিহাদকে প্রকারের উপর প্রকার করে ইনিয়ে বিনিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যা ‘আবনাউল মুস্তাশরিকিন’র মডারেট গবেষণার সমার্থক।

যাহোক, ড. আলি ইবনে নাবি‘ আলউলইয়ানি তাঁর ‘আহাম্মিয়াতুল জিহাদ’^[৮৭]

[৮৬] তাফসিরে মানার, ৪/২০৩

[৮৭] এই কিতাবে এই বিষয়ের সুন্দরতম কিতাব আখ্যা দিয়ে মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি বলেন,

কিতাবে বলেন,

ابتدع تلاميذ المستشرقين ومن سار على نهجهم بدعة منكورة تخالف الكتاب العزيز والسنة الصحيحة واجتماع سلف الأمة، وهذه البدعة هي أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط، وإن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا الكفار لأجل إخضاعهم لسلطان الإسلام وإعلاء كلمة الله على كلمتهم، إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء على المسلمين، وهذه البدعة المنكرة لم يقلها أحد من علماء المسلمين المعبرين، وأول ما ظهرت - على ما أعلم - على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة التي من أشهر رجالها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا. (أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية لعللي بن نفيع العلياني، ص ٣١٨)

“প্রাচ্যবিদদের শিষ্য ও যারা তাদের পথে চলেছে তারা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে সহিহা ও সালাফের ইজমার বিপরীতে এক নিকৃষ্ট বিদআতের প্রচলন ঘটিয়েছে। আর তা হচ্ছে, ইসলামে জিহাদ শুধু প্রতিরক্ষার জন্য। সুতরাং কাফেরদের ইসলামের কর্তৃত্বের অনুসারী করা এবং তাদের কথার উপর আল্লাহর বাণী উঁচু করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েজ হবে না। হ্যাঁ! কাফেররা যদি মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে বসে (তখন আত্মরক্ষামূলক জিহাদ করা জায়েজ হবে)। গ্রহণযোগ্য কোনো আলিম এই নিকৃষ্ট বিদআতের কথা বলেননি। আমার জানামতে সর্বপ্রথম এটি প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক বুদ্ধিভিত্তিক মতাদর্শের ছাত্রদের মাধ্যমে; যাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন, জামালুদ্দিন আফগানি, মুহাম্মাদ আবদুল ও রশিদ রেযা।”[৮৮]

মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি বলেন,

وقد كتب فيها عدة علماء كتباً مستقلة، من أراد التفصيل راجعها، ومن أحسن ما ألف في هذا الموضوع كتابان: الأول: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» للدكتور علي بن نفيع العلياني..... (تكملة فتح الملهم للمفتي محمد تقي العثماني، كتاب الجهاد والسير، ١٢/٣)

“এই বিষয়ে কয়েকজন আলেম স্বতন্ত্র কিতাবাদি রচনা করেছেন। যে বিস্তারিত জানতে চায় এগুলো দেখে নিতে পারে। এ বিষয়ে লিখিত কিতাবাদির মধ্যে অন্যতম সুন্দর দু’টি কিতাব; প্রথমটি হলো, ড. আলি ইবনে নাফি‘ আলউলইয়ানির ‘আহাম্মিয়াতুল জিহাদ ফি নাশরিদ দাওয়াতিল ইসলামিয়া.....’ (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/১২)

[৮৮] আহাম্মিয়াতুল জিহাদ, পৃ: ৩১৮

কল মা ডকরনা মন হকীকাতুল জাহাদ ও অহকামহ ও অহদাফহ মাস্তাবত মন আল-কুরআন ও السنه ও اقوال السلف الصالحين، وهو الذي ظل المسلمون يعتقدونه في أمر الجهاد و يعملون بمقتضاه طوال ثلاثة عشر قرناً من تاريخهم، وصارت مشروعية الجهاد بأقسامه كلمة إجماع فيما بينهم، لم يختلف فيه اثنان ولا ظهر فيه رأيان.

ولكن ظهر في القرن الرابع عشر رجال أرادوا تطبيق الإسلام على النظريات والأفكار الغربية، فحاولوا في كثير من المسائل أن يبتدعوا في الفقه الإسلامي آراء موافقة لأهواء أهل الغرب، ويلقموها في فم النصوص الشرعية كرهاً؛ إرضاء للمستعمرين والمستشرقين، وتناسوا قول الله سبحانه: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى.

فابتدع هؤلاء في أمر الجهاد بدعة لا سلف لهم فيها، وهي أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط، وإن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا الكفار لأجل إخضاعهم لسلطان الإسلام وإعلاء كلمة الله على كلمتهم، إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء على المسلمين.

وأول ما ظهر هذا الرأي المبتدع - فيما نعلم - على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة التي من أشهر رجالها المفتي محمد عبده ورشيد رضا وجمال الدين الأفغاني من البلاد العربية، وسر سيد أحمد خان وجرارغ علي وأمثالهما في الهند، وقد حذا حذوهم في هذه المسألة الأستاذ شبلي النعماني صاحب "سيرة النبي ﷺ" أيضاً، وقد تأثر بهذا الرأي المبتدع كثير من الكتاب المعاصرين في البلاد الإسلامية. (تكملة فتح الملهم للمفتي محمد تقي العثماني، كتاب الجهاد والسير، ١/٣)

“জিহাদের বাস্তবতা, বিধিবিধান ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সংক্রান্ত যা উল্লেখ করেছি; সবই কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালাহিনের ব্যাখ্যা থেকে বের করা। মুসলিমরা তাদের ইতিহাসের দীর্ঘ তেরো শতক ধরে জিহাদের ব্যাপারে এমনটিই ধারণা

করে আসছে এবং সে অনুযায়ী আমল করে চলছে। সকল প্রকারের জিহাদের বৈধতার ব্যাপারে তারা একমত। এ ব্যাপারে কেউ মতানৈক্য করেনি এবং ভিন্ন কোনো মত প্রকাশ পায়নি।

কিন্তু চতুর্দশ শতকে এসে কিছু লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা পশ্চিমা ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে। তারা বহু মাসাআলায় ফিকহে ইসলামির ক্ষেত্রে এমন কিছু মত উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছে যেগুলো পশ্চিমাদের চাওয়ার অনুকূলে এবং ঔপনিবেশিক ও প্রাচ্যবিদদের খুশি করতে সে সকল মত শরয়ি 'নুসুস'র মুখে জোরপূর্বক পুরে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তারা ভুলে গেছে আল্লাহ তাআলার বাণী 'আর ইহুদি ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না; যতোক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করো। বলো, নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত'।

তারা জিহাদের ব্যাপারে এমন এক বিদআত উদ্ভাবন করেছে যা পূর্বের কেউ বলেননি। আর তা হচ্ছে, ইসলামে জিহাদ শুধু প্রতিরক্ষার জন্য। সুতরাং কাফেরদের ইসলামের কর্তৃত্বের অনুসারী করা এবং তাদের কথার উপর আল্লাহর বাণী উঁচু করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েজ হবে না। হ্যাঁ! কাফেররা যদি মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে বসে (তখন আত্মরক্ষামূলক জিহাদ করা জায়েজ হবে)। আমাদের জানামতে সর্বপ্রথম এই বিদআতি মত প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক বুদ্ধিভিত্তিক মতাদর্শের ছাত্রদের মাধ্যমে; যাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে আরববিশ্ব থেকে আছেন, মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহ, রশিদ রেযা ও জামালুদ্দিন আফগানি এবং হিন্দুস্তানে আছেন স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান ও চেরাগ আলি প্রমুখ। এই মাসাআলায় 'সিরাতুন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' গ্রন্থের লেখক উস্তায শিবলি নুমানিও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং ইসলামি ভূখণ্ডের সমকালীন বহু লেখক এই বিদআতি মতের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে।^[৮৯]

এবার আমরা মুহাম্মাদ আবদুহর একটি বক্তব্য দেখতে পারি যা তার শিষ্য মুহাম্মাদ রশিদ রেযা তাফসিরে মানারে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ আবদুহ বলেন,

فقتال النبي ﷺ كله كان مدافعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق، ولذلك كان تقديم الدعوة شرطاً لجواز القتال، وإنما تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان، فإذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو قتل

[৮৯] তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসিয়ার, ৩/১০

فعلينا أن نقاتل لحماية الدعوة ونشر الدعوة لا للإكراه على الدين، فالله تعالى يقول: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"، ويقول: "أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ"، وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤدي الدعوة أو يقتلهم أو يهدد الأمن ويعتدي على المؤمنين، فالله تعالى لا يفرض علينا القتال لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح، ولا لأجل الطمع في الكسب.

ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل حماية الدعوة ومنع المسلمين من تغلب الظالمين لا لأجل العدوان، فالروم كانوا يعتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت حوزة الإسلام ويؤذونهم، وأولياؤهم من العرب المنتصرة من يظفرون به من المسلمين، وكان الفرس أشد إيذاء للمؤمنين منهم، فقد مزقوا كتاب النبي ﷺ ورفضوا دعوته وهددوا رسوله وكذلك كانوا يفعلون، وما كان بعد ذلك من الفتوحات الإسلامية اقتضته طبيعة الملك، ولم يكن كله موافقاً لأحكام الدين، فإن من طبيعة الكون أن يبسط القوي يده على جاره الضعيف، ولم تعرف أمة قوية أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربية، شهد لها علماء الإفرنج بذلك. وجملة القول في القتال أنه شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها.

(تفسير المنار، ٥١٢/٢-٦١٢)

“রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কিতাল ছিলো হক ও আহলে হক থেকে আক্রমণ প্রতিহত করা এবং হকের দাওয়াহকে রক্ষা করার জন্য। এজন্যই কিতাল বৈধ হওয়ার জন্য প্রথমে দাওয়াহ প্রদান করা শর্ত। আর দাওয়াহ হয় দলিল-প্রমাণ দ্বারা, তরবারি ও বর্শার মাধ্যমে নয়। যদি দায়িকে হুমকি দিয়ে বা হত্যা করে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে দাওয়াহ থেকে বিরত রাখা হয়, তখন দ্বীনকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার জন্য নয়, বরং দাঈদের রক্ষা ও দাওয়াতের প্রচারকে নির্বিল্ল করতে আমাদের উপর কিতাল আবশ্যিক হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে’। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ‘তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করবে, যাতে তারা মুমিন হয়?’

যদি দাওয়াহকে বাধাগ্রস্ত করা ও দাঈদের কষ্ট দেওয়া বা হত্যা করা अपना শক্তি বিঘ্নিত করা বা মুমিনদের উপর অত্যাচার করার মতো কাউকে পাওয়া না যায়, তখন আল্লাহ তাআলা রক্তপাত ও প্রাণহানির জন্য এবং কিছু প্রাপ্তির লোভে আমাদের উপর কিতাল ফরয করেননি।

প্রথম যুগে সাহাবায়ে কেরামের যুদ্ধগুলো শত্রুতামূলক নয়, বরং দাওয়াহকে রক্ষা ও মুসলিমদের উপর অত্যাচারীদের চেপে বসাকে প্রতিহত করার জন্য ছিল। রোমানরা ইসলামের আয়ত্তে আসা আরব ভূখণ্ডের সীমান্তে অত্যাচার করতো ও তাদের কষ্ট দিতো এবং রোমানদের আরব খ্রিষ্টান বন্ধুরা কারও ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারলে তাকে কষ্ট দিতো। পারস্যের লোকেরা রোমানদের চেয়েও মুমিনদের বেশি কষ্ট দিতো। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি টুকরো টুকরো করেছে, তাঁর দাওয়াহকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁর দূতকে হুমকি দিয়েছে। তারা এমনই করতো। পরবর্তী ইসলামি বিজয়গুলো ছিলো বাদশাহদের স্বভাবজাত দাবি অনুযায়ী; যেগুলোর সব দ্বীনের বিধান অনুসারে ছিলো না। কেননা পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে, শক্তিশালী তার দুর্বল প্রতিবেশীর উপর হস্তক্ষেপ করা। বিজয়ের পর দুর্বলদের সঙ্গে সর্বোচ্চ দয়ার আচরণ করার ক্ষেত্রে আরব জাতির পরিবর্তে কোনো শক্তিশালী জাতির নমুনা কেউ পেশ করতে পারবে না। ইউরোপীয় গবেষকরাও এটির সাক্ষ্য দিয়েছে। মোটকথা, হক ও আহলে হক থেকে আক্রমণ প্রতিহত করা এবং দাওয়াহ ও দাওয়াতের প্রচারকে রক্ষা করার জন্যই কিতালের বৈধতা দেওয়া হয়েছে।”^[৯০]

মুহাম্মাদ আবদুহ তার ‘আলইসলাম ওয়াননাসরানিয়া’ গ্রন্থে বলেন,

ليس القتل في طبيعة الإسلام، بل في طبيعته العفو والمسامحة، "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"، ولكن القتال فيه لرد اعتداء المعتدين على الحق وأهله إلى أن يأمن شرهم ويضمن السلامة من غوائلهم، ولم يكن ذلك للإكراه على الدين ولا للانتقام من مخالفه. (الإسلام والنصرانية لمحمد عبده، ص ٣٨)

“ইসলামের প্রকৃতিতে হত্যা নেই, বরং ইসলামের মেজাজ হচ্ছে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা। ‘তুমি ক্ষমা প্রদর্শন করো এবং ভালো কাজের আদেশ দাও, আর

[৯০] তাফসিরে মানার, ২/২১৫-২১৬

মুর্খদের থেকে বিমুখ থাকো'। কিন্তু তাতে কিতালের বিধান রাখা হয়েছে শুধু হক ও আহলে হক থেকে সীমালঙ্ঘনকারীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য; তাদের অনিষ্ট ও ধ্বংসাত্মক আচরণ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত। দ্বীনকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া এবং ইসলাম বিরোধীদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নয়।^[১১]

মুহাম্মাদ রশিদ রেযা তার গুরুত্ব পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু ক্ষেত্রে এই বিদআতি মত প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, তাফসিরে মানার, ১০/৩৩২, ফাতাওয়া মুহাম্মাদ রশিদ রেযা, ২/৫৭৫-৫৭৬, ৩/১১৫৪-১১৫৭।

□ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জিহাদের ভূমিকা অস্বীকার করা

দাওয়াতের চূড়ান্ত পর্বই হচ্ছে জিহাদ-কিতাল। ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় একটির গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে অপরটিকে খাটো করার কোনো সুযোগ নেই এবং আমাদের সালাফে সালেহিন এমনটি করেননি। আমার জানামতে মুস্তাশরিকিন-প্রাচ্যবিদরা এ জাতীয় ধারণার সূচনা করেছে, আর তাদের শিষ্য ও ফিকরি সন্তান মুসলিম নামধারী মডারেট গবেষকরা তোতা পাখির মতো সে সকল বুলি আওড়িয়ে চলছে। মুহাম্মাদ আবদুহ কতৃক ইসলাম প্রচারে জিহাদ-কিতালের অবদান অস্বীকারের বিষয়টি আমরা তাফসিরে মানার থেকে উদ্ধৃত তার উপর্যুক্ত বক্তব্যে দেখেছি। ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় জিহাদ-কিতালের ভূমিকা অস্বীকার করে মুহাম্মাদ রশিদ রেযা বলেন,

أما كون الإسلام قام بالدعوة لا بالسيف، فهذا قطعي لا ريب فيه. وأما الحديث (أمرت أن أقاتل الناس...) فقد ورد في مشركي العرب الذين لم تقبل منهم الجزية بعد الإذن بقتالهم، وما أذن للمسلمين بقتالهم إلا بعد أن آذوا النبي ومن معه، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، وقعدوا لهم كل مرصد ووقفوا في سبيل الدعوة، فلم يكن الإذن إلا للدفاع عن الحق وحماية الدعوة. كما بيناه مراراً. (فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، ৫/২)

“ইসলাম তরবারি দ্বারা নয়, বরং দাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হয়েছে; এটি এমন এক অকাট্য বাস্তবতা যাতে সন্দেহের সুযোগ নেই। আর হাদিস

(কাফেরদের বিরুদ্ধে আমি কিতালে আদিষ্ট হয়েছি; যতোক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে...); তা তো আরবের মুশরিকদের জন্য। যাদের বিরুদ্ধে কিতালের অনুমতি দেওয়ার পর 'জিয়য়া' গ্রহণ করা হয়নি। আর তাদের বিরুদ্ধেও কিতালের অনুমতি দেওয়া হয়েছে নবি ও তাঁর সঙ্গীদেরকে কষ্ট দেওয়ার পর। তারা তাঁদেরকে তাঁদের ভূমি ও সম্পদ থেকে বের করে দিয়েছে, প্রতিটি ঘাঁটিতে তাঁদের বিরুদ্ধে ওত পেতে বসে থেকেছে এবং দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে অবস্থান করেছে। তো এই অনুমতি একমাত্র হক থেকে আক্রমণ প্রতিহত ও দাওয়াহ রক্ষা করার জন্য ছিল। যেমনটি আমরা বারবার স্পষ্ট করেছি।"^{১২২}

মুহাম্মাদ রশিদ রেযা তার 'আলমানার' পত্রিকার মাধ্যমেও এই অবাস্তব ধারণা প্রচার করেছেন। "الدعوة حياة الأديان" শিরোনামের অধীনে একটি শাখা শিরোনাম উল্লেখ করেছেন, "الإسلام انتشر بالدعوة لا بالسيف" (ইসলাম তরবারি দ্বারা নয়, বরং দাওয়াতের মাধ্যমে প্রচার হয়েছে) এবং এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দেখুন, মাজাল্লাতুল মানার, ৩/৪৫৭-৪৬৩।

মূলত জিহাদকে নিষ্প্রাণ করতে তাদের গুরু মুস্তাশরিকিন-প্রাচ্যবিদদের থেকে এই সবকিছু তারা গ্রহণ করেছে। ইসলাম নিয়ে গবেষণা ও ইসলামের মাহাত্ম্য তুলে ধরার নামে প্রাচ্যবিদরা এই বিষাক্ত কীটগুলো মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফরাসি ইতিহাসবেত্তা মুস্তাশরিক-প্রাচ্যবিদ 'গুস্তাভ লে বন' (১২৫৭-১৩৫০ হি.) তার 'The Civilization Of The Arabs' (দ্যা সিভিলাইজেশন অব দ্যা অ্যারাবস) গ্রন্থে; যেটি "حضارة العرب" নামে আরবিতে অনুবাদ হয়েছে, তাতে 'ইসলাম তরবারি দ্বারা নয়, বরং দাওয়াতের মাধ্যমে প্রচার হয়েছে'; বিষয়টি প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। গুস্তাভ লে বন^{১২৩} উল্লিখিত গ্রন্থে বলে,

وسيرى القاري حين نبحث في فتوح العرب وأسباب انتصاراتهم، أن القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحراراً في أديانهم.....

ولم ينتشر القرآن بالسيف إذن، بل انتشر بالدعوة وحدها... (حضارة

[১২] ফাতাওয়া মুহাম্মাদ রশিদ রেযা, ২/৫৭৫

[১৩] মুহাম্মাদ রশিদ রেযা খুব গুরুত্বের সহিত তার উদ্ধৃতি পেশ করেন। দেখুন: ফাতাওয়া মুহাম্মাদ রশিদ রেযা, ৩/১১৫৬।

العرب لغوستاف لوبون، ص ١٣١)

“আমরা যখন আরবদের বিজয় ও বিজয়ের কারণ নিয়ে আলোচনা করবো তখন পাঠক দেখতে পাবে যে, কুরআন প্রচারের ক্ষেত্রে শক্তির কোনো ভূমিকা ছিলো না। আরবরা পরাজিতদের তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছেড়ে দিত...। সুতরাং তরবারি দ্বারা কুরআন প্রচার হয়নি, বরং শুধু দাওয়াতের মাধ্যমেই তা প্রচার হয়েছে।”^[৯৪]

আরেক প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মুস্তাশরিক-প্রাচ্যবিদ টমাস আরনল্ড (১২৮০-১৩৪৯ হি.) ‘The Preaching Of Islam’ (দ্যা প্রিচিং অব ইসলাম) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছে; যেটি “الدعوة إلى الإسلام” নামে আরবিতে অনুবাদ হয়েছে। এই দুষ্কর্মা গ্রন্থটি রচনাই করেছে মুসলিমদের অন্তর থেকে জিহাদি প্রেরণাকে মুছে দিতে। টমাস আরনল্ড ও তার গ্রন্থ সম্পর্কে ড. আলি ইবনে নাবি আলউলইয়ানি বলেন,

ومن أشهر هؤلاء المستشرق الخبيث توماس أرنولد الذي ألف كتاباً بعنوان “الدعوة إلى الإسلام”، يهدف منه إلى إماتة الروح الجهادية عند المسلمين، ومن يقرأ كتابه سالف الذكر يرى أنه حريص على تصيد الأخبار الموضوعة والواهية لكي يبرهن بأن الإسلام لم ينتشر بالجهاد، وإنما انتشر بالدعوة السلمية المتبرئة من كل قوة وانتشر بالموالاة بين المسلمين والكافرين... (أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية، ص ١٦٢)

“তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম হচ্ছে দুষ্কর্মা মুস্তাশরিক টমাস আরনল্ড। মুসলিমদের অন্তর থেকে জিহাদি প্রেরণা মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ‘আদদাওয়াহ ইলাল ইসলাম’ নামে সে একটি গ্রন্থ রচনা করেছে। যে তার উক্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করবে সে দেখবে, টমাস মাওয়ু-জাল হাদিস উল্লেখ করতে খুব উৎসাহী; যাতে এটা প্রমাণ করতে পারে যে, ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে প্রচার হয়নি, বরং সব ধরনের শক্তিমুক্ত শান্তিপূর্ণ দাওয়াহ এবং মুসলমান ও কাফেরের মাঝে বন্ধুত্বের মাধ্যমে প্রচার হয়েছে...।”^[৯৫]

[৯৪] হযারাতুল আরাব, পৃ: ১৩৪

[৯৫] আহাম্মিয়াতুল জিহাদ, পৃ: ২৬১

□ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তঃধর্মীয় ঐক্য ও ইন্টারফেইথের আহ্বান

মুসলিম উম্মাহর মানসিকতায় জিহাদকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে এবং দীনকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ করে ইসলামি শরিআর কর্তৃত্বকে গুরুত্বহীন করে দিতে বিশ্ব কুফরি শক্তি যে সকল দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছে, তার মধ্যে একটি ভয়ংকর ইমান বিধ্বংসী দর্শন হচ্ছে ‘তাওহিদুল আদইয়ান’, আন্তঃধর্মীয় ঐক্য ও ইন্টারফেইথ; যা মূলত সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতার সমার্থক। পার্থক্য হচ্ছে, সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতা সাধারণত দাড়ি-টুপি বিহীন লোকদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, আর ইন্টারফেইথে অংশগ্রহণ করছেন পোশাক-পরিচ্ছদে ইসলামি স্কলার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুফতি-মুহাদিসগণ। এই দর্শন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই হচ্ছে, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীকে অন্য ধর্মের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন করে তোলা, প্রত্যেক ধর্মের সঠিকতা মেনে নেওয়া এবং বিভিন্ন ধর্মের মাঝে পারস্পরিক দূরত্ব কমিয়ে আনা।^[৯৬] সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, এই দর্শনের মাধ্যমে উম্মাহর অন্তর থেকে বিশ্ব কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ-কিতালের প্রেরণা হারিয়ে যাবে, আল্লাহর জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নয় বরং শত্রুতা পোষণ করার মতো ইমানের দাবি উম্মাহ আর অনুভব করবে না এবং কাফেরদের ইসলামের কর্তৃত্বের অধীনে আনা বা জিয্যা দিতে বাধ্য করার গুরুত্ব লান হয়ে যাবে।

যাহোক, ‘আবনাউল মুস্তাশরিকিন’ মডারেট গবেষকের দল ভয়ংকর ইমান বিধ্বংসী এই দর্শনের বীজ মুসলিম সমাজে বপন করতে পিছপা হয়নি। মডারেটদের মধ্য থেকে জামালুদ্দিন আফগানি ও মুহাম্মাদ আবদুহুর হাতেই এই নিকৃষ্ট দাওয়াতের সূচনা হয়েছে। জামালুদ্দিন আফগানি বলেন,

[৯৬] বিশ্বব্যাপী ইন্টারফেইথের কার্যক্রম ও মিশনের আলোকে বিষয়গুলো স্পষ্ট। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিভিন্ন কুফরি দর্শনের ন্যায় ‘তাওহিদুল আদইয়ান’-আন্তঃধর্মীয় ঐক্যেরও বাস্তবতাকে সামনে না রেখে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে। আন্তঃধর্মীয় ঐক্যের আহ্বায়করাও কখনো মনে করেনি যে, এটির অর্থ সকল ধর্ম এক। আর এই ধারণার তো আশেপাশেও আসার কথা নয় যে, সকল ধর্মের ঐক্য মানে দারুল ইসলামে ইমামুল মুসলিমিনের অধীনে যিম্মিদের ইনসাফপূর্ণ, যুলুমমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান। আন্তঃধর্মীয় ঐক্যের বাস্তবতার ব্যাপারে সতর্ক করে বা না করে অবাস্তব ব্যাখ্যা দু’টি তুলে ধরে প্রথমটিকে কুফর এবং দ্বিতীয়টিকে ভালো কথা আখ্যা দেওয়া কি বাস্তবেই ফিকহের পরিচয়! যদি তাই হয়, তাহলে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার কুফরমুক্ত ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে তাদের ভুল কোথায়? কুফরি দর্শনের জন্য ব্যবহৃত চটকদার শিরোনামের এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করালে কি ওই সকল শিরোনাম ও শিরোনামের অন্তর্নিহিত বাস্তবতার ব্যাপারে উম্মাহর নেতিবাচক মনোভাব ধরে রাখা যাবে!!!

ثم رجعت لأهل جرم الأرض وبحث في أهم ما فيه يختلفون، فوجدته الدين، فأخذت الأديان الثلاثة وبحث فيها بحثاً دقيقاً مجرداً عن كل تقليد، منصرفاً عن كل تقييد، مطلقاً للعقل سراحه، فوجدت بعد كل بحث وتنقيب وإمعان أن الأديان الثلاثة؛ الموسوية والعيسوية والمحمدية على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية، وإذا نقص في الواحدة شيء من أوامر الخير المطلق استكملته الثانية.....

وعلى هذا لاح لي بارق أمل كبير أن تتحد أهل الأديان الثلاثة مثل ما اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها، وأنه بهذا الاتحاد يكون البشر قد خطا نحو السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة..... (خاطرات جمال الدين الأفغاني، الهدف الأسى وخلاف أهل الدين، ص ৬৭)

“অতঃপর আমি বিশ্ববাসীর উপর অনুসন্ধান চালিয়ে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করলাম যে, গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে তাদের মতানৈক্য হচ্ছে। আমি দেখলাম তা হচ্ছে দ্বীন। তাই আমি সব ধরনের ‘তাকলিদ’ মুক্ত হয়ে, সকল সীমাবদ্ধতার পাশ কাটিয়ে এবং আকলকে মুক্ত-স্বাধীন রেখে ধর্ম তিনটির উপর সূক্ষ্ম গবেষণা চালিয়েছি। আমি সব ধরনের গবেষণা, যাচাই-বাছাই এবং গভীর মনোযোগের পর দেখলাম, ধর্ম তিনটি তথা মুসা আলাইহিস সালাম, ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীন মূলনীতি ও উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ এক। নির্মল উত্তম গুণাবলী থেকে কোনো দ্বীনে যদি কোনোটির কমতি থাকে অপরটি তা পূর্ণ করে দিয়েছে।.....

এর ভিত্তিতে আমার মনে এক প্রোজ্জ্বল মহান আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়েছে যে, তিন ধর্মের অনুসারীরা এক হয়ে যাক; যেমনিভাবে ধর্ম তিনটি উপাদান, মূল ও উদ্দেশ্যে এক। আর এই ঐক্যের মাধ্যমে মানবজাতি এই ছোট জীবনে শান্তির দিকে ব্যাপক পরিসরে অগ্রসর হয়ে যাবে।....”[৯৭]

উক্ত গ্রন্থে (পৃ: ১৭৭-১৮৩) "الأديان الثلاثة متفقة في المبدأ والغاية" এবং "أصول الأديان واحدة" শিরোনামদ্বয়ের অধীনে এ সংক্রান্ত আরো দীর্ঘ আলোচনা উল্লেখ হয়েছে। সেখান থেকে জামালুদ্দিন আফগানির প্রথম শিরোনামের সর্বশেষ

[৯৭] খাতেরাতু জামালুদ্দিন আলআফগানি, পৃ: ৭৬

বক্তব্যটি উল্লেখ করছি; যা তার দুষ্কর্মকে স্পষ্ট করে দেবে। জামালুদ্দিন আফগানি বলেন,

فالظهور للحق وللحقيقة وليس للإسلام اسماً مجرداً، وما تراه اليوم في المسلمين من التفهقر ليس من حقيقة دين الإسلام، بل من جهل المسلمين حقيقة الدين، وفي هذه الآية: "وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" ما يفهمنا أن هناك كلاً من بعض، فالأديان في مجموعها هي الكل، وأجزاءها الموسوية والعيسوية والإسلام، فمن كان من هذه الأديان كلها على الحق فهو الذي يتم له الظهور والغلبة، لأن الظهور الموعود به الدين إنما هو دين الحق؛ كما قلنا، وليس دين اليهود ولا النصارى ولا الإسلام؛ إذا بقوا أسماء مجردة، ولكن من عمل من هؤلاء بالحق فهناك الدين الخالص. قال الله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ". (خاطرات جمال الدين الأفغاني، الأديان الثلاثة متفقة في المبدأ والغاية، ص ০৮)

“বিজয় হবে হক ও হাকিকতের, নামমাত্র ইসলামের নয়। আজ মুসলিমদের যে অধঃপতন দেখতে পাচ্ছে তা দ্বীনে ইসলামের হাকিকত নয়। বরং মুসলিম উম্মাহ দ্বীনের হাকিকত বিস্মৃত হওয়ার কারণে। আর এই আয়াত ‘সত্যদ্বীন দিয়ে (প্রেরণ করেছেন), যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে’ আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এখানে একটি গোটা বিষয় আছে যা অংশ অংশ দ্বারা তৈরি হয়েছে। তো সকল দ্বীন সামগ্রিকভাবে গোটা বিষয়, আর সেটির অংশ হচ্ছে ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইসলাম। সুতরাং এ সকল দ্বীন থেকে যে হকের উপর থাকবে তার জন্য বিজয় ও কর্তৃত্ব পূর্ণ হবে। কেননা যে দ্বীনের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে দ্বীনে হক; যেমনটি আমরা বলেছি। ইহুদিদের ধর্ম, খ্রিষ্টানদের ধর্ম ও ইসলাম নয়; যখন তারা শুধু নামে অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু তাদের থেকে যে হক অনুযায়ী আমল করবে সেখানেই একনিষ্ঠ দ্বীনের অস্তিত্ব পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় আমি তোমার কাছে হক সহকারে এই কিতাব নাজিল করেছি; অতএব আল্লাহর ইবাদত করো দ্বীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে।

‘জেনে রেখো, আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ দ্বীন’।”^[৯৮]

জামালুদ্দিন আফগানির একান্ত শিষ্য মডারেট গবেষক মুহাম্মাদ আবদুল্ল তার জরুর মহান আকাজক্ষাকে (?) বাস্তবতায় রূপ দিতে পুরোদমে কাজ করেছেন। মুহাম্মাদ আবদুল্ল ও তার আধুনিক বুদ্ধিভিত্তিক মতাদর্শের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে গাফি আততাওবা বলেন,

ألف محمد عبده جمعية سياسية دينية سرية في بيروت إثر عودته إليها من أوروبا بعد تعطيل مجلة العروة الوثقى، وكان هدف هذه الجمعية التقريب بين الأديان السماوية الثلاثة، وإزالة الشقاق بين أهلها، وإحلال التعاون بدل الفرقة والخصام، وكان محمد عبده صاحب الرأي الأول في إنشائها ونظامها. (الفكر الإسلامي المعاصر لغازي التوبة، ص ٧١-٨١)

“আলউরওয়াতুল উসকা পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যখন মুহাম্মাদ আবদুল্ল ইউরোপ থেকে বৈরুত ফিরে আসেন, তখন সেখানে তিনি একটি দ্বীনি রাজনৈতিক গোপন সম্মেলন গঠন করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিলো আসমানি তিন ধর্মের মাঝে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করা, অনুসারীদের বিরোধ দূর করা এবং বিভেদ ও ঝগড়ার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন স্থাপন করা। এটি প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ আবদুল্লই প্রথম মত প্রদানকারী ছিলেন।”^[৯৯]

□ কাফেরদের সঙ্গে ভালোবাসা-হৃদয়তার দাবি

কাফেরদের প্রকারভেদে তাদের সঙ্গে আচরণের পার্থক্য ইসলামে স্বীকৃত একটি বিষয়। ক্ষেত্রবিশেষ সর্বোচ্চ যে আচরণ তাদের প্রাপ্য তা হচ্ছে, "البر والقسط" তথা সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ। কাফেরের সঙ্গে "الولاء" তথা হৃদয়তার সুযোগ নেই।^[১০০] কাফেরদের সঙ্গে হৃদয়তার দাবির ফলাফল তাই যা আন্তঃধর্মীয় ঐক্যের ফসল। এর মাধ্যমে মুসলিমদের অন্তর থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা মুছে যাবে এবং তারা দ্বীনি ‘গাইরত’ ও ইমানি জযবা হারিয়ে ফেলবে। এ সবকিছুই মূলত ধর্মনিরপেক্ষতার একেকটি স্তম্ভ।

কিন্তু যথারীতি প্রাচ্যবিদদের শিষ্য মডারেট গবেষকের দল আহদে নববি

[৯৮] খাতেরাতু জামালুদ্দিন আলআফগানি, পৃ: ১৮০

[৯৯] আলফিকরুল ইসলামি আলমুআসির, পৃ: ১৭-১৮

[১০০] এই বিষয়ে ‘রাষ্ট্র ও রাজনীতি’ বইয়ের পর্যালোচনায় বিবরণ আসবে, ইনশাআল্লাহ।

থেকে চলে আসা কাফেরদের সঙ্গে আচরণের 'আমলে মুতাওয়ারাস' ও 'ফিকরে মুতাওয়ারাস'র বিপরীতে তাদের সঙ্গে হৃদয়তার আওয়াজ তুলেছে। সদ্ব্যবহার-ইনসাফ আর হৃদয়তার মাঝে পার্থক্য এড়িয়ে গেছে এবং কাফেরদের সঙ্গে হৃদয়তার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং মুমিনদের কষ্ট দেবে; তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। জামালুদ্দিন আফগানি ও মুহাম্মাদ আবদুহর মতো যারা আন্তঃধর্মীয় ঐক্যের আহ্বান করেছে এবং সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা যে কাফেরদের সঙ্গে হৃদয়তা-ভালোবাসার কথা বলবে; তা একেবারেই স্পষ্ট। এছাড়াও আমরা মুস্তাশরিক টমাস আরনল্ডের অবস্থান দেখেছি যে, তার মতে ইসলাম প্রচার হয়েছে মুসলিম ও কাফেরের মাঝে হৃদয়তার মাধ্যমে।

যাহোক, মুহাম্মাদ আবদুহ 'আলইসলাম ওয়াননাসরানিয়া' গ্রন্থে তার মনগড়া ইসলামের আটটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তা থেকে সাত নম্বর মূলনীতি হচ্ছে, "مودة المخالفين في العقيدة" (আকিদায় বিরোধীদের সঙ্গে হৃদয়তা)। এই মূলনীতির অধীনে ইহুদি-নাসারার সঙ্গে হৃদয়তার দাবি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দেখুন, পৃ: ৮৮-৯১। গুরুর পথেই চলেছেন তার শিষ্য মুহাম্মাদ রশিদ রেযা। উভয়ের অবস্থান স্পষ্ট করতে দেখুন, তাফসিরে মানার, ৩/২৭৬-২৭৯, ৬/৪২৬। মুহাম্মাদ রশিদ রেযা কাফেরদের সঙ্গে হৃদয়তা বৈধ হওয়া-না হওয়ার মূলনীতি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন,

فهذه الآيات نص صريح في كون النهي عن الولاية لأجل العداوة وكون القوم حرباً، لا لأجل الخلاف في الدين لذاته. (تفسير المنار، ৬/৭২৬)

“এ সকল আয়াতে স্পষ্ট যে, হৃদয়তার নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক কাফেরদের শত্রুতা প্রকাশ করা ও যুদ্ধাবস্থায় হওয়ার সঙ্গে, শুধু ধর্মের ভিন্নতার সঙ্গে নয়।”^[১০১]

□ বিশ্বাসের স্বাধীনতার দাবি ও মুরতাদের হত্যার শাস্তি অস্বীকার করা

‘আবনাউল মুস্তাশরিকিন’ মডারেট গবেষকের দল পরিবর্তিত পৃথিবীতে পরিবর্তিত ইসলামের রূপায়ণের পথে পুরোদমেই অগ্রসর হয়েছে। ইসলামকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ করে ও মুসলিমদের অন্তর থেকে ‘মিল্লাতে ইবরাহিম’র মূল চেতনাকে মুছে দিয়ে মুসলিমজাতিকে পশ্চিমা মতাদর্শের গোলাম বানিয়ে রাখতে পশ্চিমা

[১০১] তাফসিরে মানার, ৬/৪২৬

বিশ্ব বিশ্বাস-চিত্তার স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, সমতা, উদারপন্থা ও মানবতা ইত্যাদি যে সকল দর্শন আমদানি করেছে, প্রাচ্যবিদদের শিষ্য মডারেটরা সে সকল দর্শনের গায়ে ইসলামি পোশাক পরিয়ে দিতে এবং নিজেদের লিবারেল-উদারপন্থী মুসলিম প্রমাণ করতে ত্রুটি করেনি। অপরদিকে ইসলামে মুরতাদকে হত্যা করার বিধান বিশ্বাসের স্বাধীনতা পরিপন্থি বলে যখন পশ্চিমারা আপত্তি করল, তখন পশ্চিমা প্রপাগান্ডায় ভীতিবিহ্বলের দল বাস্তবতা তুলে না ধরে গুরুদেবকে খুশি করতে দাবি করল যে, ইসলাম হত্যাকে মুরতাদের শাস্তি হিসেবে আখ্যা দেয়নি। বরং মুরতাদ যদি মুরতাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম ও ইসলামি ভূখণ্ডের জন্য আতঙ্কের কারণ হয় তথা ‘মুহারিব’ ও ‘বাগি’ হয় তখন ‘মুহারিব’ ও ‘বাগি’ হওয়ার কারণে তার জন্য হত্যার বিধান, অন্যথায় মুরতাদ শাস্তিপ্রিয় হলে তার জন্য এই বিধান নয়। এছাড়াও এটি শরয়ি ‘হদ’ নয়, বরং ‘সিয়াসি’ বিষয়; যা স্থান-কালের ভিন্নতায় ভিন্ন হবে। অথচ সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে মুরতাদকে হত্যা করার ব্যাপারে উম্মাহর ‘ইজমা’ প্রমাণিত।^[১০১] আফসোসের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে নিজেকে দেওবন্দিয়াতের দিকে নিসবত করা কেউ কেউ মুরতাদের শাস্তির ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

যাহোক, বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিষয়ে মডারেটদের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে ড. মাজেদ ইবনে আলি ইবনে ইবরাহিম আযযুমাইয়ি তার ‘আদদাওলাতুল মাদানিয়া’ গ্রন্থে বলেন,

يركز أصحاب الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر على بعض مفاهيم الحرية المستقاة من الفكر الغربي، فهم يركزون على حرية العقيدة وحرية التعبير وحق المساواة وحقوق غير المسلمين في الدولة المسلمة وحقوق الإنسان على وجه الخصوص وغيرها من المفاهيم.

وهذا في ظني راجع إلى تأثيرهم بالفكر الغربي كثيراً ومحاولة الكثير منهم مجارة ذلك الفكر، حيث يأخذ هؤلاء بهذه المفاهيم وفق التصورات الغربية الليبرالية، ثم يحاولون تحسين صورتها وتهذيبها وأسلمتها؛ على الرغم من أن بعض هذه المفاهيم تتعارض كلياً مع الإسلام.

لقد نقلت الصدمة الفكرية بالحضارة الغربية غير أول بعثة وصلت إلى

[১০১] এই বিষয়ে ‘রাষ্ট্র ও রাজনীতি’ বইয়ের পর্যালোচনায় বিবরণ আসবে, ইনশাআল্লাহ।

فرنسا، وذلك من خلال الشيخ رفاعه الطهطاوي وكتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، حيث أسس في هذا الكتاب بداية توليفية لشعارات الثورة الفرنسية من حرية وعدالة وإخاء مع الإسلام وتقاليد.

ثم لحق الطهطاوي قادة ومفكرون كبار مثل أديب إسحاق والكواكبي والنديم وغيرهم، كما تأثر مفكرون إسلاميون بأفكاره وأفكار الثورة الفرنسية؛ أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، كما أن تلامذة محمد عبده كأحمد لطفي السيد وقاسم أمين وأحمد فتحي زغلول وسعد زغلول ارتبطوا بالفكر الليبرالي، وكذلك الأمر مع شيخ الأزهر مصطفى عبد الرزاق وأخيه علي عبد الرزاق وأحمد أمين وخالد محمد خالد. (الدولة المدنية بين الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر والاتجاه العلماني لماجد بن علي بن إبراهيم الزمّيع، ص ১২৬-১০৬)

“সমকালীন ইসলামি বুদ্ধিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা পাশ্চাত্য দর্শন থেকে গৃহীত স্বাধীনতার কতিপয় ভাবের বীজ বপন করেছে। তারা বিশ্বাসের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, সমানাধিকার, মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার এবং বিশেষকরে মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়াদি প্রবেশ করিয়েছে।

আমার ধারণা মতে এটি তাদের ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে প্রভাবিত হওয়া এবং তাদের অনেকের ওই সকল দর্শনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার প্রচেষ্টার ফসল। তাইতো তারা এই ভাষ্যগুলো পাশ্চাত্য উদারপন্থী ধারণা অনুযায়ী গ্রহণ করে, অতঃপর পরিপাটি করে ভালো মুখোশ পরিয়ে ইসলামি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে; যদিও কিছু ভাষ্য ইসলামের সঙ্গে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক।

পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তাগত ধাক্কা প্রথমবার ফ্রান্সে পৌঁছানো মিশনের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর তা হয়েছে শাইখ রিফাআ তাহতাবি^[১০০] ও তার ‘তাখলিসুল ইবরিয ফি তালখিসে বারিয’ গ্রন্থের মাধ্যমে। তিনি এই গ্রন্থে স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি ফরাসি বিপ্লবের স্লোগানকে ইসলাম ও

[১০০] রিফাআ তাহতাবি জামালুদ্দিন আফগানি ও মুহাম্মাদ আবদুহর চেয়েও অনেক জঘন্য ব্যক্তি। মডারেটদের এ দর্শনের ন্যায় আমাদের আলোচনা করা প্রতিটি দর্শনের ক্ষেত্রেই আফগানি ও আবদুহর পূর্বে ও পরে অনেকের অবস্থান আছে। বাকি আমরা যেহেতু প্রথমেই বলেছি যে, আমরা শুধু প্রসিদ্ধ কয়েকজনের আলোচনা করবো, তাই অন্যান্যদের নাম উল্লেখ করিনি। হ্যাঁ! সামনে জাতীয়তাবাদের আলোচনায় রিফাআ আততাহতাবির কথা আসবে।

ইসলামি রীতির সঙ্গে প্রাথমিক সংমিশ্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অতঃপর তাহতাবির অনুসরণ করেছে আদিল ইসহাক, কাওয়াকবি ও নাদিমের ন্যায় গবেষক ও নেতারা। যেমনিভাবে তাহতাবি ও ফরাসি বিপ্লবের দর্শনে প্রভাবিত হয়েছে জামালুদ্দিন আফগানি ও মুহাম্মাদ আবদুছর ন্যায় ব্যক্তিরা। তেমনিভাবে মুহাম্মাদ আবদুছর ছাত্র আহমাদ লুতফি সাইয়েদ, কাসেম আমিন, আহমাদ ফাতহি যাগলুল ও সাদ যাগলুল উদারপন্থা নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। একই কথা আযহারের শাইখ মুস্তফা আবদুর রায়যাক, তার ভাই আলি আবদুর রায়যাক, আহমাদ আমিন ও খালেদ মুহাম্মাদ খালেদের ক্ষেত্রেও।”^[১০৪]

মুরতাদের শাস্তির বিষয়ে মডারেটদের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি বলেন,

إن مسألة قتل المرتد كلمة إجماع فيما بين المسلمين من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وقد أطبقت الفقهاء على أن الارتداد في دار الإسلام جريمة من الجرائم عقوبتها القتل، ولا نعلم لذلك مخالفاً من فقهاء الأمة وعلماءها، حتى جاء القرن الرابع عشر فطعن أهل الغرب في هذا الحكم بأنه مضاف لمبدأ حرية التفكير وحرية الاعتقاد. فحاول بعض المغرمين بالأفكار الغربية من المنتمين إلى الإسلام أن يدفعوا هذا الطعن بإنكار أن تكون عقوبة المرتد القتل في الإسلام، كأن هذا الحكم وصمة في جبين الإسلام يريد هؤلاء أن يمحوها -والعياذ بالله العظيم-، فألفوا من أجل ذلك مقالات ادعوا فيها أن الإسلام لم يجعل القتل عقوبة الارتداد، وإنما جعله جزاء للمحاربة والبغي. (تكملة فتح الملهم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين، مسألة قتل المرتد، ٦٨١/٢-٧٨١)

“মুরতাদকে হত্যা করার মাসআলা সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে বর্তমান পর্যন্ত মুসলিমদের মাঝে একটি ‘ইজমায়ি’ ঐক্যমত্যের বিষয়। ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, দারুল ইসলামে ‘ইরতিদাদ’ ইসলাম ত্যাগ করা এমন একটি

অপরাধ যেটির শাস্তি হত্যা। আমাদের জানামতে উম্মাহর ফুকাহা-উলামা থেকে কেউ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেনি। হ্যাঁ! চতুর্দশ শতকে এসে পশ্চিমা এই বিধানের উপর আপত্তি করে বসল যে, এটি চিন্তার স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তখন মুসলিম নামধারী পাশ্চাত্য দর্শনে আসক্ত কতিপয় ব্যক্তি এই আপত্তি অপনোদনের প্রচেষ্টায় ইসলামে মুরতাদের শাস্তি হত্যাকে অস্বীকার করল। কেমন যেন এই বিধান ইসলামের ললাটে একটি কলঙ্ক, যা তারা মুছে দিতে চাচ্ছে -নাউযুবিল্লাহ-। এর ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করে দাবি করল যে, ইসলাম 'ইরতিদাদ'র শাস্তি হত্যা সাব্যস্ত করেনি, বরং হত্যাকে যুদ্ধ ও বিদ্রোহের শাস্তি আখ্যা দিয়েছে।^[১০২]

বিশ্বাস-চিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে জামালুদ্দিন আফগানির অবস্থান তার প্রতিটি প্রবন্ধ ও গ্রন্থে স্পষ্ট। 'আলউরওয়াতুল উসকা' পত্রিকায় এই দর্শন তুলে ধরাই ছিলো তার অন্যতম মিশন। দেখুন, 'আলউরওয়াতুল উসকা'র ভূমিকায় তার ব্যাপারে করা মন্তব্য, পৃ: ৪০। তার শিষ্য মুহাম্মাদ আবদুহুরও এটি অন্যতম একটি মিশন ছিল। তার অবস্থান স্পষ্ট করতে বিশেষভাবে 'আলইসলাম ওয়াননাসরানিইয়া, গ্রন্থের পৃ: ১১৭ থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।

বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে মুরতাদের হত্যার শাস্তিকে অস্বীকার করে গুরুদের মিশন ছড়িয়ে দিতে মুহাম্মাদ রশিদ রেযা আশ্রয় চেষ্টা করেছেন। তার ফাতাওয়া, তাফসির ও পত্রিকার বহু ক্ষেত্রে এ বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। "الجواب عن مسألة حرية الدين وقتل المرتد" (ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মুরতাদের হত্যার মাসআলার জবাব) শিরোনামের অধীনে তিনি বলেন,

إنه ليس في القرآن أمر بقتل المرتد، بل فيه ما يدل على عدم قتل المرتدين
المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين ولا يخرجون عن طاعة الحكومة...
(فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، ٩٣٥١/٤)

"মুরতাদের হত্যার বিষয়ে কুরআনে হুকুম নেই। বরং তাতে এমন কথা আছে যা প্রমাণ করে যে, শান্তিপূর্ণ মুরতাদ যারা মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ায় না এবং রাষ্ট্রের অবাধ্যতা করে না; তাদের হত্যা করা যাবে না।..."^[১০৩]

তাফসিরে মানারেও তিনি বলেন,

[১০২] তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ২/১৮৬-১৮৭

[১০৩] ফাতাওয়া মুহাম্মাদ রশিদ রেযা, ৪/১৫৩৯

إِنَّ الْمُرْتَدِينَ لَا يَقْتُلُونَ إِذَا كَانُوا مُسَالِمِينَ لَا يُقَاتِلُونَ، وَلَا يُوْجَدُ فِي الْقُرْآنِ
نَصٌّ بِقَتْلِ الْمُرْتَدِ فَيَجْعَلُ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ "فَإِنْ اعْتَرَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ..."
(تفسير المنار، ٧٢٣/٥)

“মুরতাদরা যদি যুদ্ধে না জড়িয়ে শান্তিপ্ৰিয় হয়, তাদের হত্যা করা যাবে না।
কুরআনে মুরতাদের হত্যার ব্যাপারে এমন কোনো ‘নস’ নেই যেটিকে ‘অতএব
তারা যদি তোমাদের থেকে সরে যায়, অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না
করে...’; আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ‘নাসেখ’ রহিতকারী আখ্যা দেওয়া
যায়।...”^[১০৭]

মুহাম্মাদ রশিদ রেযা "الاضطهاد في الدين وقتل المرتد" (দ্বীনের কারণে
নিপীড়ন ও মুরতাদের হত্যা) শিরোনামের অধীনে একটি প্রশ্ন-উত্তর উল্লেখ
করেছেন, যাতে তিনি মুরতাদের হত্যার বিধানকে শর্তযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে
সেটিকে একটি ‘সিয়াসি’ বিষয় আখ্যা দিয়েছেন। আমরা তার ফাতাওয়া থেকে
প্রশ্ন-উত্তর উল্লেখ করছি,

إذا كان الإسلام لا يضطهد أحداً لعقيدته، فكيف يشرع قتل المرتد الثابت
بقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه"؟

ج- كان المرتد من مشركي العرب يعود إلى محاربة المسلمين وإيذائهم،
فمشروعية قتله أظهر من مشروعية قتال جميع المشركين المحاذين
للإسلام..... فالظاهر أن الأمر بقتل المرتد كان لمنع شر المشركين وكيد
الماكرين من اليهود، فهو لأسباب قضت بها سياسة ذلك العصر التي تسمى
في عرف أهل عصر سياسة عرفية عسكرية، لا لاضطهاد الناس في دينهم...
(فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، ٦٧٥/٢-٧٧٥)

“ইসলাম কাউকে আকিদার কারণে নিপীড়ন করে না; এটিই যদি বাস্তব হয়,
তাহলে মুরতাদকে হত্যার বিধান কীভাবে দিলো, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ‘যে তার দ্বীন (ইসলাম) পরিবর্তন করল
তাকে হত্যা করো’?

উত্তর: আরবের মুশরিকদের থেকে যারা মুরতাদ হতো তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদের কষ্ট দেওয়ার দিকে ফিরে যেতো। সুতরাং তাকে হত্যা করার বৈধতা ইসলামের সংলগ্ন সকল মুশরিকের বিরুদ্ধে কিতালের বৈধতার চেয়েও বেশি স্পষ্ট।.... তাই এটিই স্পষ্ট যে, মুরতাদকে হত্যার নির্দেশ ছিলো মুশরিকদের অনিষ্ট এবং ইহুদিদের প্রতারক শ্রেণির ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য। তা এমন কিছু কারণে ছিলো যা তৎকালীন 'সিয়াসত' ফয়সালা করেছে; যেটিকে যুগের লোকদের পরিভাষায় 'প্রচলিত সামরিক সিয়াসত' বলা হয়, যাদের কারণে নিপীড়ন করতে নয়।...''[১০৮]

□ যিম্মিদের স্বাধীনতা-সমানাধিকারের দাবি এবং জিয়য়ার ব্যাপারে কৈফিয়ত দান

দারুল ইসলামে ইমামুল মুসলিমিনের অধীনে বসবাসরত 'যিম্মি' কাফেররা নির্যাতনের শিকার না হওয়া এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হওয়া তথা তাদের সঙ্গে ইনসাফের আচরণ শরিআ আইনে একটি স্বীকৃত বিষয়; তবে সেটি কখনো সমানাধিকার ও প্রচলিত অর্থের স্বাধীনতা নয়। 'যিম্মিরা কোন কোন বিষয়ের অধিকার রাখে আর কোন কোন বিষয়ের অধিকার রাখে না; ফিকহের কিতাবাদিতে সেটির বিস্তারিত বিবরণ আছে। তেমিনভাবে 'যিম্মিদের উপর 'জিয়য়া' আরোপের ক্ষেত্রে যে তাদের "صغار" তথা লাঞ্ছনা রয়েছে; সেটিও স্পষ্ট।[১০৯] কিন্তু যথারীতি 'আবনাউল মুস্তাশরিকিন' মডারেট গবেষকের দল যিম্মিদের সঙ্গে ইনসাফের আচরণের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তাদের স্বাধীনতা-সমানাধিকারের দাবি করেছে। অপরদিকে যিম্মিদের উপর আরোপ করা 'জিয়য়া'র বিধান যখন তাদের গুরুদের শেখানো 'মানবাধিকার' পরিপন্থি মনে হয়েছে, তখন 'জিয়য়া' আরোপের ক্ষেত্রে লাঞ্ছনার বিষয়টি আড়াল করে পশ্চিমা অসন্তুষ্ট না হওয়ার মতো অবস্থান গ্রহণ করেছে। মডারেট গবেষকদের অবস্থানকে পুঁজি করে পরবর্তী সময়ে শরয়ি পরিভাষা অনুযায়ী দারুল ইসলাম-দারুল হারব বা যিম্মি-হারবি; মাসআলার সমাধান না করেই পরিবর্তিত পৃথিবীর মুসলিম-অমুসলিমের জগাখিচুড়ি মার্কা অবস্থানে তা সমঞ্জস করা হয়েছে। আবার এর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'। কেমন যেন কাফের সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে সবকিছু করতে পারা, বরং মুসলিমদের অভিভাবক পর্যায়ে দায়িত্বের আসনে

[১০৮] ফাতাওয়া মুহাম্মাদ রশিদ রেযা, ২/৫৭৬-৫৭৭

[১০৯] এই বিষয়ে 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি' বইয়ের পর্যালোচনায় সালাফের অবস্থান ও বক্তব্যের আলোকে আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

অধিষ্ঠিত হতে পারাও ‘যিম্মি’ হওয়ার পরিপন্থি কিছু নয়। যদিও ‘দারুল ইসলামে ‘যিম্মিদের অধিকার’ শিরোনামের পরিবর্তে ‘মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার’ শিরোনাম করতেই অনেকে পছন্দ করেন।^[১১০] তবে এক্ষেত্রেও আফসোসের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে নিজেকে দেওবন্দিয়াতের দিকে নিসবত করা কেউ কেউ এ বিষয়ে এমনভাবে কথা বলেন, যা মডারেট গবেষকদের অবস্থানের সমার্থক।

যাহোক, জামালুদ্দিন আফগানি, মুহাম্মাদ আবদুল্ল ও রশিদ রেয়ার মতো মডারেট গবেষকের দল; যারা আন্তঃধর্মীয় ঐক্য, কাফেরদের সঙ্গে হৃদয়তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রতি আস্থা রাখতে চান, তারা যে শুধু 'যিম্মি' নয় বরং ব্যাপকভাবে কাফেরদের স্বাধীনতা-সমানাধিকারের কথা বলবেন তা নতুন করে উদ্ধৃতি উল্লেখ করে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। মুহাম্মাদ রশিদ রেয়া 'জিযয়া' গ্রহণের পর 'যিম্মিদের সঙ্গে আচরণের বিষয়ে স্পষ্ট বলেন,

ومتى أعطوا الجزية وجب تأمينهم وحمايتهم والدفاع عنهم وحريتهم في دينهم بالشروط التي تعقد بها الجزية، ومعاملتهم بعد ذلك بالعدل والمساواة كالمسلمين. (تفسير المنار، ١/٢٤٣)

“আর যখন তারা জিয়য়া প্রদান করবে তখন জিয়য়া চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, আক্রমণ প্রতিহত এবং তাদের দ্বীনি বিষয়ে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা আবশ্যিক হয়ে যাবে। এরপর তাদের সঙ্গে আচরণ হবে মুসলিমদের মতো ইনসাফ ও সমানাধিকারের।”[১৩৩]

তবে এক্ষেত্রে আবুল আলা মওদুদিও তার ফিকরি উস্তাযদের থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে থাকেননি। তার "اسلامی ریاست میں ذمیوں کے حقوق" পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করলে যেকোনো পাঠকের সামনে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা তার উক্ত পুস্তিকা থেকে দুটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। "آزادی تحریر و تقریر وغیرہ" (লেখা ও বলা ইত্যাদির স্বাধীনতা) শিরোনামের অধীনে তিনি বলেন,

غیر مسلموں کو اس ریاست میں تحریر اور رائے و ضمیر اور اجتماع کی وہی آزادی حاصل ہوگی جو خود مسلمانوں کو حاصل ہوگی، اور اس معاملہ میں جو قانونی پابندیاں مسلمانوں کے لیے ہوئیں گی وہی ان کے لیے بھی ہوں گی۔

انہیں اسلام پر بھی تنقید کا اتنا ہی حق حاصل ہو گا جتنا مسلمانوں کو ان کے مذہب پر تنقید کا۔۔۔۔۔۔ (اسلامی ریاست میں ذمیوں کے حقوق، ابوالاعلیٰ مودودی، ص ۵۲)

[১১০] শিরোনাম পরিবর্তনের আড়ালে কত কী লুকিয়ে আছে তা সচেতন শ্রেণির নিকট স্পষ্ট।

[১১১] তাফসিরে মানার, ১০/৩৪২

"এই (ইসলামি) শাসনব্যবস্থার অধীনে অমুসলিমরা লেখা, বলা, মতামত প্রদান, মনের ভাব প্রকাশ ও সম্মিলনের সেই স্বাধীনতা পাবে যা স্বয়ং মুসলিমরা পেয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য যে সকল আইনের বাধ্যবাধকতা থাকবে তা তাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।.....

তাদের ইসলামের ব্যাপারেও ততোটুকু সমালোচনার অধিকার থাকবে যতটুকু সমালোচনার অধিকার মুসলিমদের তাদের ধর্মের ব্যাপারে থাকবে।....."^[১১১]

"لما رئين" শিরোনামের অধীনে তিনি বলেন,

چند محفوظ مناصب کے سوا وہ تمام ملازمتوں میں داخل ہونے کے حقدار ہوں گے، اور اس معاملہ میں ان کے ساتھ کوئی تعصب نہ برتا جائے گا۔ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لئے اہلیت کا ایک ہی معیار ہوگا اور اہل آدمیوں کو بلا امتیاز انتخاب کیا جائے گا۔ محفوظ مناصب سے مراد ایسے مناصب ہیں جو اسلام کے اصولی نظام میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ (اسلامی ریاست میں ذمیوں کے حقوق، ص ۲۶)

"কিছু সংরক্ষিত পদ ব্যতীত সকল চাকরিতে তাদের নিয়োগাধিকার থাকবে। এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো সাম্প্রদায়িক আচরণ করা যাবে না। মুসলিম ও অমুসলিম; উভয়ের যোগ্যতার মাপকাঠি একই হবে এবং কোনো ধরনের তারতম্য না করেই যোগ্য ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন করা হবে। সংরক্ষিত পদ দ্বারা উদ্দেশ্য এমন কিছু পদ যেগুলো ইসলামের মূলনীতিতে চাবিকাঠির (চালিকা শক্তির) মর্যাদা রাখে।....."^[১১২]

তেমনিভাবে 'জিয়য়া'র বিধান আরোপের ক্ষেত্রে যিশ্মিনের লাঞ্ছনার বিষয় আড়াল করতেও মডারেটের দল ঝুটি করেনি। মুহাম্মাদ আবদুহ 'জিয়য়া'কে শুধু যিশ্মিনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিনিময় হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।^[১১৩] তিনি বলেন,

وانما يكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عوناً على صيانتهم والمحافظة

[১১২] ইসলামি রিয়াসত মে যিশ্মিন কে হুকুম, পৃ: ২৫

[১১৩] ইসলামি রিয়াসত মে যিশ্মিন কে হুকুম, পৃ: ২৬

[১১৪] এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি, 'জিয়য়া' কীসের বিনিময়; সে ব্যাপারে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য আছে। সে মতামতগুলোতে মুহাম্মাদ আবদুহ বা সামনে উদ্ধৃত মুহাম্মাদ রশিদ রেযার বক্তব্যে উল্লিখিত কথাগুলো আছে। তবে তাদের কেউ লাঞ্ছনার বিষয় ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। কিন্তু মডারেট গবেষকের দল বিনিময়ের বিষয়কে খুব গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে লাঞ্ছনার বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে; যা তাদের পুরো আলোচনা অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হয়ে যায়। অথচ লাঞ্ছনার বিষয়টি অক্যাটা 'নস' দ্বারা প্রমাণিত আর বিনিময়ের আলোচনা একটি 'ইজতিহাদি' বিষয়। আমাদের উদ্দেশ্য এটি দেখানো যে, লাঞ্ছনার বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া বা ভিন্ন খাতে ধাবিত করার সূচনা হয়েছে মডারেট গবেষকদের মাধ্যমে।

على أمنهم في ديارهم. (الإسلام والنصرانية، مقابلة بين الإسلام الحربي
والمسيحية السلمية، ص ٨٤-٨٥)

“আর তাদের জিয়্যা প্রদান করার বিধান দেওয়া হয়েছে; তাদের রক্ষণাবেক্ষণ
এবং নিজ নিজ অঞ্চলে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে যেন তা
সহযোগী হয়।”^[১১৫]

তবে এক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে মুহাম্মাদ রশিদ রেয়া। ‘জিয়্যা’
আরোপের বিধানকে যিম্মিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সৈনিকের দায়িত্ব থেকে
অব্যাহতি দানের বিনিময় হিসেবে আখ্যা দিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং
লাঞ্ছনার বিষয়কে আড়াল করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। দেখুন, তার তাফসিরে
মানার ১০/৩৪২-৩৫২। আমরা তার পূর্ণ আলোচনা থেকে একটি অংশ উল্লেখ
করছি। তিনি বলেন,

وهل هي جزاء حقن الدم، أو جزاء الحماية لهم والدفاع عنهم من غير
تكليفهم التجند للقتال معنًا، أو جزاء إعطاء الذي حقوق المسلمين
ومساواتهم بأنفسهم في حرية النفس والمال والعرض والدين؟ وجوه؛
أضعفها أولها وسيأتي بسط القول في ثانيها. (تفسير المنار، ٣٤٣/٠١)

“জিয়্যা কি (ইসলাম গ্রহণ না করায় তাদের রক্তপাত করা যে বৈধ ছিলো
সেই) রক্ত রক্ষা করার বিনিময়, নাকি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে
দায়িত্ব পালনের বিধান না দিয়েও তাদের থেকে অন্যদের আক্রমণ প্রতিহত
করা ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার বিনিময়, নাকি ব্যক্তি, সম্পদ,
সম্মান ও ধর্মের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যিম্মিদের মুসলিমদের সমানাধিকার
দেওয়ার বিনিময়? এ রকম বিভিন্ন কারণ বলা হয়। প্রথমটি সবচেয়ে দুর্বল
মত, আর দ্বিতীয়টির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।”^[১১৬]

মুহাম্মাদ রশিদ রেয়া দ্বিতীয় মতটি প্রমাণ করে পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ আলোচনা
করেছেন।

একই পথে চলেছেন আবুল আলা মওদুদিও। তিনি “اسلامى رياست میں زمينوں کے حقوق”
পুস্তিকায় “فوجى خدمت سے استثناء” (সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান) শিরোনামের

[১১৫] আলইসলাম ওয়াননাসরানিয়া, পৃ: ৮৪-৮৫

[১১৬] তাফসিরে মানার, ১০/৩৪৩

ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين - كما يريدنا بعض الباحثين على الظن - لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة، وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين.....

وقد فرضت الجزية - كما ذكرنا - على القادرين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية التي كانوا يطالبون بأدائها لو كانوا مسلمين، ومن الواضح أن أي جماعة مسيحية كانت تعفى من أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت في خدمة الجيش الإسلامي. (الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد، ص ৯৭-১০৮)

“ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার কারণে কোনো ধরনের শাস্তির উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টানদের উপর এই কর (জিয্যা) আরোপ করা হয়নি; যেমনটি কতিপয় গবেষক ধারণার ভিত্তিতে আমাদেরকে বোঝাতে চায়। বরং এটি তারা অন্যান্য যিম্মিদের মতো আদায় করতো মুসলিমদের তরবারি তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়ার বিনিময় হিসেবে; যেহেতু রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজাদের ধর্ম সামরিক দায়িত্বপ্রাপ্তির জন্য প্রতিবন্ধক ছিল।.....

যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি, জিয্যা সামরিক দায়িত্বের পরিবর্তে সক্ষম পুরুষদের উপর আরোপ করা হয়েছে; মুসলিম হলে যে দায়িত্বের জন্য তাকে ডাকা হতো। আর এটি স্পষ্ট যে, যেকোনো খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ইসলামি সৈন্যদলে যোগদান করলে এই কর (জিয্যা) মাফ করে দেওয়া হতো।”^[১১৯]

□ জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতা ও দেশাত্মবোধের পতাকা উত্তোলন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করেছেন সেগুলোর অন্যতম ছিলো জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতা। মদিনায় হিজরতের পর আউস ও খায়রাজের মাঝে শত বছরের গোত্রীয় জাতীয়তাবাদী-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কঠিন হস্তে দমন করে সকল মুমিন এক দেহের ন্যায় ঘোষণা

[১১৯] আদদাওয়াহ ইলাল ইসলাম, পৃ: ৭৯-৮০

দিয়েছেন এবং বিশ্ব মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতার পতাকাতলে যুদ্ধ করে নিহত হওয়াকে জাহেলি মৃত্যু আখ্যা দিয়েছেন। এ সকল বিষয় আপন জায়গায় স্বীকৃত এবং মুসলিম উম্মাহ শতকের পর শতক ধরে এই নববি চেতনা লালন করে আসছে। কিন্তু যখন থেকে খিলাফাহ ও শরিআ শাসনব্যবস্থা দুর্বল হতে শুরু করেছে, তখন থেকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে খিলাফতে ইসলামিয়াকে নিশ্চিহ্ন করতে বিশ্ব কুফরি শক্তি যে সকল হাতিয়ার ব্যবহার করেছে তার অন্যতম ছিলো এই জাহেলি জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতা। পশ্চিমা ক্রুসেডাররা এই জাহেলি জাতীয়তাবাদ; বিশেষকরে আরব ও তুর্কি জাতীয়তাবাদ উসকে দিয়ে দারুল ইসলামকে টুকরো টুকরো করতে এবং খিলাফতে ইসলামিয়া বিলুপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র রাষ্ট্র পৃথক করে প্রত্যেককে রং বেরঙের পতাকা ধরিয়ে দিয়েছে, এক রাষ্ট্রের সকল জনগণ তথা মুসলিম-অমুসলিমকে এক জাতি আখ্যা দিয়েছে এবং এমনভাবে দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমের জিগির শিখিয়েছে যে, মুসলিম সমাজ নিজ দেশের কাফেরদের আপন জাতি মনে করতে শুরু করেছে এবং অন্য দেশের মুসলিমদের ভিন্ন জাতি হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। স্বীনের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং যুদ্ধ করলেও দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে। আর এর মাধ্যমে বিশ্ব কুফরি শক্তি তাদের দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের কাক্ষিত সফলতা ও ফসল দেখে চক্ষু শীতল করে চলছে। বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বের নববি চেতনা মুসলিমদের অন্তর থেকে উধাও হয়ে গেছে এবং আল্লাহর কালিমা উচ্চ করার জিহাদের জায়গায় স্থান করে নিয়েছে দেশরক্ষা ও জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতার জাহেলি বাণী প্রতিষ্ঠা করার যুদ্ধ।

পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য অনেক মতবাদ ও দর্শনের ন্যায় এই জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ দর্শনকে মুসলিম সমাজে প্রবিষ্ট করতে পূর্ণমাত্রায় এগিয়ে এসেছে মুস্তাশরিকিন-প্রাচ্যবিদের দল। আর তাদের শিষ্য-ফিকরি সন্তান মুসলিম নামধারী মডারেট গবেষকরা যথারীতি তাতে ইসলামের পোশাক পরাতে কোনো প্রকার ত্রুটি করেনি। মুসলিম সমাজে জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত ছোবলের সূচনা এবং এই বিষ মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে পড়া সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি (মৃ: ১৪২০ হি.) তাঁর 'আলআরাবু ওয়ালইসলাম' পুস্তিকার ভূমিকায় (পৃ: ৭-১৬) খুব চমৎকার আলোচনা করেছেন। আমরা তাঁর পূর্ণ বক্তব্য থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করছি। তিনি আরবদের ইসলামের জন্য বেঁচে থাকা এবং ভ্রাতৃত্ব ও একতার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করার পর বলেন,

ولم نقرأ في التاريخ حركة منظمة أو فلسفة مدونة نستطيع أن نسميها "فكرة القومية العربية"، وبقي العرب يعيشون بالإسلام وللإسلام، وبقي تاريخ كل منهما متصلاً بتاريخ الآخر متداخلاً بعضه في بعض، وبقي الوضع هكذا إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وقد بدت في الأتراك -الذين كانوا يحكمون الشام والعراق والحجاز- الكبرياء القومية.....

وفي لفظ مؤلف قومي عربي: "الوجدان القومي العربي بدأ يستيقظ في نفوس أفراد من العرب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأول ما بدأ ذلك في ديار الشام، مهدوا بالقضاء على الحكم الأجنبي -التركي- يومئذ وعلى الإقليمية، وقد تزعم هذه الحركة وقادها بعض المسيحيين الذين لم تكن تربطهم بالأتراك رابطة العقيدة والدين المتينة ورابطة الإخاء الإسلامي، وكانوا مثقفين الثقافة الغربية التي تقوم على تمجيد القومية، وكان من زعمائها الأولين الدكتور فارس نمر والشيخ إبراهيم اليازجي والأستاذ نجيب العازوري اللبناني".

ثم نشبت الحرب الأولى ١٩١١-١٩١٨م وسنحت للأقطار العربية فرصة الانشقاق على الإمبراطورية العثمانية، وانتهز الحلفاء هذه الفرصة الذهبية فنفخوا في قربة القومية، وقام لورانس الداهية بدوره فأشعل الحماس القومي وأثار العرب على الأتراك..... (العرب والإسلام لأبي الحسن علي الحسيني الندوي، ص ٧-٩)

“ইতিহাসের পাতায় আমরা এমন কোনো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বা লিখিত দর্শনের কথা পড়িনি যেটিকে আমরা ‘আরব জাতীয়তাবাদের চেতনা’ নাম দিতে পারি। আরবের লোকেরা ইসলাম নিয়ে ইসলামের জন্যই জীবনযাপন করছিলো। আরব ও ইসলাম; প্রত্যেকটির ইতিহাস অপরটির ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো এবং একটি অপরটির সঙ্গে মিশ্রিত ছিল। খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই ছিল। কিন্তু শাম, ইরাক ও হিজায়ের তৎকালীন শাসনকর্তা তুর্কিদের মাঝে জাতীয়তাবাদী অহংকার দেখা

দেয়।.....

এক আরব জাতীয়তাবাদী লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, 'আরবের লোকদের অন্তরে আরবি জাতীয়তাবাদের অনুভূতি জাগ্রত হয় খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুতে। এটির সূচনা হয় শাম অঞ্চলে। তারাই তৎকালীন বিদেশী-তুর্কি-শাসন ও (তুর্কিদের নিজ) অঞ্চলপ্রীতি বিলুপ্তির রাস্তা মসৃণ করে দেয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করে এবং পরিচালনা করে কতিপয় খ্রিষ্টান যাদের তুর্কিদের সঙ্গে আকিদা, ধীন ও ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় সেতুবন্ধন; কোনোভাবেই সম্পৃক্ততা ছিলো না। এটির প্রথম দিকের মুখপাত্রদের মধ্যে ছিলো ড. ফারেস নিম্বর, শাইখ ইবরাহিম ইয়াযেজি ও উস্তায় নাজিব আলআযুরি আললুবনানি।'

অতঃপর ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলমান থাকে, আর তা আরব ভূখণ্ডগুলোকে উসমানি সাম্রাজ্য ভাঙনের সুযোগ করে দেয়। অপরদিকে মিত্রশক্তি এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জাতীয়তাবাদের পালে হাওয়া দিলো। ধূর্ত (টমাস এডওয়ার্ড) লরেন্স তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জাতীয়তাবাদী প্রেরণা প্রজ্বলিত করল এবং আরবদেরকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে উসকে দিলো।...."[১২০]

জাতীয়তাবাদের সূচনা এবং মুসলিম সমাজে তা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে মুহাম্মাদ কুতুব (মৃ: ১৪৩৫ হি.) তাঁর "مذاهب فكرية معاصرة" (মাযাহিবু ফিকরিয়া মুআসিরা) গ্রন্থে (পৃ: ৫৫৪-৫৮৮) দীর্ঘ এবং খুবই সুন্দর আলোচনা করেছেন। আমরা সেখান থেকে আরব জাতীয়তাবাদের সূচনা সংক্রান্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ উল্লেখ করছি। মুহাম্মাদ কুতুব বলেন,

يقول التاريخ: إن أول من نادى بالقومية العربية هم نصارى لبنان وسوريا، وانضم إليهم المسلمون الذين تربوا في مدارس التبشير، ثم انضم إليهم المستغفلون من المسلمين..... (مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب، ص

(৫৮১)

“ইতিহাস বলে, সর্বপ্রথম আরব জাতীয়তাবাদের আওয়াজ তুলেছে লেবানন ও সিরিয়ার খ্রিষ্টানরা। আর তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওই সকল মুসলিম যারা (খ্রিষ্টান) মিশনারী পাঠশালায় লালিত হয়েছে। অতঃপর তাদের সঙ্গে মিলিত

হয়েছে মুসলিমদের থেকে স্থূলবুদ্ধির অধিকারী একটা অংশ।.....”^[১১১]

মুসলিম ভূখণ্ডে পশ্চিমাদের জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের দর্শন ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথারীতি মুসলিম নামধারী ‘আবনাউল মুস্তাশরিকিন’ প্রাচ্যবিদদের রুহানি সন্তান ও তাদের শিষ্যরা এগিয়ে এসেছে। কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা ও বিভিন্ন জাল হাদিসের আলোকে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের নামে জাতীয়তাবাদে ইসলামি রূপ দিতে কার্পণ্য করেনি। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা যারা পালন করেছে তাদের অন্যতম হলেন রিফাআ আততাহতাবি (১২১৬-১২৯০ হি.)। ড. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ হুসাইন তার “الإسلام والحضارة الغربية” (আলইসলাম ওয়ালহাযারা তুল গারবিয়া) গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে (পৃ: ১৮-৩০) বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। রিফাআ আততাহতাবি ও দেশাত্মবোধ সম্পর্কে তিনি বলেন,

وتأثر أعضاء البعثات بما شاهدوه في المجتمع الأوربي واضح فيما كتبوه أثناء إقامتهم في أوروبا أو بعد عودتهم منها، ونستطيع أن نلمس ذلك على سبيل المثل في عضوين من الجيل الأول لهؤلاء المبعوثين، أحدهما مصري أقام في باريس خمس سنوات من (٦٢٨١ إلى ١٣٨١)، وهو رفاة الطهطاوي، والآخر تونسي أقام في باريس أربع سنوات (٢٥٨١-٦٥٨١)، وهو خير الدين التونسي.

نستطيع أن نجد فيما كتبه كل منهما آراء مشتركة، هي صدى لتفكير القرن الثامن عشر في أوروبا، وفي فرنسا الثائرة بوجه خاص، وهي آراء تظهر للمرة الأولى في المجتمع الإسلامي، ربما ردهاها عن حسن قصد دون أن يسبرا أغوارها البعيدة أو يتعمقا حقائقها، ولكنهما على كل حال قد وضعوا البذور التي تعهدا من جاء بعدهما بالسقي والرعاية حتى نمت وضربت جذورها في الأرض، وربما عرضت بعض هذه الآراء عرضاً سريعاً عاجلاً قد يبدو ضئيل الخطر، ولكن أهمية الطهطاوي وخير الدين ترجع إلى أنهما قد جلبا هذه البذور الغربية وألقياها في التربة الإسلامية.

للمرة الأولى في البيئة الإسلامية نجد كلاماً عن الوطن والوطنية وحب

[১১১] মাযাহিবু ফিকরিয়া মুআসিরা, পৃ: ৫৮১

الوطن بالمعنى القومي الحديث في أوروبا، الذي يقوم على التعصب لمساحة محدودة من الأرض..... (الإسلام والحضارة الغربية لمحمد محمد حسين، ص ١٨-١٩)

“মিশনে পাঠানো সদস্যরা ইউরোপীয় সমাজে যা দেখেছে তা দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি তারা ইউরোপে অবস্থানকালীন বা সেখান থেকে ফিরে আসার পর যা লিখেছে তাতে স্পষ্ট। এই বাস্তবতা আমরা অনুভব করতে পারি উদাহরণস্বরূপ উক্ত প্রতিনিধিদলের প্রথম প্রজন্মের দুজন সদস্যের অবস্থান থেকে। একজন হচ্ছেন মিশরীয় যিনি প্যারিসে পাঁচ বছর (১৮২৬-১৮৩১ খৃ.) অবস্থান করেছেন; তিনি হচ্ছেন রিফাআ আতাতাহতাবি। অপরজন তিউনিসিয়ার অধিবাসী যিনি প্যারিসে চার বছর (১৮৫২-১৮৫৬ খৃ.) অবস্থান করেছেন; তিনি হচ্ছেন খাইরুদ্দিন আততুনিসি।

উভয়ে যা লিখেছে তাতে আমরা একই চিন্তাচেতনা দেখতে পাই। আর তা হচ্ছে ইউরোপীয় অষ্টাদশ শতক ও বিশেষকরে বিপ্লবী ফ্রান্সের চিন্তার প্রতিধ্বনি। এগুলো এমন মতবাদ যেগুলো প্রথমবারের মতো ইসলামি সমাজে প্রকাশ পেয়েছে। হয়তো উভয়ে এ সকল মতবাদের সুদূরপ্রসারী প্রকৃত অবস্থা যাচাই না করে এবং বাস্তবতার গভীরে না গিয়ে ভালো উদ্দেশ্যে এগুলো বিবৃত করেছে। কিন্তু সর্বাবস্থায় তারাই এগুলোর বীজ বপন করেছে, যেগুলোকে তাদের পরবর্তীরা পানি সিঞ্চন ও দেখাশোনা করে যত্ন নিয়েছে। এক পর্যায়ে এগুলো বেড়ে উঠেছে এবং জমিনে শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে। কখনো কোনো কোনো দর্শনকে তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিকভাবে পেশ করা হয়েছে বাহ্যত যেটির সমস্যা নগণ্য ছিল। কিন্তু তাহতাবি ও খাইরুদ্দিনের মাহাত্ম্য (?) এটি সাব্যস্ত হবে যে, তারাই এই পশ্চিমা বীজগুলো আমদানি করে ইসলামি মাটিতে ঢেলে দিয়েছে।

ইসলামি পরিবেশে প্রথমবারের মতো আমরা ইউরোপীয় আধুনিক জাতীয়তাবাদের অর্থে দেশ, দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমের কথা পাচ্ছি; যেটির ভিত্তি জমিনের নির্দিষ্ট অংশের সাম্প্রদায়িকতার উপর।.....”^[১২২]

রিফাআ আতাতাহতাবি তার "مناهج الألباب" (মানাহিজুল আলবাব) গ্রন্থে বিশেষকরে "حب الوطن" (দেশপ্রেম) এবং "الأخوة الوطنية" (দেশীয় ভ্রাতৃত্ব); এই দুই শিরোনামের অধীনে (পৃ: ১৩-৩০ ও ১২৫-১২৮) দেশ, দেশপ্রেম ও

[১২২] আলইসলাম ওয়ালহাযারাতুল গারবিয়া, পৃ: ১৮-১৯

দেশাত্মবোধের নামে জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতাকে ইসলামিকরণের পূর্ণ চেষ্টা চালিয়েছেন। কুরআন-হাদিসের স্পষ্ট 'তাহরিফ' অপব্যাখ্যা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। মজার বিষয় হলো, বর্তমানে দেশপ্রেম প্রমাণ করতে দলিল হিসেবে যা কিছু উল্লেখ করা হয়, তথা "حب الوطن من الإيمان" 'দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ'র মতো জাল হাদিস থেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হিজরতের সময় মক্কা থেকে উদ্দেশ্য করে বলা কথাগুলো;^[১২৩] সবই রিফাআ আততাহতাবি তার উক্ত গ্রন্থে দলিল হিসেবে আজ থেকে দেড়শ বছরের অধিককাল পূর্বে উল্লেখ করে গেছেন। প্রাচ্যবিদদের শিষ্য মডারেট গবেষকদের দর্শনগুলো তাদের দেওয়া দলিলসহ আজ মুসলিম সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে, "نعوذ بالله من ذلك"।

যাহোক, আমরা এখানে রিফাআ আততাহতাবির দ্বিতীয় শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত বক্তব্য থেকে একটি অংশ উল্লেখ করছি। তাহতাবি বলেন,

فجميع ما يجب على المؤمن لأخيه المؤمن منها يجب على أعضاء الوطن في حقوق بعضهم على بعض؛ لما بينهم من الأخوة الوطنية فضلاً عن الأخوة الدينية، فيجب أدباً لمن يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسين الوطن وتكميل نظامه فيما يخص شرف الوطن وإعظامه وغناؤه وثروته، لأن الغنى إنما يتحصل من انتظام المعاملات وتحصيل المنافع العمومية، وهي تكون بين أهل الوطن على السوية؛ لانتفاعهم جميعاً بمزية النخوة الوطنية. (مناهج الألباب المصرية في مباحج الآداب العصرية لرفاعة الطهطاوي، ص ١٢٦)

“সুতরাং একজন মুমিনের উপর তার অপর মুমিন ভাইয়ের জন্য যা কিছু আবশ্যিক, সবই একের উপর অপরের অধিকার হিসেবে দেশের সকল সদস্যের জন্যও আবশ্যিক হবে; যেহেতু দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের বাইরে তাদের মাঝে দেশীয় ভ্রাতৃত্ব রয়েছে। তাই নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এক দেশের সকলের জন্য আবশ্যিক হবে দেশের সৌন্দর্য বর্ধন এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা; যা দেশের মর্যাদা, গৌরব, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেননা, সমৃদ্ধি অর্জন হয় লেনদেনের শৃঙ্খলা ও সর্বজনীন সুবিধা

[১২৩] দেশপ্রেমের পক্ষে এই দলিল ও উক্ত জাল হাদিসের ব্যাপারে দেখুন, হাদিস ও উলুয়ুল হাদিস ১, পৃ: ১২৪-১২৮।

সাধিত হওয়ার মাধ্যমে। আর তা হবে দেশবাসীর সমানাধিকারের ভিত্তিতে। কারণ, সকলেই দেশীয় গর্বের বৈশিষ্ট্য দ্বারা উপকৃত হয়।”^[১২৪]

মুহাম্মাদ আবদুহুর শিষ্য মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা সাদ যাগলুলের (মৃ: ১৩৪৬ হি.) বক্তব্যও আমরা দেখতে পারি। দেশাত্মবোধের ব্যাপারে সাদ যাগলুলের অবস্থান ও বক্তব্য উল্লেখ করেছেন ড. আলি ইবনে নাকি আলউলইয়ানি তাঁর ‘আহাম্মিয়াতুল জিহাদ’ গ্রন্থে। উলইয়ানি বলেন,

وجاء سعد زغلول وقرت به أعين الإنكليز، فصرفت الثورة من ثورة دينية تنبع من الأزهر وتنادي بجهاد الكفار إلى ثورة وطنية تنادي بتحرير التراب يشترك فيها النصارى المصريون مع المسلمين لمحاربة النصارى الإنكليز، وقال قوله المشهورة: الدين لله والوطن للجميع.....

ثم قال سعد زغلول للمسلمين المصريين: لا تنادوا بشعارات إسلامية لكيلا يغضب إخواننا الأقباط المشاركون لنا في الثورة، وقد كان اشتراكهم مقصوداً ليكون لهم في الحكم نصيب. ثم ألف سعد حزب الوفد ونص في لائحته على تحريم الخوض في أي نقاش ديني، وأخذ القسس النصارى يدخلون الأزهر ويخرجون في المظاهرات..... (أهمية الجهاد، ص ১১২)

“অতঃপর সাদ যাগলুল আসলো, আর তার মাধ্যমে ইংরেজদের চক্ষু শীতল হলো। আযহার থেকে উদ্ভূত কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদি আহ্বানের দ্বীনি বিপ্লবকে সাদ যাগলুল ভূখণ্ডের স্বাধীনতার শ্লোগানে দেশাত্মবোধক বিপ্লবের দিকে নিয়ে গেল; যে বিপ্লবে ইংরেজ খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে মুসলিমদের সঙ্গে মিশরীয় খ্রিষ্টানরা সম্পৃক্ত থাকবে। এবং সে তার প্রসিদ্ধ কথাটি উচ্চারণ করল, ‘ধর্ম আল্লাহর আর রাষ্ট্র সবার’।.....

অতঃপর সাদ যাগলুল মিশরীয় মুসলিমদের বলল, ‘তোমরা ইসলামি শ্লোগান উচ্চারণ করো না; যেন এই বিপ্লবে আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমাদের কিবতি সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা রাগান্বিত না হয়ে যায়’। তাদের সম্পৃক্ততার উদ্দেশ্য ছিলো যাতে শাসনব্যবস্থায় তারা কোনো পদ পেয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সাদ (উদারপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন) ‘হিযবুল ওয়াফদ’ প্রতিষ্ঠা করল এবং সেটির

[১২৪] মনাহিজুল আলবাব, পৃ: ১২৬

ধারায় যেকোনো ধর্মীয় বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। আর খ্রিষ্টান যাজকরা আযহারে প্রবেশ করতে শুরু করল এবং বিক্ষোভ মিছিলে বের হতে লাগলো।.....”^[১২৫]

□ ‘হিকমত-মাসলাহাত’র নামে ‘মুতাওয়ারাস’ হুকুম পরিবর্তন করে দেওয়া

ফিকহে ইসলামির একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে, শরয়ি হুকুমের ভিত্তি শরয়ি ইল্লাত’র উপর, ‘হিকমত-মাসলাহাত’র উপর নয়। আবার এটিও বাস্তব যে, শরয়ি প্রত্যেক হুকুমের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ‘হিকমত-মাসলাহাত’ ও উদ্দেশ্য থাকে। তবে তাও নির্ধারণ হবে শরয়ি নীতিমালার আলোকে। অকাট্য ‘নস’র বিপরীতে ‘হিকমত-মাসলাহাত’ ও ‘মাকাসিদুশ শারিআ’র কথা বলে হুকুম পরিবর্তন করা মূলত প্রবৃত্তির অনুসরণ। কখনো কখনো ‘মাসলাহাত’র ভিন্নতায় যুগের পরিবর্তনে হুকুম পরিবর্তনের কথাও উসুলে ফিকহের কিতাবে উল্লেখ আছে। এসব কিছু আপন স্থানে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও মূল কথা সেটিই যা প্রথমে বলা হয়েছে। অর্থাৎ হুকুমের ভিত্তি ‘ইল্লাত’র উপর, ‘হিকমত-মাসলাহাত’র উপর নয়। ইমাম শাতেবি, ইমাম গাযালি ও শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবির ন্যায় উলামায়ে কেরাম যারা ‘মাকাসিদুশ শারিআ’ নিয়ে লিখেছেন, তারাও এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত ও খুবই চমৎকার আলোচনা করেছেন মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি তাঁর ‘উসুলুল ইফতা’ কিতাবে (পৃ: ২৪১-২৪৮)। আমরা সেখান থেকে পূর্ণ আলোচনা দেখে নিতে পারি।

কিন্তু প্রাচ্যবিদদের শিষ্য মডারেট গবেষকের দল হুকুমের মূল ভিত্তিই বানিয়ে নিয়েছে ‘হিকমত-মাসলাহাত’ ও ‘মাকাসিদুশ শারিআ’কে; তাও আবার তাদের ঘুণে ধরা আকল যেটিকে ‘হিকমত’ ও ‘মাসলাহাত’ সাব্যস্ত করে। আর সেটির ভিত্তিতে অকাট্য ‘নস’ ও ‘মুতাওয়ারাস’ হুকুমকে পরিবর্তন করতে বা পরিবর্তনের কথা বলতে দ্বিধা করেনি।^[১২৬] আমার দেখামতে ‘সিয়াসাতুন নাস’র বিষয়াদির

[১২৫] আহান্মিয়াতুল জিহাদ, পৃ: ৪১২

[১২৬] এখানে একটি বিষয় মনে রাখা উচিত, পূর্ববর্তীদের থেকে হাম্বলি মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মুহাক্কিক আলেম নাজমুদ্দিন তুফি (মৃ: ৭১৬ হি.) ‘নস’ এবং ‘মাসলাহাত’ বিপরীতমুখী হলে ‘মাসলাহাত’কে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছেন। তবে এটি তাঁর বড়ো ধরনের একটি পদস্বলন এবং ‘শায’ অভিমত। তাঁর এই মত কেউই গ্রহণ করেনি, বরং পরবর্তী অনেকেই এটির উপর আপত্তি করেছেন। কিন্তু মডারেটদের কাছে তুফির এই অবস্থান এতই পছন্দ হয়েছে, মুহাম্মাদ রশিদ রেযা বহু ক্ষেত্রে তুফির সে পদস্বলনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন।

পরিবর্তনের দাবি করে। এটি ভয়ংকর একটি দাবি, এর মাধ্যমে সকল শরিয়ী হুকুম অকার্যকর হয়ে পড়বে।.....

আমাদের সময়ে কিছু মানুষ আত্মপ্রকাশ করেছে যারা ‘মাকাসিদুশ শারিআ’ কথাটি আঁকড়ে ধরে শরিয়ী ‘নুসুস’র সামনে দাঁড় করাতে চায়। তাদের যুক্তি হচ্ছে, ‘শরিয়তে বিবৃত বিধিবিধানের কারণে কিছু মাসলাহাত বাস্তবায়ন হওয়া এবং কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন হওয়া। আর যেহেতু বাহ্যিক ‘নুসুস’র উপর আমল করতে গেলে বাহ্যত এ সকল মাসলাহাত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হয়, তাই আমরা ‘নুসুস’র বাহ্যিক অনুসরণে নয়, বরং এ সকল মাসলাহাত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুসরণে আদিশ্টি।’ এ ধরনের যুক্তি মূলত কাল্পনিক ও আন্দাজে নির্ণয় করা মাসলাহাত ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে পুরো শরিআতের ধ্বংস এবং শরিআতের ‘মুকাল্লাফ’ থেকে মুক্ত হওয়াকে আবশ্যক করবে।”^[১২৭]

মডারেট গবেষকের দল থেকে বিশেষকরে জামালুদ্দিন আফগানি, মুহাম্মাদ আবদুল ও মুহাম্মাদ রশিদ রেয়ার প্রতিটি গ্রন্থ, পুস্তিকা ও প্রবন্ধের পাতায় পাতায় বিষয়টি স্পষ্ট। তাদের যে কারও যেকোনো একটি ছোট্টো পুস্তিকা বা একটি প্রবন্ধ পড়লেও পাঠকের সামনে এটিই প্রতীয়মান হবে যে, সকল হুকুমের ভিত্তি হিকমত ও মাসলাহাতের উপর; তাও আবার তারা যেটিকে হিকমত ও মাসলাহাত মনে করেছে। বহু ক্ষেত্রে তারা আরো যে কাজটি করেছে সেটি হচ্ছে, শরিয়ী একটি হুকুমকে প্রথমে শুধুই দুনিয়াবি বা রাজনৈতিক তথা ‘ইস্তিযামি’ আখ্যা দেয়, আর এর মাধ্যমে হিকমত ও মাসলাহাতের কথা বলে হুকুম পরিবর্তনের দাবি তাদের জন্য আরো সহজ হয়ে যায়। তাদের আলোচনায় বিষয়গুলো এতই ব্যাপক; আমি এক-দুটি উদাহরণ পেশ করারও প্রয়োজন মনে করছি না। তবুও কারও ইচ্ছে হলে মুহাম্মাদ আবদুলের ‘আলইসলাম ওয়াননাসরানিয়া’ গ্রন্থের পৃ : ১৪৮ থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখতে পারি। তেমনিভাবে মুহাম্মাদ রশিদ রেয়ার ‘তাফসিরে মানার’ থেকে জিহাদ-কিতাল, ওয়ালা-বারা ও জিযা ইত্যাদি সংক্রান্ত আয়াতগুলোর তাফসির দেখে নিতে পারি; যেখানে তিনি তার এবং তার গুরু মুহাম্মাদ আবদুলের তাফসিরও উল্লেখ করছেন। আমি এখানে শুধু মুহাম্মাদ রশিদ রেয়ার দুটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। একটি তার তাফসির থেকে, আর অপরটি ফাতাওয়া থেকে। মুহাম্মাদ রশিদ রেয়া তাফসিরে মানারে বলেন,

التعارض بين المصلحة العامة وبين العمل ببعض النصوص؛ وهو يرجع في

[১২৭] উসুলুল ইফতা, পৃ: ২৪৪, ২৪৬

الحقيقة إلى التعارض بين النصوص، لأن مراعاة المصلحة مؤيدة بها، وقلما ترى في الكتب المتداولة بحثاً مشبعاً في هذه المسألة المهمة التي تتوقف عليها حياة الشريعة والعمل بها، وإنك ل ترى المشتغلين بالفقه لا يبالون بتقديم نصوص علماء مذاهبهم على العمل بما تحفظ به المصلحة العامة، فما بالك بنصوص الكتاب والسنة؟ ولم نر أحداً توسع في هذه المسألة كما توسع فيها نجم الدين الطوفي من أئمة الحنابلة. (تفسير المنار، ٥/٢١٢)

“সর্বজনীন ‘মাসলাহাত’ এবং কোনো ‘নস’ অনুযায়ী আমল করা বিপরীতমুখী সাব্যস্ত হওয়া; যেটি মূলত ‘নুসুস’র পারস্পরিক বিরোধ, কেননা মাসলাহাতের বিবেচনা ‘নুসুস’ দ্বারাই সমর্থিত। প্রচলিত কিতবাদিতে এই গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা তুমি খুব কমই পাবে; যে মাসআলার উপর শরিআতের প্রাণ এবং সে অনুযায়ী আমল করা নির্ভর করে। ফিকহ নিয়ে ব্যস্ত কাফেলাকে তুমি দেখবে, তারা এমন আমল যা দ্বারা সর্বজনীন মাসলাহাত রক্ষা পায়; সেটির উপর তাদের মাযহাবের আলেমদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কিছু তোয়াক্কা করে না, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহের ‘নুসুস’র ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? (অর্থাৎ তারা কুরআন-সুন্নাহর উপর হিকমতকে প্রাধান্য দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না)। এই মাসআলায় হাম্বলি ইমামদের থেকে নাজমুদ্দিন তুফি যেভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, কাউকে সে রকম বিস্তারিত আলোচনা করতে দেখিনি।”^[১২৮]

কাফেরদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা সংক্রান্ত আলোচনায় মুহাম্মাদ রশিদ রেয়া বলেন,

إن استشارة المسلمين لغيرهم ومشاركتهم في الرأي غير ممنوعة، وقد تكون مطلوبة إذا كان ذلك من مصلحة الأمة، لأن المصلحة هي الأصل في جميع الأحكام الدنيوية، حتى قال بعض علماءنا: إنها تقدم على النص إذا عارضته؛ كما نقلناه عن الطوفي. (فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، ٣/٨٠٨)

“মুসলিমরা অমুসলিমদের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং মতবিনিময়ে তাদের শরিক করা নিষেধ নয়। কখনো তা কাম্য হয় যদি তাতে উম্মাহর মাসলাহাত

الحقيقة إلى التعارض بين النصوص، لأن مراعاة المصلحة مؤيدة بها، وفلما ترى في الكتب المتداولة بحثاً مشبعاً في هذه المسألة المهمة التي تتوقف عليها حياة الشريعة والعمل بها، وإنك لترى المشتغلين بالفقه لا يبالون بتقديم نصوص علماء مذاهبيهم على العمل بما تحفظ به المصلحة العامة، فما بالك بنصوص الكتاب والسنة؟ ولم نر أحداً توسع في هذه المسألة كما توسع فيها نجم الدين الطوفي من أئمة الحنابلة. (تفسير المنار، ٥/٢١٢)

“সর্বজনীন ‘মাসলাহাত’ এবং কোনো ‘নস’ অনুযায়ী আমল করা বিপরীতমুখী সাব্যস্ত হওয়া; যেটি মূলত ‘নুসুস’র পারস্পরিক বিরোধ, কেননা মাসলাহাতের বিবেচনা ‘নুসুস’ দ্বারাই সমর্থিত। প্রচলিত কিতবাদিতে এই গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা তুমি খুব কমই পাবে; যে মাসআলার উপর শরিআতের প্রাণ এবং সে অনুযায়ী আমল করা নির্ভর করে। ফিকহ নিয়ে ব্যস্ত কাফেলাকে তুমি দেখবে, তারা এমন আমল যা দ্বারা সর্বজনীন মাসলাহাত রক্ষা পায়; সেটির উপর তাদের মাযহাবের আলেমদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কিছু তোয়াক্কা করে না, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহের ‘নুসুস’র ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? (অর্থাৎ তারা কুরআন-সুন্নাহর উপর হিকমতকে প্রাধান্য দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না)। এই মাসআলায় হাম্বলি ইমামদের থেকে নাজমুদ্দিন তুফি যেভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, কাউকে সে রকম বিস্তারিত আলোচনা করতে দেখিনি।”^[১২৮]

কাফেরদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা সংক্রান্ত আলোচনায় মুহাম্মাদ রশিদ রেযা বলেন,

إن استشارة المسلمين لغيرهم ومشاركتهم في الرأي غير ممنوعة، وقد تكون مطلوبة إذا كان ذلك من مصلحة الأمة، لأن المصلحة هي الأصل في جميع الأحكام الدنيوية، حتى قال بعض علماءنا: إنها تقدم على النص إذا عارضته؛ كما نقلناه عن الطوفي. (فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، ٣/٨٠٨)

“মুসলিমরা অমুসলিমদের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং মতবিনিময়ে তাদের শরিক করা নিষেধ নয়। কখনো তা কাম্য হয় যদি তাতে উম্মাহর মাসলাহাত

থাকে। কেননা সকল দুনিয়াবি বিধানের^[১২৯] ক্ষেত্রে মাসলাহাতই মূল। এমনকি আমাদের কোনো কোনো আলিম বলেছেন, মাসলাহাত ও 'নস' পরস্পরে বিরোধ হলে মাসলাহাতই প্রাধান্য পাবে; যেমনটি আমরা তুফি থেকে বিবৃত করেছি।^[১৩০]

'আবনাউল মুস্তাশরিকিন' মডারেট গবেষকদের মাধ্যমে মডারেট ইসলামি রাজনীতির সূচনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে আমরা উদাহরণস্বরূপ কিছু বিষয়ের আলোচনা করেছি। অন্যথায় 'সিয়াসাতে শারইয়্যা'র 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতির বিপরীতে পশ্চিমা দর্শনে ইসলামের রূপ দিয়ে মডারেট ইসলামি রাজনীতির যে সূচনা রিফাআ তাহতাবি, জামালুদ্দিন আফগানি ও মুহাম্মাদ আবদুহুরা করেছেন, সেটি পরবর্তী সময়ে তাদের শিষ্য ও শিষ্যদের শিষ্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। মুহাম্মাদ আবদুহুর শিষ্য কাসেম আমিন (১২৮০-১৩২৬ হি.) মহিলাদের পশ্চিমা স্বাধীনতার দাবি তুলে রচনা করেছেন "المرأة الجديدة" (আলমারআতুল জাদিদা)। তেমনিভাবে খিলাফত পতনের পরেই ১৩৪৪ হিজরিতে আযহারের একজন নামধারী আলিম আলি আবদুর রাযযাকের "الإسلام وأصول الحكم" (আলইসলাম ওয়াউসুলুল হুকুম) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে;^[১৩১] যাতে শাসনব্যবস্থা থেকে ধীনকে বাদ দেওয়ার মতো পাশ্চাত্য জাহেলিয়াতের দাবি করা হয়েছে। তাও আবার ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং পরিপূর্ণ ইসলামি শরিআর (?) আলোকে। কেমন যেন শাসনব্যবস্থা থেকে ধীনকে বাদ দেওয়াই ইসলামের একটি মৌলিক কাজ। এ বিষয়ে আলোচনা দেখুন ড. বিসতামি মুহাম্মাদ সায়িদ কর্তৃক রচিত গ্রন্থ "مفهوم تجديد الدين" (মাফহুমু তাজদিদিদ দিন), পৃ: ১৪৩-১৪৯। এভাবেই 'সিয়াসাতে শারইয়্যা'র 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতির বিপরীতে মডারেটদের দর্শনে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে এবং মডারেট ইসলামি রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

[১২৯] দুনিয়াবি বিধান বলতে শুধু 'ইস্তিযামি' বিষয় মনে করার কোনো সুযোগ নেই। মডারেট গবেষক কর্তৃক এই মূলনীতির প্রয়োগক্ষেত্র দেখলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

[১৩০] ফাতাওয়া মুহাম্মাদ রশিদ রেযা, ৩/৮০৮

[১৩১] আলি আবদুর রাযযাকের গ্রন্থের খণ্ডনে লেখা ড. মুহাম্মাদ যিয়াউদ্দিন আররিসের «الإسلام والخلافة» (আলইসলাম ফি আলইসলাম) «في العصر الحديث؛ نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم لمحمد ضياء الدين الرئيس نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم» (মুহাম্মাদ আলখাযির হুসাইনের «الإسلام وأصول الحكم» এবং মুহাম্মাদ বাখিত আলমুতিযির «لمحمد الخضر حسين» (নাকযু কিতাবিল ইসলাম ওয়াউসুলুল হুকুম) এবং মুহাম্মাদ বাখিত আলমুতিযির «حقيقة الإسلام وأصول الحكم لمحمد بخيت المطيعي» (হাকিকাতুল ইসলাম ওয়াউসুলুল হুকুম); কিতাবগুলো পড়া যেতে পারে।

□ প্রাচ্যবিদদের যোগ্য উত্তরসূরী ও মডারেট ইসলামি রাজনীতির রূপকার

‘মুস্তাশরিকিন’ ও তাদের শিষ্য মডারেট গবেষক রিফাআ তাহতাবি, জামালুদ্দিন আফগানি, মুহাম্মাদ আবদুহ, মুহাম্মাদ রশিদ রেযা ও আবুল আলা মওদুদি প্রমুখ যে সকল মডারেট দর্শন পেশ করেছেন, সেগুলোকে আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে মডারেট ইসলামি রাজনীতি; বরং মডারেট ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরবর্তীদের থেকে যারা অস্বাভাবিক অবদান (?) রেখেছেন, তাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলেন ড. ইউসুফ আলকারঘাবি। কুরআন-সুন্নাহের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ‘তাহরিফ’ অপব্যাখ্যা করে গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিটি ধারা-উপধারায় ইসলামের পোশাক পরানো এবং পরিবর্তিত পৃথিবীতে পরিবর্তিত ইসলামের রূপায়নে এই মডারেট মুফতির জুড়ি মেলা ভার। তার আদর্শিক ব্যক্তি কারা তা আমরা তার বক্তব্য থেকে দেখতে পারি। তিনি বলেন,

إن العلاج الفذ لما عليه المسلمون من ضعف وتمزق وانحطاط هو العودة إلى الإسلام الصحيح، كما دعا إلى ذلك المجددون الأصلاء مثل: جمال الدين والكواكبي ومحمد عبده ورشيد رضا وإقبال وحسن البنا وصادق الرافي وعباس العقاد وغيرهم من المفكرين ودعاة الإصلاح. (من أجل صحة راشدة ليوسف القرضاوي، ص ١٢٠)

“মুসলিমদের বর্তমান দুর্বলতা, বিচ্ছিন্নতা ও অধঃপতন থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় সহিহ ইসলামের দিকে ফিরে যাওয়া; যেটির প্রতি আত্মস্থান করেছেন প্রকৃত ‘মুজাদ্দিগণ’। যেমন: জামালুদ্দিন (আফগানি), কাওয়াকিবি, মুহাম্মাদ আবদুহ, রশিদ রেযা, ইকবাল, হাসান আলবান্না, সাদেক আররাফেয়ি ও আব্বাস আলআক্কাদ প্রমুখ মুফাক্কিরিন ও সংস্কারের দায়িগণ।”^[১০২]

কারঘাবি আরেকটি বক্তব্য আমরা দেখতে পারি। তিনি বলেন,

ولقد أفرزت أمتنا في العصر الحديث عباقرة وأفذاذاً في العلوم والآداب والفنون المختلفة، فلماذا تعقم أن تبرز مثل هؤلاء النوابغ في مجال الفقه والاجتهاد الإسلامي!! ومن ذا الذي ينكر نبوغ محمد عبده ورشيد

[১০২] মিন আজালে সাহওয়াতিন রাশিদা, পৃ: ১২০

رضا.....! (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للقرضاوي، ص ۱۱۲)

“বর্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্য ও বিভিন্ন শাস্ত্রে আমাদের জাতি অনেক প্রতিভাবান ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব জন্ম দিয়েছে। তাহলে কেনো ফিকহ ও ইসলামি ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ওই ধরনের প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে অক্ষম হবে? কে সে যে মুহাম্মাদ আবদুহ ও রশিদ রেযাদের প্রতিভা অস্বীকার করতে পারবে.....!”^[১৩৩]

কারযাবি পছন্দের আরেকজন শীর্ষ ব্যক্তি ছিলেন আবুল আলা মওদুদি। ইসলামি নেয়ামের মৌলিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে কারযাবি যাদের রচনাবলি থেকে উপকৃত হওয়ার আস্থান জানিয়েছেন, তাদের থেকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন আবুল আলা মওদুদির গ্রন্থের নাম। পরে পরে মওদুদির আরো কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। দেখুন, "ثقافة الداعية للقرضاوي" (সাকাতুদ দায়িআহ), পৃ: ৮৫-৮৬।

যাহোক, কেউ যদি শুধু ড. আতিয়া আদলানের "الأحكام الشرعية للنوازل" (আলআহকামুশ শারইয়্যা লিননাওয়াযিলিস সিয়াসিয়া) গ্রন্থটি সামনে রাখেন তিনি দেখবেন, আতিয়া আদলান গণতন্ত্রের যতগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রায় প্রতিটির বৈধতা ও সপক্ষে অবস্থান রয়েছে কারযাবির। গণতন্ত্রের দিকে আস্থানকারীদের প্রথম নাম তার, পৃ: ১৬৫। ইসলামি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলাদলির বৈধতার প্রবক্তাদের প্রথম নাম তার, পৃ: ২৩৩। ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার অধীনে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের বৈধতার দাবিদারদের প্রথম নাম তার, পৃ: ৩০৭। মহিলাদের সংসদসদস্য হওয়ার বৈধতার প্রবক্তাদের একজন তিনি, পৃ: ৩৮৩। কাফেরদের কেউ সংসদসদস্য হওয়ার বৈধতার প্রবক্তাদের একজন তিনি, পৃ: ৪০২। অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বৈধতার প্রবক্তাদের প্রথম নাম তার, পৃ: ৭২২। তেমনিভাবে ড. ফাহাদ ইবনে সালাহ আলআজলানের "الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي" (আলইনতিখাবাত ওয়াআহকামুহা ফিল ফিকহিল ইসলামি) গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে নির্বাচনকে 'শাহাদাত' আখ্যা দেওয়া ব্যক্তিদের একজন তিনি, পৃ: ৪২। মানবরচিত আইনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বৈধতার পক্ষে তিনি, পৃ: ৯০। মহিলা নির্বাচক হওয়ার বৈধতার পক্ষে তিনি, পৃ: ১০০। সর্বোচ্চ ক্ষমতার পদ (প্রেসিডেন্ট/প্রধানমন্ত্রী) ব্যতীত যেকোনো ক্ষমতার পদে মহিলাদের নিয়োগের বৈধতার পক্ষে তার অবস্থান, পৃ: ১৪৪। মহিলাদের সংসদসদস্য

[১৩৩] আলইজতিহাদ ফিশ শারিআতিল ইসলামিয়া, পৃ: ১১২

প্রাচী হওয়ার বৈধতার পক্ষে তিনি, পৃ: ১৮২। অমুসলিমদের কেউ সংসদসদস্য হওয়ার বৈধতার পক্ষে প্রথম নাম তার, পৃ: ২১২। শাসকের শাসনের মেয়াদ নির্ধারণ করার পক্ষে তার অবস্থান, পৃ: ৩৪১। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সুফলের পক্ষে তার বিবরণ, পৃ: ৪২৭। ইসলামি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলাদলির বৈধতার প্রবক্তাদের প্রথম নাম তার এবং এটির 'মাসলাহাত'র বিবরণের পক্ষে তার অবস্থান পৃ: ৪৪৪, ৪৪৫। কারযাবি "من فقه الدولة في الإسلام" (মিন ফিকহিদ দাওলা ফিল ইসলাম) গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এছাড়াও আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর আলআদিনি কর্তৃক কারযাবি খণ্ডনে রচিত "رفع اللثام عن مخالفة الفرضاي لشرعية الإسلام" (রাফউল লিসাম আন মুখালাফাতিল কারযাবি লিশারিআতিল ইসলাম) গ্রন্থ থেকে যদি শুধু 'সিয়াসাতুন নাস' বিষয়ে কারযাবি প্রাচ্যবিদদের দর্শনে প্রভাবিত হওয়ার বিষয়গুলো দেখি তাহলে আমরা দেখব, আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সঙ্গে হৃদয়তার দাবির পক্ষে তার অবস্থান, পৃ: ২৮, ৪৮-৫৩। আন্তঃধর্মীয় ঐক্যের পক্ষে তার অবস্থান, পৃ: ৫৪-৬২, ৭৮-৮৩। জিহাদকে 'দিফায়ি' আত্মরক্ষায় সীমাবদ্ধ করার প্রবক্তা তিনি, পৃ: ৬৩। ইহুদিসহ অন্যান্য কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ আকিদার কারণে নয়, বরং ভূখণ্ড রক্ষার জন্য; এই দাবির প্রবক্তা তিনি, পৃ: ৬৯-৭৪। গণতন্ত্র ও 'শুরা'কে একই কাজের দুটি পদ্ধতি আখ্যা দেওয়ার প্রবক্তা তিনি, পৃ: ৮৪-৯৩। মহিলারা সংসদসদস্য হওয়া এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বৈধতার পক্ষে তার অবস্থান, পৃ: ৯৪। ইসরাইলকে অভিবাদন জানানো ব্যক্তি তিনি, পৃ: ৯৯। দলাদলির পক্ষে তার অবস্থান ও সেটির সুফলের বিবরণ, পৃ: ১০১-১১৫। ইসলামি রাষ্ট্রে খ্রিষ্টানদের দল গঠনের পক্ষে তার অবস্থান, পৃ: ১১৬।^[১৩৪] মোটকথা, পশ্চিমা দর্শনের সঙ্গে মিল রেখে মডারেট ইসলামি রাজনীতির রূপরেখা পেশ করে মূলত কারযাবি তার আদর্শিক পূর্বপুরুষ 'মুস্তাশরিকিন' ও 'আবনাউল মুস্তাশরিকিন'র মিশন ষোলোকলায় সম্পন্ন করেছেন। এক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ ও সিরাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অপব্যখ্যা করতে দ্বিধা করেননি। 'কারযাবি' নিসবতের ব্যাখ্যা এভাবে করলে তার অবস্থানের সঙ্গে যথাযথ হবে, "اشتهر بالقرضاي، لأنه قرض الإسلام بمقراض تحريفاته"।

[১৩৪] কারযাবির অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য গ্রন্থটি পুরো অধ্যয়ন করা যেতে পারে। তেমনিভাবে ড. ইরশাদ আহমাদ বুখারির «تنبيه المسلمين من ضلالات يوسف القرضاوي» (তান্বিহুল মুসলিমিন মিন য়ালালাতি ইউসুফ আলকারযাবি) পুস্তিকাটি পড়লে সামগ্রিকভাবে কারযাবির অবস্থান সম্পর্কে জানা যাবে। তবে গ্রন্থদু'টি; বিশেষকরে প্রথমটি পড়ার ক্ষেত্রে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজের 'মাসলাক' ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে শরিআতের বিপরীত বা গোমরাহী আখ্যা দেওয়া হয়েছে; যা মোটেও যথাযথ হয়নি।

পরবর্তী মডারেটদের মধ্য থেকে কারযাবি বিষয়টি স্পষ্ট করেছি; যেহেতু মুফাক্কিরে ইসলাম হিসেবে তাকে খুব প্রসিদ্ধ করা হয়েছে এবং মডারেট ইসলামি রাজনীতির প্রবক্তারা; বিশেষকরে আবুল আলা মওদুদির অনুসারীরা তার অপব্যখ্যাগুলোকে তাদের বলা ও লেখায় পুনরাবৃত্তি করে, অন্যথায় এই মডারেট গবেষকদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। পাকিস্তানের মুলহিদ গামেদি ও তিউনিসিয়ার প্রখ্যাত ‘মুহাররিফ’ অপব্যখ্যাকারী রাশেদ গাননুশিও একই শ্রেণির লোক। কারযাবি পর্যায়ে না হলেও বহু ক্ষেত্রে মডারেট চিন্তায় প্রভাবিত, আর জিহাদকে; বিশেষকরে সিরিয়ার জিহাদকে নিষ্প্রাণ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী এবং আহলে সুন্নাহ ওয়ালজামাতের ঐকমত্যে কাফের নুসাইরি-আলাবি শিয়া, মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ হাজারো-লাখো আহলে সুন্নাহ ওয়ালজামাতের অনুসারীদের হত্যাকারী, রক্তচোষা পিশাচ স্বৈরাচার হায়েনা হাফেয আসাদ ও বাশশার আসাদের একনিষ্ঠ গোলাম সায়িদ রমায়ান বুতিও তাদের একজন।^[১৩৫]

[১৩৫] বিশেষ কিছু নাম উল্লেখ করেছি কারণ, মডারেট ইসলামি রাজনীতি ও জিহাদকে নিষ্প্রাণ করার আলোচনায় ইদনীং নামগুলো উচ্চারণ হচ্ছে। তবে এদের মধ্যে গামেদি ও গাননুশি অনেকটা অপরিচিত, তাই তাদেরকে নিয়ে বাড়তি কথা প্রয়োজন নেই। মূলত এ দেশে মডারেট চিন্তা প্রচারের ক্ষেত্রে আবুল আলা মওদুদি ও কারযাবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ হয়, আর জিহাদকে নিষ্প্রাণ করার ক্ষেত্রে ইদনীং কারযাবির সঙ্গে সঙ্গে সায়িদ রমায়ান বুতির নামও শোনা যায়। আবুল আলা মওদুদিকে নিয়ে বিশেষ কথা বলার প্রয়োজন নেই; কারণ, তার মডারেট চিন্তা ও গোমরাহি স্বীকৃতি। কারযাবি ও বুতিকে যেহেতু নতুন করে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে, তাই সুযোগ ও প্রয়োজন হলে এবং মুরব্বিগণ মুনাসেব মনে করলে আল্লাহ তাআলার তাওফিকে ভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে মডারেট মুফতি কারযাবি ও আহলে সুন্নাহ ওয়ালজামাতের রক্তচোষা পিশাচ হাফেয আসাদ ও বাশশার আসাদের সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র বুতির মুখোশ উন্মোচন করবো, ইনশাআল্লাহ। অবাক করা বিষয় হলো, এ ভূখণ্ডের দেওবন্দি মাসলাকের কেউ কেউ বুতির ‘ফিকহে আম’ থাকার দাবি করেছেন এবং তার ‘ফিকহুস সিরাহ’ গ্রন্থকে নেসাবভুক্ত করেছেন। কথা হলো, তার ‘ফিকহে আম’ এবং সিরাত থেকে নেওয়া ফিকহ তার মুখে দাড়ি রাখতে তো পারেইনি, বরং দুই হিংস্র কুকুর হাফেয আসাদ ও বাশশার আসাদের গোলামি করা থেকেও বিরত রাখতে পারেনি। দেওবন্দি মাসলাকের কতিপয় ব্যক্তি কি এত মিসকিন হয়ে গেলেন যে, «صَيِّدَنِيَا» (সইদনায়্য) কারাগারের ক্রমাঙ্কয়ে দুই কসাই নুসাইরি শিয়া শাসকের গোলামের গ্রন্থ থেকে ‘ফিকহুস সিরাহ’ নিতে হবে এবং জিহাদকে নিষ্প্রাণ করা ব্যক্তির গ্রন্থ থেকে জিহাদ বুঝতে হবে ও তার ফরূলা অনুযায়ী জিহাদের অনুশীলন করতে হবে। ‘ফিকহুস সিরাহ’ বোঝার জন্য কি চৌদ্দশ বছরের সালাফের কিতাব নেই বা আকাবিরে দেওবন্দের কিতাব নেই? আর জিহাদ বোঝা ও অনুশীলনের জন্য কি আহলে নববি থেকে চলে আসা জিহাদ ও আকাবিরে হিন্দের জিহাদের বিবরণ যথেষ্ট নয়? বুতির থেকে তো বোঝা ও অনুশীলনের বিষয় হওয়া উচিত পিশাচদের পা-চাঁটার কলা কৌশল। বুতি কর্তৃক তথাকথিত সালাফি ও আহলে হাদিসের বিরোধিতা ধীনি তাড়না থেকে নাকি শিয়া প্রীতির কারণে; তাও একটু ভেবে দেখা উচিত। নুসাইরি শিয়াদের গোলামের ব্যাপারে এমন ধারণা অমূলক হওয়ার কথা নয়। মজার বিষয় হলো, ‘রাষ্ট্র ও রাজনীতি’ নামক যে গ্রন্থের পর্যালোচনা সামনে আসবে সে গ্রন্থের লেখকের সম্পাদনায় সহযোগী লেখকের একটি পুস্তিকা আমার সংরক্ষণে আছে, যেটির শুরুতে বুতির পরিচয়ে বলা হয়েছে, ‘তিনি হাফেয আসাদ ও বাশশার আসাদের সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।’ প্রশ্ন হচ্ছে, এটি কি বুতির প্রশংসা হলো নাকি বুতির নির্লজ্জতা প্রমাণ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট? এই প্রশ্ন পাঠকের সামনে রেখে দিলাম। আরো মজার ব্যাপার হলো, তাদের মুফাক্কিরে ইসলাম কারযাবি তাদের ফিকহে যমান বুতিকে হত্যা বৈধ মর্মে ফাতওয়া দিয়েছেন; যেমনটি স্বয়ং ওই পুস্তিকাতেও ইঙ্গিত করা হয়েছে,

এ জাতীয় বহু মডারেট গবেষকের মাধ্যমে মডারেট ইসলামি রাজনীতির পথ সুগম হয়েছে এবং যুগের পর যুগ উম্মাহ এই মরীচিকার পেছনে মেধা ও শ্রম ব্যয় করে প্রতারণিত হয়ে চলছে।

□ মডারেট পদ্ধতিতে এক ইঞ্চি জায়গাতেও শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি

যেমনটি আমরা দেখেছি, সর্বযুগে আকাবিরে আসলাফ আহদে নববি থেকে চলে আসা 'সিয়াসাতে শারইয়্যা'র 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছেন এবং এখনও উম্মাহর 'গাইরত'সম্পন্ন কাফেলা সে পদ্ধতিতে শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে চলছে। বিপরীতে 'মুস্তাশরিকিন' ও 'আবনাউল মুস্তাশরিকিন' পাশ্চাত্য দর্শনে ইসলামের রূপ দিয়ে মডারেট ইসলামি রাজনীতির রূপরেখা দাঁড় করিয়েছে, আর মডারেট ইসলামি রাজনীতির প্রবক্তারা শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতি বাদ দিয়ে সে পথে বিভ্রান্ত হয়ে চলছে। শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারের এই মডারেট পদ্ধতির কড়ির সম্পৃক্ততা পূর্বের সঙ্গে সর্বোচ্চ একশ বছরের বা তারচেয়ে কিছু বেশি; তাও আবার সেটি যুগ পরম্পরায় সম্পৃক্ত 'মুস্তাশরিকিন' ও 'আবনাউল মুস্তাশরিকিন'র সঙ্গে। এই পদ্ধতি গোঁজামিল ও অপব্যখ্যায় ভরপুর, এই পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য দর্শনকে ইসলাম থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করার পেছনে ব্যর্থ চেষ্টা চলমান রাখতে হয়, এই পদ্ধতিতে কুফকারদের শেখানো বুলি আওড়াতে হয়, এই পদ্ধতিতে তাগুতদের তোষামোদ করতে হয়, এই পদ্ধতিতে পশ্চিমাদের সিস্টেমের গোলাম হওয়া আবশ্যিক, এই পদ্ধতিতে পরাশক্তির কাছে মাথা নোয়াতে হয়, এই পদ্ধতিতে ক্রুসেডারদের সামনে বিড়ালের মতো থাকতে হয়। এই পদ্ধতি কাপুরুষোচিত, এই পদ্ধতি লাঞ্ছনার, এই পদ্ধতি পরাজিত হয়ে থাকার, এই পদ্ধতি ক্ষতিকর, এই পদ্ধতি ভিত্তিহীন। এই পদ্ধতিতে আজ পর্যন্ত এক ইঞ্চি জায়গাতেও শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

□ আকাবিরের একাংশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও মডারেট ইসলামি রাজনীতির পার্থক্য

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া জরুরি মনে করছি। মডারেট ইসলামি

সে কারণে কিন্তু কারবাযি খারিজি হয়নি, বরং তার মুফাক্কিরে ইসলাম পদ বহাল আছে!!!! «ما زال الزمان يأتيينا»
«بكل عجب»

রাজনীতির আলোচনার পর স্বভাবত এই প্রশ্ন এসে যাবে যে, আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের একাংশও তো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন, তাহলে তাঁরা কি মডারেট দর্শনে প্রভাবিত ছিলেন?

এই প্রশ্নের জবাবে আমরা প্রথমে এক কথায় বলব, মাতায়ালাহ, আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ^[১৩৬] মডারেট দর্শনে প্রভাবিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না: "والأحرار، على الله أحداً"। তবে উভয় অবস্থানের পার্থক্যটা আমাদেরকে গভীর থেকে বুঝতে হবে। আমাদের আলোচনা হচ্ছে 'সিয়াসাতে শারইয়্যা'র 'মুতাওয়ারাস' পদ্ধতি নিয়ে; যেটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শারইয়্যা শাসনের পুনরুদ্ধার। মডারেট গবেষকের দল শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে পশ্চিমা পদ্ধতিতে টেনে নিয়ে গেছে এবং 'সিয়াসাতুন নাস'র অন্যান্য অনেক কিছুকে ইসলামের পোশাকে পাশ্চাত্য দর্শনে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেছে। বিপরীতে আকাবিরে দেওবন্দের একাংশ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও তাঁদের অধিকাংশ এটিকে শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারের মাধ্যম মনে করে তাতে অংশগ্রহণ করেননি। বরং তাঁদের অধিকাংশ এটিকে "أهون البليتین" 'আহওয়ানুল বালিয়াতাইন' (মন্দের ভালো) গ্রহণের মূলনীতি হিসেবে কিছু ফায়দা হওয়া বা 'আমর বিলমা'রুফ'র শিরোনামে তাতে অংশগ্রহণ করেছেন।^[১৩৭] আর মডারেটদের ন্যায় গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিটি ধারা-উপধারা এবং পশ্চিমা বিভিন্ন দর্শনে ইসলামি পোশাক পরানোর তো প্রশ্নই আসে না।^[১৩৮] বরং আকাবিরে দেওবন্দের বিশাল কাফেলা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন।^[১৩৯]

আমরা যদি আকাবিরে দেওবন্দের অবস্থান শুরু থেকে একটু পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব, শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি একেবারে শেষ

[১৩৬] বাস্তবে যারা সর্বস্বীকৃত আকাবিরে দেওবন্দ তারা উদ্দেশ্য। অন্যথায় এমন অনেকে আছেন যারা নিজেদেরকে দেওবন্দের দিকে নিসবত করে এবং তাদের অনুসারীরা তাদেরকে আকাবির মনে করে, কিন্তু বাস্তবে তারা এই তালিকায় আসার অধিকার রাখে না; তারা আমার আলোচনার উদ্দেশ্য নয়।

[১৩৭] এ কথা ভিন্ন আলোচনার বিষয় যে, এই শিরোনামে অংশগ্রহণও শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ হয়েছে কি না বা এর মাধ্যমে ফায়দা বেশি হয়েছে নাকি ফায়দার চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়েছে। এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে এবং তা থাকা স্বাভাবিক। তবে এখানে এটি আলোচনার বিষয় নয়।

[১৩৮] এক্ষেত্রে আকাবিরে দেওবন্দ থেকে একেবারে সীমিত কয়েকজন গণতান্ত্রিক নির্বাচনসহ আরো কিছু সাধারণ বিষয়কে ইসলামের সঙ্গে সমঞ্জস করেছেন যাদের বড়োত্ব, গ্রহণযোগ্যতা, ধর্মের জন্য অতুলনীয় খিদমাহ ও ইখলাস আপন স্থানে স্বীকৃত। তবে এগুলোকে আমরা তাদের হাজারো সঠিকতার মাঝে সামান্য কিছু পদত্বলন মনে করি; যা থেকে অস্থিরা আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত কেউ মুক্ত থাকেননি। এ ছাড়াও তাঁরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তা করেছেন সেটির ব্যাখ্যা মূল গ্রন্থে নির্বাচনের 'ফিকহি তাকয়িফ'র আলোচনায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

[১৩৯] 'মুসলিমবিশ্ব ও সমকালীন মাসায়েল' (পৃ: ১৩৮-১৬৫) গ্রন্থ থেকে আমরা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যাপারে আকাবিরে দেওবন্দের বক্তব্য ও অবস্থান দেখে নিতে পারি।

জীবনে এবং সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানিসহ আকাবিরে দেওবন্দের যারা মুসলিম ও হিন্দু মিলে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইংরেজদেরকে হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত করার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তাদের কেউ এটিকে শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যম মনে করেননি। তাদের এই পদক্ষেপের সম্পর্ক ছিলো শুধুই ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করার সঙ্গে। তেমনিভাবে সাইয়েদ মাদানি কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বন করেছেন মন্দের ভালো হিসেবে। কিন্তু এভাবে একদিন শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফিকির সাইয়েদ মাদানির কল্পনাতেও আসার কথা নয়। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি কেউ এমনটি প্রমাণ করতে পারবে না যে, শাইখুল হিন্দ বা সাইয়েদ মাদানি এটিকে শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারের মাধ্যম মনে করতেন। শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে 'আবনাউল মুস্তাশরিকিন'র মডারেট রূপের রূপকার হিসেবে শাইখুল হিন্দ বা সাইয়েদ মাদানির নাম নেওয়া তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট 'ইফতিরা' অপবাদ।

এবার আমরা পাকিস্তান প্রসঙ্গে আসি। পাকিস্তানের বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন। পাকিস্তানের যেহেতু জন্মই হয়েছে ইসলামের শিরোনামে এবং আকাবির উলামায়ে কেরামের সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে, তাই তাঁরা মনে করছিলেন খুব সহজেই এখানে শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানি সহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম কর্তৃক তৈরি করা "قرارداد مقاصد" 'করারদাদে মাকাসেদ' ১৩ জুমাদাল উলা ১৩৬৮ হিজরিতে পাসও করা হয়েছিল; যদিও পাকিস্তান শাসনব্যবস্থা কখনো 'করারদাদে মাকাসেদ'র আশেপাশেও আসেনি। শাসকশ্রেণি উলামায়ে কেরামকে বারবার ধোঁকা দিলেও তাঁরা মনে করছিলেন, যেহেতু এই দেশের জন্ম ইসলামের শিরোনামে, 'করারদাদে মাকাসেদ'ও পাস করা আছে এবং স্বভাবতই অধিকাংশ জনগণ এটিই কামনা করবে। সুতরাং তাদের দেওয়া ফর্মুলা অনুযায়ী চলেও আমরা শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে পারব।^[১৪০] এসব বিবেচনায় পাকিস্তানের উলামায়ে কেরামের একাংশ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে তাঁদের ধারণা যে যথাযথ ছিলো না; এত বছর পরেও তা উপলব্ধি না করা এবং তা থেকে শিক্ষা না নেওয়ার বিশেষ কোনো কারণ নেই।

যাহোক, যে কথাটি আমরা বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে, তাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও ব্যাপকভাবে গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সকল ধারা-উপধারাকে ইসলামি পোশাক পরানোর চেষ্টা করেননি। বরং পরবর্তী সময়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং সংসদসদস্য হওয়া কেউ কেউ তা থেকে ফিরে এসেছেন এবং এই পদ্ধতির

[১৪০] বলা যায়, এই প্রেক্ষাপটেই মুফতি মুহাম্মাদ শফি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের 'ফিকহি তাকয়িফ' করেছিলেন।

কুফল স্পষ্ট করেছেন। এছাড়াও ব্যাপকভাবে পাকিস্তানের উলামায়ে কেরাম গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির কঠিন বিরোধিতা করেছেন। বরং গণতন্ত্রের বিরোধিতায় সবচেয়ে বেশি বক্তব্য পাওয়া যায় পাকিস্তানি উলামায়ে কেরামের। কারণ তাঁরা শাসকশ্রেণির ধোঁকা, গণতন্ত্রের প্রতারণা এবং এ পদ্ধতিতে শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ার বিষয়টি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। যারা এখনও সে পথে চলছেন তাদের সাথেও কথা বললে হয়তো দেখা যাবে, তারা এই পদ্ধতিতে শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ধারণা পোষণ করেন না, বরং মন্দের ভালো বা কিছু ফায়দা হবে; এমন কিছুই বলবেন।

বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করলেও আমরা এমনটিই দেখতে পাই। আমাদের যে সকল আকাবির গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের বক্তব্যগুলো আমরা কমপক্ষে ‘মুসলিমবিশ্ব ও সমকালীন মাসায়েল’ গ্রন্থ থেকে দেখতে পারি। হাফেজী হুজুর খ্রিষ্টানদের রেখে যাওয়া রাজনীতিকে নাজায়েজ আখ্যা দিয়েছেন। মাওলানা আতহার আলি সিলেটি প্রচলিত রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও তার ছেলেকে প্রচলিত রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ওসিয়ত করেছেন। শাইখুল হাদিস আযিযুল হক প্রচলিত নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামি নীতি আদর্শের প্রতিফলন খুব কঠিন আখ্যা দিয়েছেন। মুফতি আমিনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়টিকে কুফরি রাষ্ট্রব্যবস্থা আখ্যা দিয়ে মন্দের ভালো হিসেবে গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ-হাফিয়াহুল্লাহ-এ ব্যবস্থায় শান্তি বা কল্যাণের আশা করা যায় না এবং এ পদ্ধতিতে সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান লোকদের সরকার গঠিত হওয়াকে অনেকটা অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন। এছাড়াও মাওলানা নুর হুসাইন কাসেমি ও মুফতি ওয়াক্কাসের বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যের আলোকে আমার কাছে স্পষ্ট, তাঁরা এটিকে ‘আমর বিল মারুফ’ হিসেবে দেখতেন। সুতরাং বাংলাদেশের আকাবির উলামায়ে কেরামের অবস্থানের আলোকে আমাদের সামনে স্পষ্ট, তাঁরা এই মডারেট পদ্ধতিকে শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেননি। বরং সেটিকে মন্দের ভালো বা ‘আমর বিল মারুফ’ হিসেবে দেখেছেন। আর আমাদের আকাবির উলামায়ে কেরাম কর্তৃক গণতন্ত্রের সকল ধারা-উপধারাকে ইসলামের পোশাক পরানোর তো কল্পনাই করা যায় না। বরং সর্বযুগেই দেওবন্দি মতাদর্শের সিংহভাগ উলামা-তলাবা গণতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে দূরেই থেকেছেন।

মোটকথা, আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের একাংশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও মডারেট ইসলামি রাজনীতির রূপায়ণের মাঝে যে পার্থক্য আমাদের সামনে স্পষ্ট তা হচ্ছে, প্রথমত: আকাবিরে দেওবন্দের একাংশ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

করলেও ব্যাপকভাবে তাঁরা এটিকে শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেননি; যেমনটি মডারেটরা করেছে। দ্বিতীয়ত : আকাবিরে দেওবন্দ পাশ্চাত্য বিভিন্ন দর্শন তো দূরের কথা, গণতান্ত্রিক ধারা-উপধারাতেও ব্যাপকভাবে ইসলামের পোশাক পরানোর চেষ্টা করেননি; যেটি মডারেটরা করেছে। হিন্দুস্তান তথা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে মডারেট ইসলামি রাজনীতির পথে হেঁটেছে আবুল আলা মওদুদির অনুসারীরা। তারা বহুকাল আগ থেকেই বক্তৃতা ও লিখনির মাধ্যমে তা করে চলছে। ‘মুসলিমবিশ্ব ও সমকালীন মাসায়েল’ গ্রন্থ (পৃ : ১৫০) থেকে আমরা অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য দেখতে পারি। এছাড়াও কিছুদিন পূর্বে মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন সাইদির একটি বক্তব্য শুনলাম; যেটির মূল কথা হচ্ছে, ‘গণতন্ত্র যদি হারাম হয় তাহলে শাসক পরিবর্তন হবে কীভাবে’! মুহতারাম মরহুমের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করতে চাই না যে, তিনি এই বক্তৃতা প্রদানকালে সাড়ে তেরোশ’ বছরের ‘সিয়াসাতে শারইয়্যা’র ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন।^[১৪১] আফসোসের বিষয় হচ্ছে, দেওবন্দিয়াতের দিকে নিজে থেকে নিসবত করা কেউ কেউ বর্তমানে মওদুদিপন্থীদের প্রচার করা সেই মডারেট ইসলামি রাজনীতি নতুন করে গিলানোর চেষ্টা করছেন।

[১৪১] ওই বক্তব্যে তিনি প্রশাসনকে আহ্বান করেছেন এ ধরনের লোকদের গ্রেফতার করার জন্য। মুহতারাম মরহুমের ওই আহ্বান এবং পরবর্তী অবস্থা থেকে শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু আছে। আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী ব্যক্তিদেরকে তাগুতের হাতে তুলে দেওয়ার সময় চিন্তা করা উচিত, এই তাগুত একদিন ইসলামি আদর্শের প্রবক্তা হওয়ার কারণে আমাদের গ্রেফতার করতে পারে। কারণ, তাগুত আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির শত্রু নয়, বরং পুরো ইসলামের শত্রু। প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে নিঃশেষ করাই তাদের কাজ। শুনেছি, মুহতারাম মরহুম নাকি শেষ জীবনে এ সকল বক্তব্যের কারণে অনুতপ্ত হয়েছেন এবং পূর্বের অনেক অবস্থান থেকে ফিরে এসেছেন। মাযলুম হওয়ার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের সবাইকে সব ধরনের তুলত্রাস্তি থেকে হিফাযত করুন, আমিন।

তিন. 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি': মডারেট ধারায় রচিত একটি গ্রন্থ

সম্প্রতি 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি' নামে একটি বই প্রকাশ হয়েছে, যাতে লেখক হিসেবে মুহতারাম মাওলানা আবু সাবের আবদুল্লাহ -হাফিয়াহুল্লাহ- এর নাম দেওয়া আছে। মুহতারাম মাওলানা আবু সাবের আবদুল্লাহ -হাফিয়াহুল্লাহ- আমার জানামতে একজন মুখলিস ব্যক্তিত্ব, "ولا أَرْكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا"। দরস-তাদরিস ও 'তাসনিফ'-গ্রন্থ রচনা যার 'মাশগালা' এবং বহু মাদরাসায় তিনি সহিহ বুখারির দরস দিয়ে থাকেন। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করেন বলেই আমি জানি। মুহতারামের সঙ্গে আমার যতবার সাক্ষাত হয়েছে, তাঁকে অত্যন্ত বিনয়ী মনে হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বহু ক্ষেত্রে আমার প্রতি মুহতারামের আন্তরিকতা অনুভব করেছি। আমার দরসি উস্তায় না হলেও আমি মুহতারামকে আমার উস্তায়তুল্য মনে করি। এছাড়াও একাধিক দিক থেকে তিনি আমার আত্মীয়ও বটে।

এসব কিছু আপন স্থানে ঠিক হওয়া সত্ত্বেও আমি মুহতারামকে ছোটো করার জন্য নয়, বরং বাস্তবতার আলোকে যে কথা নিঃসংকোচে বলতে পারি সেটি হচ্ছে, বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে কলম ধরতে যে বিষয়গুলো গভীর থেকে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা জরুরি, তথা আহদে নববি থেকে 'সিয়াসাতে শারইয়্যা'র পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, খিলাফতে ইসলামিয়াকে দুর্বল ও বিলুপ্তির পেছনে বিশ্বব্যাপী ইহুদিদের গুপ্তসংঘ 'ফ্রিম্যাসন'র ষড়যন্ত্র ও তুর্কিস্তানে ডোনমে ইহুদিদের অপতৎপরতার বাস্তবতা, ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশ্ব কুফরি শক্তির দীর্ঘমেয়াদি অভিসন্ধির সঠিক চিত্র, 'মুস্তাশরিকিন-প্রাচ্যবিদদের সূক্ষ্মভাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করা ও মুসলিম নামধারী 'আবনাউল মুস্তাশরিকিন' ও প্রাচ্যবিদদের শিষ্যদের ব্যবহৃত হওয়ার বিস্তৃত ইতিহাস, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বিশ্ব রাজনীতিতে শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের ছোঁয়া লাগার দৃশ্যপট, 'ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার' থেকে 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' পর্যন্ত পৃথিবীর বাস্তবতা, জাতিসংঘ গঠনের পর্দার আড়ালের চিরবাস্তব কথা, বিশ্বব্যাপী র‍্যাড কর্পোরেশন ও ইন্টারফেইথ এবং বাংলাদেশে মুভ ফাউন্ডেশন ও কোয়ান্টাম মেথডের অপতৎপরতার বিবরণ এবং সর্বোপরি বর্তমান পৃথিবীর নাটকীয়তা ইত্যাদির ব্যাপারে পরিপূর্ণ বেখবর থেকে বা যথাযথ অধ্যয়ন না করেই মুহতারাম

রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে কলম ধরেছেন। তাই পদে পদে যে পদাঙ্কলন হওয়ার তাই হয়েছে।

মুহতারাম তাঁর বইয়ের শুরুতে কিছু অধ্যায়ে আবুল আলা মওদুদীর কিছু ভুল দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন করেছেন; যা সঠিক করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুরো বইয়ে মওদুদী ও মওদুদীপন্থীদের মডারেট ইসলামি রাজনীতির চিত্রই তুলে ধরেছেন। পার্থক্য হয়েছে, তিনি মওদুদীর ভাষ্যে তুলে না ধরে মওদুদীকে যিনি বা যারা আদর্শ পুরুষ মনে করেন; তথা কারযাবি প্রমুখের ভাষ্যে তা পেশ করেছেন। অর্থাৎ মওদুদীকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়েও মওদুদীর কথাই অন্যের মুখ থেকে গ্রহণ করেছেন। মডারেট ইসলামি রাজনীতি প্রতিষ্ঠার কাজ কারযাবি ও অন্যান্যরা বিশ্বব্যাপী এবং মওদুদীপন্থীরা ভারতবর্ষে বহু আগ থেকেই করে আসছে। মুহতারামের এই বইয়ের মাধ্যমে বাড়তি যে কাজ হয়েছে সেটি হলো, আরবি প্রবাদ "ما زاد الطين إلا بلة" এর বাস্তবরূপ সামনে এসেছে; যেটি আজ পর্যন্ত আমার জানামতে কোনো আকাবিরে দেওবন্দ করেননি। কারও থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু প্রকাশ পেলেও পুরো মডারেট রাজনীতিতে ইসলামের পোশাক কেউ পরাননি। আল্লাহ তাআলা আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দকে এটি থেকে মাহফুয রেখেছেন। মওদুদীর ব্যাপারে আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ যে মন্তব্য করেছেন; অর্থাৎ তার কথা মধু, কিন্তু তা বিষমিশ্রিত। মুহতারামের বইয়েও যেহেতু মওদুদীর মডারেট পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে, তাতেও বিষমিশ্রিত মধুর ছড়াছড়ি রয়েছে। উক্ত বইয়ের পর্যালোচনায় আমরা বিষয়গুলো স্পষ্ট প্রমাণসহ দেখতে পাব, ইনশাআল্লাহ।

□ মডারেট ধারায় রচিত হওয়ার প্রমাণে নমুনাস্বরূপ দুটি উদাহরণ

যে সকল বিষয়ে মুহতারাম 'আবনাউল মুস্তাশরিকিন' মডারেট গবেষকদের পথে হেঁটেছেন, তা থেকে দুটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করছি; যাতে পাঠক বাস্তবতা অনুভব করতে পারে। বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষ অধ্যায়ে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

এক. মুরতাদের ব্যাপারে তিনি লিখেছেন,

“পরিস্কার মুরতাদ, যার কারণে ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য অমূলক ভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নিরাপত্তা হুমকিতে পড়ে, তার সম্পর্কে (ইসলামি আদলতকে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়ে বলেছেন "من بدل دينه فاقتلوه" 'যে মুসলমান দীন ত্যাগ করবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে'।^[১৪২]

পাঠক যারা 'বিশ্বাসের স্বাধীনতার দাবি ও মুরতাদের হত্যার শাস্তি অস্বীকার করা' শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত আলোচনা পড়েছেন তারা বুঝতে পারছেন, মুরতাদকে হত্যা করার ক্ষেত্রে এ ধরনের শর্ত কারা যুক্ত করেছেন। মডারেটদের এই অবস্থানের বিপরীতে মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি (হাফিযাহুল্লাহ) এর বক্তব্যটি আবারও উল্লেখ করছি। মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি বলেন,

إن مسألة قتل المرتد كلمة إجماع فيما بين المسلمين من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وقد أطبقت الفقهاء على أن الارتداد في دار الإسلام جريمة من الجرائم عقوبتها القتل، ولا نعلم لذلك مخالفاً من فقهاء الأمة وعلماءها، حتى جاء القرن الرابع عشر فطعن أهل الغرب في هذا الحكم بأنه مضاد لمبدأ حرية التفكير وحرية الاعتقاد. فحاول بعض المغرمين بالأفكار الغربية من المنتمين إلى الإسلام أن يدفعوا هذا الطعن بإنكار أن تكون عقوبة المرتد القتل في الإسلام، كأن هذا الحكم وصمة في جبين الإسلام يريد هؤلاء أن يمحوها -والعياذ بالله العظيم-، فألفوا من أجل ذلك مقالات ادعوا فيها أن الإسلام لم يجعل القتل عقوبة الارتداد، وإنما جعله جزاء للمحاربة والبغي. (تكملة فتح الملهم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين، مسألة قتل المرتد، ১৮৬/২-১৮৭)

“মুরতাদকে হত্যা করার মাসআলা সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে বর্তমান পর্যন্ত মুসলিমদের মাঝে একটি ‘ইজমায়ী’ ঐক্যমত্যের বিষয়। ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, দারুল ইসলামে ‘ইরতিদাদ’ ইসলাম ত্যাগ করা এমন একটি অপরাধ যেটির শাস্তি হত্যা। আমাদের জানামতে উম্মাহর ফুকাহা-উলামা থেকে কেউ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেনি। হ্যাঁ! চতুর্দশ শতকে এসে পশ্চিমা এই বিধানের উপর আপত্তি করে বসল যে, এটি চিন্তার স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তখন মুসলিম নামধারী পাশ্চাত্য

দর্শনে আসক্ত কতিপয় ব্যক্তি এই আপত্তি অপনোদনের প্রচেষ্টায় ইসলামের মুরতাদের শাস্তি হত্যাকে অস্বীকার করল। কেমন যেন এই বিধান ইসলামের ললাটে একটি কলঙ্ক, যা তারা মুছে দিতে চাচ্ছে -নাউযুবিল্লাহ-। এর ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করে দাবি করল যে, ইসলাম 'ইরতিদাদ'র শাস্তি হত্যা সাব্যস্ত করেনি, বরং হত্যাকে যুদ্ধ ও বিদ্রোহের শাস্তি আখ্যা দিয়েছে।^[১৪৩]

অতঃপর মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি দীর্ঘ আলোচনায় মডারেটদের যুক্তি খণ্ডন করেছেন এবং শুধু মুরতাদ হওয়ার শাস্তিই যে হত্যা; বহু হাদিসের আলোকে তা প্রমাণ করেছেন। অতিরিক্ত শর্ত অবান্তর হওয়ার বিষয়টিও তাঁর আলোচনা থেকে স্পষ্ট। বিস্তারিত দেখুন, 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ২/১৮৭-১৯২।

'ইরতিদাদ'র শাস্তি হত্যা হওয়ার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে সকল উলামায়ে কেরাম একমত। চার মাযহাবের ফিকহি কিতাবের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট। আমরা পূর্ববর্তী দুজন ইমামের 'ইজমা'র দাবি উদ্ধৃত করছি।

ইমাম ইবনুল মুনিয়র (মৃ: ৩১৮ হি.) বলেন,

وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب، قتل؛ ولا أحفظ فيه خلافاً. (الإجماع لابن المنذر، كتاب المرتد، الرقم: ৭৮৮، ص ১৭৬)

"আহলে ইলম এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো গোলাম মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা না করে তাকে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে আমার কোনো মতানৈক্য জানা নেই।"^[১৪৪]

এ ব্যাপারে গোলাম ও আযাদের মাঝে পার্থক্য নেই।

ইমাম ইবনে কুদামা আলমাকদিসি (মৃ: ৬২০ হি.) বলেন,

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك؛ فكان إجماعاً. (المغني لابن قدامة، كتاب المرتد، ৭৬/১০)

"মুরতাদের হত্যা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে সকল আহলে ইলম একমত। এমনটি বর্ণিত হয়েছে আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, মুয়াজ্জ, আবু মুসা, ইবনে আব্বাস ও খালেদ রাঃ প্রমুখ থেকে। এটির উপর কোনো আপত্তি

[১৪৩] তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ২/১৮৬-১৮৭

[১৪৪] আলইজমা, পৃ: ১৭৪

হয়নি, সুতরাং 'ইজমা' সাব্যস্ত হয়ে গেছে।^[১৪৫]

এ ব্যাপারে খুবই বিস্তারিত ও চমৎকার আলোচনা করেছেন ড. ফাদি বাহিজ মুসা তার "مدارك التكفير لفادي بهيج موسى" (মাদারিকুত তাকফির) কিতাবে। সচেতন পাঠক সেখান থেকে (পৃ: ৬৬১-৭২২) পূর্ণ আলোচনা দেখে নিতে পারেন। আমরা আমাদের গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা পেশ করবো, ইনশাআল্লাহ।

দুই. 'জিয়য়া' সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি লিখেছেন,

"অমুসলিম কর্তৃক আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামি আইনের বশ্যতা স্বীকার করার পর তারা সকল নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সমস্তরের। এক্ষেত্রে আইনগতভাবে তাদের দ্বিতীয় বা নিচু শ্রেণীর নাগরিক মনে করার কিছু নেই।"^[১৪৬]

এর পূর্বে "حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" এর অনুবাদ এক জায়গায় তিনি করেছেন, "যাবৎ না তারা অধীন হয়ে জিয়য়া আদায় করে।" (পৃ: ৩৭) অপর স্থানে অনুবাদ করেছেন, "যাবৎ না বশ্যতা স্বীকার করে আনুগত্যের সাথে জিয়য়া প্রদান করে।" (পৃ: ২৫০)

পাঠক যারা 'যিম্মিদের স্বাধীনতা-সমানাধিকারের দাবি এবং জিয়য়ার ব্যাপারে কৈফিয়ত দান' শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত আলোচনা পড়েছেন তারা বুঝতে পারছেন, মুহতারাম এই মাসআলায় কাদের পথে হেঁটেছেন! আয়াতের 'সাগিরুন' শব্দই যিম্মিদের দ্বিতীয় বা নিচু শ্রেণির নাগরিক সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। তবে এ বিষয়ে আমরা সাহায্যে কেরামের যুগ থেকে সালাফের বক্তব্য ও ফিকহে ইসলামির আলোকে আমাদের গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। এখানে শুধু 'সাগিরুন' শব্দ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলছি।

মুহতারাম মূলত 'সাগিরুন' শব্দের অর্থ আর সেটির পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য না করে উভয়টিকে এক করে ফেলেছেন। 'সাগিরুন' অর্থ লাঞ্চিত; তা অকাটা একটি বিষয়। তবে তাদের লাঞ্চিত হওয়ার জন্য কি শুধু জিয়য়া প্রদান বা তাদের উপর ইসলামি শাসন জারি হওয়াই যথেষ্ট নাকি আরো বাড়তি কিছু করা হবে। ইমাম শাফেয়ি একাধিক আহলে ইলম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের 'সাগার'-লাঞ্ছনা হচ্ছে তাদের উপর ইসলামি শাসন জারি হওয়া। আর অনেক আহলে ইলম তাদের 'সাগার'-লাঞ্ছনা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আরো ভিন্ন ভিন্ন কিছু

[১৪৫] আলমুগনি, ১০/৭৪

[১৪৬] রাষ্ট্র ও রাজনীতি, পৃ: ২৫০-২৫১

যোগ করেছেন। কেউ বলেছেন, যিম্মিকে পায়ে হেঁটে আসতে হবে, বাহনে করে আসতে পারবে না। কেউ বলেছেন, যিম্মি তা দাঁড়িয়ে আদায় করবে, আর যিনি গ্রহণ করবেন তিনি বসে গ্রহণ করবেন। কেউ বলেছেন, তার ঘাড় ধরে ধমক দিয়ে তা গ্রহণ করা হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। (বিস্তারিত দেখুন, আহাম্মিয়াতুল জিহাদ, পৃ: ৩৮২-৩৮৩)। তো মতানৈক্য হয়েছে ‘সাগার’-লাঞ্ছনা সাব্যস্ত হওয়ার পদ্ধতিতে, অর্থের ক্ষেত্রে নয়।

মুহাতারাম হয়তো ইমাম শাফেয়ির ব্যাখ্যার আলোকে ‘সাগিরুন’র এমন অর্থ করেছেন। কারণ, তিনি আয়াতের অর্থ করার পর ইমাম শাফেয়ির বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। অথচ ইমাম শাফেয়ির বক্তব্যের ব্যাখ্যা ইবনে হাজার আসকালানি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইবনে হাজার আসকালানি বলেন,

وعن الشافعي: المراد بالصغار هنا التزام حكم الإسلام، وهو يرجع إلى التفسير اللغوي، لأن الحكم على الشخص بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله يستلزم الذل. (فتح الباري للعسقلاني، كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ٤٧٤/٩)

“ইমাম শাফেয়ি থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘সাগার’ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য ইসলামের হুকুম গ্রহণ করে নেয়া। (ইমাম শাফেয়ির বলা) এই উদ্দেশ্য শাব্দিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী হয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি যেটি বিশ্বাস করে না সে অনুযায়ী তাকে বিধান দেওয়া এবং তা গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া লাঞ্ছনাকে আবশ্যিক করে।”^[১৪৭]

ইমাম বুখারির ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পারি।

كتاب الجزية والموادعة

باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب

وقول الله تعالى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ: أذلاء. (صحيح البخاري، ص ٨٢٨)

ইমাম বুখারি ‘সাগিরুন’র ব্যাখ্যা “إذًا” (আযিল্লা-লাঙ্খিত) দ্বারা করেছেন।^[১৪৮]

এর অধীনে ইবনে হাজার আসকালানি বলেন,

قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. (فتح الباري، ১/১৭৬)

“উলামায়ে কেরাম বলেন, জিযয়ার বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে হিকমত হচ্ছে, তাদের লাঙ্খিত হওয়া তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে; মুসলিমদের সাথে মেলামেশার কারণে ইসলামের সৌন্দর্যাবলীর ব্যাপারে অবগত হওয়ার বিষয় তো আছেই।”^[১৪৯]

মুহতারাম জিযয়ার ব্যাপারে তাঁর উপর্যুক্ত দাবির পর ইবনুল কাইয়িমের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। আমরা সেই ইবনুল কাইয়িমের অবস্থান দেখতে পারি, তিনি জিযয়ার পরিচয় কীভাবে দিয়েছেন! ইবনুল কাইয়িম জিযয়া সংক্রান্ত আয়াতটি উল্লেখ করার পর বলেন,

فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً. (أحكام أهل الذمة لابن القيم، أحكام الجزية، ১/২২-২৩)

“জিযয়া হচ্ছে, হেয় করতে এবং লাঙ্খনা হিসেবে কাফেরদের উপর আরোপিত নির্দিষ্ট কর।”^[১৫০]

আশা করি এতটুকু আমাদের বোঝার জন্য স্পষ্ট যে, জিযয়া কিসের বিনিময় বা কীভাবে আদায় করা হবে; এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত থাকলেও এক্ষেত্রে যিম্মিদের লাঙ্খনার বিষয়টি সবার কাছে স্বীকৃত। আর এমন অকাট্য আয়াতের সামনে ভিন্ন কোনো মনোভাব রাখার সুযোগও নেই। কিন্তু মুহতারাম তাঁর বইয়ে যথারীতি মডারেটদের পথে চলেছেন। মডারেটদের ন্যায় যিম্মিদের লাঙ্খনার বিষয়টি আড়াল করতে বহু নয়ছয় কথা বলেছেন এবং ‘সাগিরুন’র অর্থ ‘অধীন হয়ে, বশ্যতা স্বীকার করে’ দ্বারা করেছেন। এ জাতীয় অর্থই করেছেন মডারেট গবেষক মুহাম্মাদ রশিদ রেযা। মুহাম্মাদ রশিদ রেযা তার তাফসিরে মানারে

[১৪৮] সহিহ বুখারি, পৃ: ৮২৮

[১৪৯] ফাতহুল বারি, ৯/৪৭৪

[১৫০] আহকামু আহলিয় যিম্মাহ, ১/২২-২৩

বলেন,

وهو الصغار، المراد به خضد شوكتهم، والخضوع لسيادتكم وحكمكم.
(تفسير المنار، ১০/৩৬২)

“আর ‘সাগার’ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের শক্তি খর্ব করা এবং তোমাদের কর্তৃত্ব ও শাসনের অধীন হওয়া।”^[১৫১]

এ বিষয়ে আমাদের এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরো দীর্ঘ আলোচনা পেশ করবো, ইনশাআল্লাহ।

□ মুহতারাম কি আমাদের কথাগুলো দেখেছেন বা দেখবেন!

মুহতারাম! আপনি আপনার বইয়ে ইঙ্গিত করেছেন, যারা আপনাদের দাবির বিপরীতে কথা বলে তাদের মুতলাআ একমুখী। কিন্তু আপনি যে একমুখী মুতলাআও পূর্ণ করেননি তা আপনার বই থেকেই স্পষ্ট। আপনি যে বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করেছেন সেগুলোর অনেক বিষয়ে আমরা কুরআন-সুন্নাহ, সালাফের অবস্থান ও ফিকহে ইসলামির আলোকে গ্রন্থ রচনা করেছি।

আপনি নাকি দাবি করেন, আপনার বইয়ের মাধ্যমে আমাদের বইয়ের জবাব দেওয়া হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে আপনি আমাদের আলোচনার কোনো ওয়াহাত না করে আবারও পূর্বের কথাগুলোই কেনো পুনরাবৃত্তি করলেন? আপনি যদি শুধু ‘মুসলিমবিশ্ব ও সমকালীন মাসায়েল’ গ্রন্থটি একবার দেখতেন, তাহলেও এভাবে এড়িয়ে যেতে পারতেন না। আমাদের মুতলাআ একমুখী না বহুমুখী তা পাঠকই বিচার করবে।

আমরা তো বিশেষকরে ‘দার’র মাসআলায় মুহাদ্দিসে কাবির হাবিবুর রহমান আযমির প্রত্যেক লাইন ধরে ধরে জবাব দিয়েছি, মুহতারাম কি আমাদের আলোচনার খণ্ডন এভাবে করবেন? তাহলে আমাদের ভুলের ব্যাপারে আমরা অবগত হয়ে উম্মাহকে সতর্ক করতে পারতাম। বা আপনাদের দাবি যথাযথ কি না; তাও সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে যেতো।

[১৫১] তাকসিরে মানার, ১০/৩৪২

□ মুহতারামের নিকট বিনীত অনুরোধ

মুহতারাম! আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতি আস্থা রেখে এবার আপনার কাছে বিনীত সুরে অনুরোধ করছি। আপনি আপনার বইয়ে যে মডারেট ইসলামি রাজনীতির চিত্র তুলে ধরেছেন এটির সঙ্গে আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের কোনো সম্পর্ক নেই। আকাবিরে দেওবন্দের কেউ এমনটি করেননি। দেওবন্দি মাসলাকের এবং কওমি অঙ্গনের গ্রহণযোগ্যদের থেকে বলা যায় আপনিই প্রথম গণতন্ত্র ও পরিবর্তিত পৃথিবীর পশ্চিমা দর্শনকে ইসলামের সঙ্গে সমঞ্জস করেছেন; যেটি এতদিন করছিলো মওদুদিপন্থী ও কারযাবি মতো মডারেট গবেষকের দল। আপনাদের মতো ব্যক্তিত্বদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে যদি কারযাবি ন্যায় মডারেটদের গবেষণা কওমি অঙ্গনে প্রবিষ্ট করা হয়, তাহলে এটির অনিষ্টতা আপনাদের, আমাদের ও পুরো মুসলিম উম্মাহকে ভোগ করতে হবে।

মুহতারাম! কারযাবিদের লাগামহীনতা সম্পর্কে আপনার কতোটুকু জানা আছে আমি বলতে পারছি না। উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক (হাফিয়াহুল্লাহ) কারযাবির লাগামহীনতা সম্পর্কে মাঝে মাঝে দারসে আলোচনা করতেন। সেখান থেকেই আমরা তার লাগামহীনতার ব্যাপারে সচেতন হয়েছি। উস্তাযে মুহতারাম এক দারসে বলেছিলেন -যেমনটি আমার মনে পড়ছে- ‘শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদাহের সামনে একবার কারযাবি প্রসঙ্গে আলোচনা হলে শাইখ আবদুল ফাত্তাহ যা বলেছিলেন সেটির মর্মার্থ হলো, তার মুখে শুধু ‘জুমুদ’ শুধু ‘জুমুদ’-গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা শুনা যায়, "كَانَ الْفُضُوءِيَّةُ لَيْسَتْ بِفِتْنَةٍ" (কেমন যেন লাগামহীনতা কোনো ফিতনা নয়)।’^[১৫২]

মুহতারাম! আপনার ব্যক্তিত্বের কাছে যে আশা আমরা করতে পারি সেটি হচ্ছে, আশা করি আপনি আপনার বইটি আবার দেখবেন এবং কোনো কিছু ভুল মনে হলে উম্মাহকে সে ব্যাপারে সতর্ক করবেন। এটির সুফল পুরো উম্মাহ ভোগ করবে। যাদেরকে আপনারা বিচ্ছিন্নবাদী আখ্যা দিচ্ছেন তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শরিআ শাসন পুনরুদ্ধারের পথে দিনদিন অগ্রসর হয়ে চলেছে। এ ভূখণ্ডেও একদিন তাদের মাধ্যমে শরিআ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ; আপনি-আমি সে যুগ পাই বা না পাই।

[১৫২] আমার যেভাবে এবং যতোটুকু আরবি মনে পড়ছে সেভাবে ততোটুকু উল্লেখ করেছি। বাকি শব্দের ভিন্নতা থাকা একেবারেই স্বাভাবিক।

তখন আপনাদের সঙ্গে আমাদের মতানৈক্যের অনেক মাসআলাই আর আলোচনায় আসার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ভুলের ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক না করলে এই বইয়ের মাধ্যমে আপনি যে "سنة سيئة" ধরে রাখার মিশনে সম্পৃক্ত হয়েছেন, সেটি কখনো মুছে যাবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আপনাদের সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং সকলের ভালো কাজগুলো কবুল করুন ও ভুল কাজের অনিষ্টতা থেকে মুসলিম উম্মাহকে হিফায়ত করুন, আমিন।

আবরার সিদ্দিক

দারুত তাসনিফ, মারকাযুস সহওয়া আলইসলামিয়া ঢাকা

২২ রজব ১৪৪৬ হি.

ثَبَّتَ الْمَصَادِرَ وَالرَّاجِعَ

۱. القرآن الكريم
۲. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ليوסף القرضاوي، دار القلم
۳. الإجماع لابن المنذر، مكتبة الفرقان - مكتلة مكة الثقافية
۴. احاطہ دار العلوم میں جتنی ہوئے دن - مناظر احسن گیلانی، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان
۵. أحكام أهل الذمة لابن القيم، المكتبة التوفيقية
۶. أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص، دار الكتب العلمية
۷. الأحكام الشرعية للنوازل السياسية لعطية عدلان، دار اليسر
۸. الإسلام والحضارة الغربية لمحمد محمد حسين، دار الفرقان
۹. الإسلام والخلافة في العصر الحديث لمحمد ضياء الدين الرئيس، منشورات العصر الحديث
۱۰. الإسلام والنصرانية لمحمد عبده، دار الحداثة
۱۱. اسلامی دستور کی تدوین - ابوالاعلیٰ مودودی
۱۲. اسلامی ریاست میں ذمیوں کے حقوق - ابوالاعلیٰ مودودی
۱۳. اسیرانِ مالٹا - سید محمد میاں، کتب خانہ نعیمیہ، دیوبند
۱۴. أصول الإفتاء وآدابه للمفتي محمد تقي العثماني، مكتبة الحجاج، بنغلابلزار، داکا

۱۵. الأعمال الكاملة لمحمد عبده، دار الشروق
۱۶. الإمارة الإسلامية ونظامها لعبد الحكيم الحفاني، مكتبة دار العلوم الشرعية
۱۷. الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي لفهد بن صالح العجلان، دار كنوز إشبيليا
۱۸. أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية لعلي بن نفع العلياني، دار طيبة
۱۹. البداية والنهاية لابن كثير، دار الحديث
۲۰. تاريخ أفغانستان - محمد اسماعيل ريمان، النسل پبلشرز، كراچی
۲۱. تاريخ امت مسلمة - محمد اسماعيل ريمان، النسل پبلشرز، كراچی
۲۲. تاريخ الخلفاء للسيوطي، دار الغد الجديد
۲۳. تاريخ الطبري، دار ابن الجوزي
۲۴. تاريخ القضاء في الإسلام لمحمد الزحيلي، دار الفكر المعاصر، بيروت
۲۵. تعمیر پاکستان اور علماء ربانی - مفتی عبدالرحمن، شیخ اکیڈمی، لاہور
۲۶. تفسیر المنار لمحمد رشید رضا، دار المنار بمصر
۲۷. تکملة فتح الملهم للمفتي محمد تقي العثماني، دار القلم، بيروت
۲۸. تكوين المذهب الحنفي لسائد بكداش، دار البشائر الإسلامية - دار السراج
۲۹. تنبيه المسلمين من ضلالات يوسف القرضاوي لإرشاد أحمد البخاري

٣٠. ثقافة الداعية ليوسف القرضاوي، مكتبة وهبة

٣١. حجر الأرض لأحمد فال الدين، مركز الجزيرة للدراسات

٣٢. حضارة العرب لغوستاف بولون، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة

The Civilization Of The Arabs -Gustave Le Bon

٣٣. حقيقة الإسلام وأصول الحكم لمحمد نجيت المطيعي، المطبعة السلفية

٣٤. خاطرات جمال الدين الأفغاني، مكتبة الشروق الدولية

٣٥. خطبات الرشيد- موعظ مفتي رشيد احمد لدهيانوي، كتاب گھر، کراچی

٣٦. خطبات و مکتوبات عثمانی- مولانا شبیر احمد عثمانی، حاجی حنیف اینڈ سنز، لاہور

٣٧. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحي

٣٨. الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد، مكتبة النهضة المصرية

The Preaching Of Islam -Thomas Arnold

٣٩. دعوة التقريب بين الأديان لأحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي،

دار ابن الجوزي

٤٠. دعوت جہاد- فضل محمد، بیت الجہاد

٤١. دلائل النبوة للبيهقي، دار الحديث

٤٢. الدولة المدنية لماجد بن علي بن إبراهيم الزميّع، دار الهدى النبوي - دار

الفضيلة

٤٣. رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بيروت

۴۴. الرسائل والمقالات - جمال الدين الأفغاني، إعداد وتقديم سيد هادي خسرو شاهي

۴۵. رفع اللثام عن مخالفة القرضاوي لشرعة الإسلام لأحمد بن محمد العديني، دار الآثار

۴۶. السنن الكبرى للبيهقي، دار النوادر

۴۷. سيرة سيد احمد شهيد - ابوالحسن علي ندوي، مجلس تحقيقات ونشریات اسلام، لکھنؤ

۴۸. السيرة النبوية لابن هشام، دار الحديث

۴۹. شذرات من تاريخ القاعدة - رواية خبيب السوداني، بيت المقدس

۵۰. شرح مشكل الآثار للطحاوي، الرسالة العالمية

۵۱. صحراے سمندر تک - عمر عزام خراسانی، اسلامک ریسرچ فٹک ٹیک اسلام آباد

۵۲. صحيح البخاري، مؤسسة الرسالة ناشرون

۵۳. عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي، مطبعة دار الكتب المصرية

۵۴. عجائب المقدور في أخبار تيمور لابن عرب شاه، مطبعة وادي النيل في القاهرة

۵۵. العرب والإسلام لأبي الحسن علي الحسيني الندوي، المكتب الإسلامي

۵۶. العروة الوثقى - السيد جمال الدين الأفغاني، إعداد وتقديم سيد هادي خسرو شاهي

٥٧. علماء الهند كاشاندار ماضي - سيد محمد مياں، جمعیت، بنگلور، ١٩١١

٥٨. عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري، مطبعة دار الكتب المصرية
٥٩. فتاوى الإمام رشيد رضا - جمع الدكتور صلاح الدين المنجد
٦٠. فتح الباري لابن حجر العسقلاني، الرسالة العالمية
٦١. الفكر الإسلامي المعاصر لغازي التوبة، دار القلم، بيروت
٦٢. فيض الباري لأنور شاه الكشميري، دار الكتب العلمية
٦٣. قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي لأورهان صادق، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية
٦٤. الكامل في التاريخ لابن الأثير، دار الحديث
٦٥. مجلة المنار - محمد رشيد رضا
٦٦. مختصر تاريخ الدولة العثمانية لأبي مصعب السوري، بيت المقدس
٦٧. مدارك التكفير في الفقه الإسلامي وأصول الدين لفادي بهيج موسى، دار الفتحة
٦٨. مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب، دار الشروق
٦٩. المغني لابن قدامة، دار الكتاب العربي
٧٠. المفهم لأبي العباس القرطبي، دار ابن كثير
٧١. مفهوم تجديد الدين لبسطامي محمد سعيد، مركز التأصيل للدراسات والبحوث

৭২. الملا محمد عمر وطالبان وأفغانستان -مذاكرات الملا عبد الحي
المطمن، مركز الخطابي

৭৩. مناهج الألباب المصرية في مباحج الآداب العصرية لرفاعة الطهطاوي،
دار الكتاب المصري

৭৪. من أجل صحوة راشدة ليوسف القرضاوي، دار الشروق

৭৫. من فقه الدولة في الإسلام ليوسف القرضاوي، دار الشروق

৭৬. نقش حیات -خودنوشتہ سوانح -سید حسین احمد مدنی، دارالاشاعت، کراچی

৭৭. نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم لمحمد الخضر حسين، مؤسسة
هنداوي

৭৮. দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান, মাওলানা আবুল ফাতাহ
ইয়াহইয়া

৭৯. মুসলিমবিশ্ব ও সমকালীন মাসায়েল, আবু মুসআব, দারুল ফিকহিল আম

৮০. হাদিস ও উলুমুল হাদিস ১, আবরার সিদ্দিক, মাকতাবাতুল আযহার

৮১. ১৮৫৭ স্বাধীনতা যুদ্ধের উপাখ্যান, ইমরান রাইহান, সঞ্চালন

৮২. ভারতে মুসলিম শাসনব্যবস্থার ইতিহাস, এ. কে. এম. আবদুল আলীম,
মাওলা ব্রাদার্স

৮৩. রাষ্ট্র ও রাজনীতি, মাওলানা আবু সাবের আবদুল্লাহ, মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ
বাংলাদেশ